ছবি : সুধীর

তিন পুরুষ এক লতা

অহনা বিশ্বাস

—তুমি আশ্চর্যরকমের সুন্দর হয়ে উঠেছ আইভি।

উত্তরে আইভি শুধু অঞ্জনের দিকে তাকাল। চেয়ারের পিঠে হাত রেখে তাকে দেখছিল অঞ্জন। তাকান মাত্র চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। আইভি তার ঘরের নরম সোফার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে দিতে বলল : একথা কখনও আগে বলনি তো।

আইভির গলায় শীতলতা ছিল। অঞ্জন তার সাদা কাশ্মীরি শালটা ঠিক করতে যেন সময় নিল সামান্য। তারপর চোখে চোখ রেখেই বলল : আগেকার সব কথা ঠিক মনে নেই। তবে দারুণ পার্সোনালিটি এসেছে তোমার মধ্যে। একদম সবকিছুই আলাদা। আগে ঠিক এমনটা ছিলে না। বিশ্বাস কর।

আইভি হাসল। অঞ্জন পাশে এসে বসেছে। বেশিদূরে নয়। ইচ্ছে হলে ছোঁয়া যায়। ওর বাদামি রঙের পাঞ্জাবির একটা অংশ খুব কাছে। ইচ্ছে হলে সেটা ধরে টানাও যায়। সিগারেট ধরিয়েছে অঞ্জন। তাদের হসপিটালে ধূমপান নিষিদ্ধ। কিছু বললনা আইভি। সিগারেট ছাড়া অঞ্জনকে মানায় না। আইভি পাশ ফিরে অঞ্জনের মুখটা দেখারও চেষ্টা করল। ও বদলায়নি কিছুই। সামান্য মোটা হওয়া ছাড়া। বয়স বাড়লে চুল যেমন পাতলা হয় অঞ্জনের তেমনটাও হয়নি, যেমন হয়েছিল মুক্তেশের। কপালটা বড় হতে হতে শেষদিকে মাথার ওপরটা গড়ের মাঠ হয়ে গিয়েছিল।

আইভির ঘরে মৃদু নীল আলো জ্বলছে। উজ্জ্বল আলো তার নিজের পছন্দ নয়। অঞ্জনকে ঘরে নিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পর তার মনে হল টিউবটা জ্বালা দরকার। টিউবটা জ্বলে উঠলে অঞ্জনও নড়েচড়ে বসল। আইভিও কিছুটা সহজ হল। চেয়ারটা টেনে এনে অঞ্জনের মুখোমুখি বসে বলল : কফি খাবে? জল চাপাই তাহলে।

—বস তুমি। কফি খাব না। অঞ্জন যেন কোন রাজ্যে আছে।

—কফি খাবে না কেন? এখানে আমার এটুকু ব্যবস্থা আছে। দেখছ না অ্যাটাচড কিচেন। তুমি তো আগে কফি খেতে খুব ভালবাসতে।

—আর ভালবাসা? ডাক্তারের নিষেধ।

—কেন কী হয়েছে তোমার? আইভির গলায় উদ্বেগ।

—অনেককিছু। মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। অপারেশন করতে হল। কিন্তু থাক সে কথা। সবসময় তো বাড়িতে এসব নিয়েই কথা হচ্ছে। আর ভাল্লাগে না।

—আমাকে বলতে পার, আমার তো এখন এসব নিয়েই কাজ।

—আসলে গলব্লাডারে স্টোন ছিল। তারপর দেখা গেল বেশ জটিল ব্যাপার। শেষে ওটার অনেকটাই বাদ দিতে হল। অঞ্জন ডিটেলেই বলল।

—সেকি! আইভির চোখেমুখে সম্ভবত কষ্টের ছায়া পড়ছিল। কোথায় করিয়েছিলে? এখানে এলে আমরা চেষ্টা করতাম। হয়তো এমনটা ঘটত না। দেখি, কাটাটা দেখি। হসপিটালের অভ্যাসেই বলে ফেলল সে।

পাজামাটা সামান্য টেনে নামিয়ে গেঞ্জি তুলে অপারেশনটা দেখাতে গেল অঞ্জন। কাছে এসে দেখতে গিয়েও সরে গেল আইভি। নার্সের অভ্যস্ত নৈর্ব্যক্তিক শরীরও শিরশির করে উঠল। কতবছর পর দেখল সে? কাঁচাপাকা রোমের রেখাটা নাড়ির কাছে এসে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেছে।

নিজেকে আড়াল করতে কিচেনে গেল আইভি। গ্যাসে জল চাপাল। ডিশে সামান্য বাদাম ভাজা রাখল। অনাবশ্যক দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বছরগুলো হিসেব করতে পারছে না, আন্দাজ করতে পারছে না। গতকাল দেখা হবার পর থেকে রাতে সে একরকম জাগ্রত অবস্থায় কাটিয়েছে। মুকুল রাত্রে একটা বিষয় আলোচনা করতে এলেও তার মন কিছুতেই লাগছিল না। অথচ বিষয়টা জরুরি ছিল। মুকুলকে বারবার তাড়াও লাগাচ্ছিল এটার জন্য। শেষে মুকুল না জিজ্ঞেস করে পারেনি : ম্যাডাম, কী হয়েছে তোমার?

বলেছিল আইভি। বলেছিল সামান্যই। যতটুক না বললে নয়। মুকুলও চুপ করে শুনেছিল। কোনও মন্তব্য করেনি। আসলে বড় অস্থির লাগছিল। যে ঘটনাগুলো, যে অনুভূতিগুলো ভেবেছিল ভুলে গিয়েছে, সেগুলো মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছিল। কাউকে একটা বলতে হতই। আমেরিকা থেকে ফেরার পর মুকুলও যেমন জেনির কথা বলত, সেভাবেও বলেনি আইভি। সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে থেমে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল আমার বয়স হয়েছে মুকুল।

—বয়স? মুকুল মৃদু হেসেছিল। তোমার এটা কোনও বয়স নয় ম্যাডাম। বিদেশ গেলে বুঝতে। লোকে এই বয়সে জীবন শুরু করে।

—না মুকুল, আমি ফিল করি। আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি আমার বয়েস হয়েছে।

ফাইল গুটিয়ে উঠে গিয়েছিল মুকুল। তারপরও অন্যান্য দিনের মত অফিসে গিয়ে কাজ নিয়ে কমপিউটারের সামনে বসেছিল। মাউস নিয়ে

একটু আধটু নাড়াচাড়া করল। শুয়ে পড়েছিল তারপর ঘরে এসে। কোনও বইপত্র নয়। তাদের ভরতপুর আদিবাসী কল্যাণ হাসপাতালের স্যুভেনিরটার পাতা শুয়ে শুয়ে ওল্টাচ্ছিল। সামনের পাতায় বড় করে মুক্তেশের ছবি। এই ছবিটা আইভিরই তোলা। মুক্তেশের ছবিকে চোখের সামনে অনেকক্ষণ রেখেছিল সে। যদি প্রলেপ পড়ে। বারবার নিজেকে শাসন করেছিল, বলেছিল তোমার এখন পজিশন আলাদা, তাছাড়া তোমার বয়স হয়েছে। এই বয়সে হৃদয়ের আলোড়ন মানায় না। তাছাড়া যে সময়ে যা পাবার কথা, তা সময় পেরিয়ে গেলে অর্থহীন হয়ে যায়। বারবার নিজেকে বলেছে, সামলাও, নিজেকে সামলাও। তুমি অনেক পেয়েছ আইভি। সেকথা মনে কর। কিন্তু যা কিছু সে পায়নি? সে কি কম কিছু?

অঞ্জন সারা ঘরময় ঘুরছিল। আইভির অ্যাপার্টমেন্ট ছোট, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। বেডরুম, ড্রইংরুম, ছোট্ট ব্যালকনি। ড্রইংরুমের একপাশে স্টাডি। খুব সরলভাবে গোছান। আতিশয্য নেই কোথাও। অঞ্জন বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। কিচেন থেকে দেখছে আইভি। সাদা হলুদের খোপ খোপ ভরতপুরের মেয়েদের তৈরি পর্দাতে হাত রাখল অঞ্জন। দেখছে সে।

ওটা আমাদের এখানকার মেয়েদের তৈরি।

অঞ্জন বেডরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গল বেডের সাধারণ চৌকি। সাদা ধবধবে বিছানা। মাটিতে তালপাতার চাটাই পাতা। খাটের সংলগ্ন টুলে সেই চটি পত্রিকা। তাতে ডাঃ মুক্তেশ বোসের ছবি।

পত্রিকায় হাত লাগাতেই আইভি বলে উঠল : ওদিকে কী করছ? এখানে বস। এখানে কলকাতার মতো স্ন্যাকস তো পাওয়া যায় না। বাদাম খাও সামান্য।

অঞ্জন বসে আইভিকেই দেখছিল। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আইভি। সাদা শাড়ির ওপর কালো সোয়েটার পরা। এর চুল, চোখ মুখ সমস্তই অচেনা। তখন চশমা পরত না। একটু শীর্ণ হয়েছে আইভি, কালোও হয়েছে জায়গার গুণে। তবু কী একটা দ্যুতি ওর চোখেমুখে।

আইভি মুখ উঠিয়ে বলল—কী দেখছ অমন করে? একটু হাসতে গেল সে, পারল না। অঞ্জনের মুগ্ধতাকে সে চেনে। কিন্তু সে কি রূপবতী হয়েছে নাকি? তাও আবার এই বয়সে, যখন যৌবন নিভে আসছে। অঞ্জনের কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? সে কি কথাগুলো বানিয়ে তুলছে না?

—তুমি অনেক বদলে গেছ।

—বারে, এতবছর পর বদল তো স্বাভাবিক। আইভি নিজেকে চেয়ারের মধ্যে টানটান করে মেলে ধরেছিল। জীবনে একটা একটা করে ঘটনা ঘটেছে, আর একটু একটু করে বদলেছি। কিন্তু এতো সবাইকারই হয়। আমার নতুন আর কী? কিন্তু তুমি কোন বদলের কথা বলছ? চুল কেটেছি এটা তো। শরীর তো একইরকম আছে।

অঞ্জন হেসে বলল, না চুল কাটার কথা নয়। তবে চুলটা দারুণ হয়েছে। ডাই করো না তো তুমি?

—না, ওসব আমার একেবারে ভাল লাগে না। রঙটঙ করা পছন্দ করে উঠতে পারি না। আইভি সহজগলায় কথা বলছিল। আর চুলটা কেটেছি সখ করে নয়। জান তো সকালবেলায় চান করা চিরকালের অভ্যাস আমার। তারপর ভিজে চুলটুল বেঁধে আর যাই করি না কেন হসপিটালের কাজ করা যায় না।

—সত্যি, শীতের ভোরেও তুমি হড় হড় করে চান করতে। পারও বাবা। এখনও অমনি আছ তাই না। এটা বদলায়নি।

আইভি নিজের কাপডিশ নিয়ে উঠল। যতবার সে সহজ বন্ধুসুলভ আচরণ করতে যাচ্ছে, ততবার খোঁচা খাচ্ছে। কিন্তু আজ অঞ্জন তার কে? বন্ধু ছাড়া? হয়তো বন্ধুও নয়, পরিচিত ছাড়া। তাদের হসপিটালের সহকর্মী ডাক্তারদের সঙ্গে তার যেটুকু সম্পর্ক, সেটুকুও কি তার সঙ্গে অঞ্জনের থাকার কথা?

—তোমার এই ছোট্ট বাসস্থানটুকুকে তুমি দারুণ সাজিয়েছ। ইন্টিরিয়র ডেকোরেটর হিসাবে কাজ করলেও তুমি সুনাম পেতে।

আইভি ভাবল একবার বলে, কী ব্যাপার অঞ্জন, তুমি আমাকে এত তেল দিচ্ছ কেন? তোমার মেয়ের জন্য? তোমার মেয়ের চিকিৎসা এখানে ভালই হবে। তারজন্য আমার পরিচিতি, আমার দাক্ষিণ্য কিছুই লাগবে না। বলল চুপ করে গেল। ভেতরটায় ধিক ধিক করে তুষের আগুনের মতো কী একটা জ্বলছে। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। অঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকল সে। একটা ভাল কোম্পানিতে পার্সোনেল ম্যানেজার হয়ে আছে অঞ্জন। লোক পটাতে ভালই শিখেছে। কিন্তু আইভিকে পটাবে কী করে? সে যে অঞ্জনের গোড়া থেকে জানে। একটা কথা বললে তার শেষটুকুও কী হবে সে বুঝতে পারে। একথা বললে যে কেউ বলবে, তাহলে তুমি কেন বুঝতে পারনি যে অঞ্জন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

—এটা কোত্থেকে জোগাড় করলে? অঞ্জন বাঁশের তৈরি একটা টেবিল ল্যাম্প দেখায়।

—এসব যা দেখছ সবই স্থানীয় লোকজনের তৈরি। আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠাতার তাই ইচ্ছে ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাওয়ার ইচ্ছে। আমরা তো সব রাখতে পারিনি। বাইরের জিনিস নিতে হয়েছে। তবে এ ঘরের স্টিলের আলমারিটা ছাড়া সবই এখানকার মানুষজনের তৈরি। আর এটা আমাকে একজন দিয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার। আইভি মুক্তেশের নাম করল না।

—আগস্টে না তোমার জন্মদিন।

বিরুপের রেখা আইভির মুখে ছুঁয়ে গেল। মনে আছে তোমার? সে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলছিল।

অঞ্জন থেমে গিয়েছিল। গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ প্লেটটাকে নাড়ল। তোমার কী মনে হয়, মনে আছে?

—মনে তো না থাকারই কথা।

—তুমি তা বলবে আমি জানি। যদি বলি ভীষণভাবে মনে আছে। আর এখন ...

—ইরা কেমন আছে? প্রসঙ্গ দ্রুত বদল করল আইভি। ইরা তার বউ। ইরা আইভির ক্লাসমেট। ইরার প্রসঙ্গ টেনে তির্যক চোখে তাকাল সে। ইরার কথা তোলার এটাইতো সময়।

—আছে একরকম। উদাসীনতা দেখাল অঞ্জন। বাতিকগ্রস্ত হয়ে গেছে একেবারে।

—বাতিকগ্রস্ত মানে? ও তো ওরকম ছিল না। একটু টিপটপ ছিল এই যা।

—সেটাই ভয়ঙ্কর বাড়লে যা হয়। সারাদিন ঘর ঝাড়া মোছা লেগে আছে। মেয়েদের পিছনেও রাতদিন টিকটিকি করে।

—মেয়েরা আবার কোথায়? এক মেয়ে তো এখানে। অনিতা তো ছোটমেয়ে তোমার।

—আসলে বাড়িতে একটা মেয়েই থাকে। কিন্তু মেয়েদের নিয়ে এত সমস্যা আমাদের, টেনশনটা তো ওকে বেশি ছোঁয়। আমি তো বাইরে বাইরে অফিস নিয়ে কাটাই। ও বেচারির মনের মধ্যে চাপ লাগে বেশি।

আইভি জোরে শ্বাস নিল। বাইরে আলো কমে এসেছে। পশ্চিমের আকাশটাতে লাল আভা গোলাপী আর নীলে মিশে যাচ্ছে। গাছগুলোকে খুব কালো দেখায় এই সময়। কাঁচের জানলাটা বন্ধ করতে করতে আইভি ভাবল অঞ্জন অনেকক্ষণ এসেছে। কখন যাবে ও? মুখে বলল, চাপ তো আমাদের কম কিছু নেই। কাজ নিয়ে ভুলে থাকি।

—তাই তো দেখছি তোমাকে। কাজে আছ বলেই এত ভাল আছ।

—ভাল লাগছে তোমার? আইভি রহস্য করতে চেষ্টা করল। অঞ্জনকে তার খেলাতে ভাল লাগছে। ইচ্ছে করছে তাকে একটু দু আঙুল নাড়িয়েচাড়িয়ে দেখতে। কিন্তু এসব তো তার অভ্যাসে নেই। সত্যি বড় কাজে জমে গেছে সে।

—ইয়ার্কি মারছ আমার সঙ্গে? অঞ্জনকে সিরিয়াস দেখাল।

—তা নয়। আসলে সেই থেকে এত প্রশংসা করছ যে আমার মনে হল এসবের আমি যোগ্য কিনা। নাকি তোমারই কিছু গণ্ডগোল হল।

—আমি তো তোমাকে আগে দেখেছি, আর এখনও দেখছি। পরিবর্তনটাতো আমার চোখে বেশি লাগবেই আই। আর সব বয়সের যে একটা সৌন্দর্য থাকে, আকর্ষণ থাকে সেটা তোমাকে না দেখলে কোনওদিন বুঝতাম না। বিশেষ করে আমার চোখ তো ফিরছে না।

ঠিক সেই সময় লোডশেডিং হল। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল আইভি। নিজেকে অন্ধকারের আড়ালে মেলে দিল। সব মিথ্যে বুঝলেও ভেতরটায় কেন একটা দুটো শব্দ আটকে যাচ্ছে। নিজের বুড়ো আঙুল মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চাপল সে। মোমবাতি জ্বালাতে হবে। একমিনিট নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। অঞ্জনের কি কিছু মনে পড়ছে? কিন্তু মনে পড়ার প্রয়োজন আছে কি? ওর হয়তো নেই, কিন্তু আইভিকে সব মনে পড়িয়ে দেবার দরকার কী? অঞ্জনের তো ভরা সংসার। সংসারের প্রতি দরদও তো কম নয়। তবে এসব কথা কেন?

অঞ্জনও চুপ করেছিল। কী ভাবছিল কে জানে। যে কথাটা সে বলেছে সে কথার ভার অন্ধকারেও অনুভব করা যায়। নীরবতার মধ্যেও যেন তার প্রতিধ্বনি দেয়ালে দেয়ালে বাজছে। আইভি শুনল অঞ্জন বলছে, তোমাদের জেনারেটর নেই আই? আর এই কথাটাই তাকে ঠেলে ওঠাল মোমবাতি জ্বালাতে। মোমবাতি মোমদানিতে আটকাতে আটকাতে সে বলল, জেনারেটর আছে। কিন্তু সে তো শুধু হসপিটালের জন্য।

—এটা তো তারই একটা অংশ। হসপিটালের তিনতলাতেই তো তোমার অ্যাপার্টমেন্ট। একটা লাইন টেনে নিলেই হল। এ আর এমনকি

ব্যাপার।

—এটাই তো ব্যাপার মশাই। আমার ঘরে কেন, মুকুল বা অন্য কোনও ডাক্তার, কারুর ঘরেই নেই। আমাদেরও এই আদিবাসীপল্লীতে একটা সমাজ আছে। জানলা দিয়ে দ্যাখো কারুর ঘরেই ইলেকট্রিক নেই। আমাদের সমিতি থেকে কয়েকটা বিশেষ জায়গায় লাইট দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় বাচ্চাদের লেখাপড়া করার জন্য। আর আমাদের জন্য সবসময় লাইট। চক্ষুলজ্জার তো ব্যাপার আছে। এরপর যদি আবার জেনারেটর নিই তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না।

—তা ঠিক। তবে এটা প্রয়োজন। কলকাতায় এখন একদম লোডশেডিং হয় না।

—সব প্রয়োজন কি মিটে যায়? কত কী তো এক একজনকে সহ্য করতে হয়।

অঞ্জন যেন ধরতে পারল কথাটা। বলল, সহ্য তো করছি আই।

আর এই কথাটাতেই কেমন একটু যেন রাগ দেখাল আইভি। বলল, আই আই কোর না। এখানে আই, জে, কে, এল কেউ বোঝে না। আমার প্রকৃত নামটাও এখানে কজন জানে সন্দেহ। সবাই তো ম্যাডাম বলেই ডাকে। তুমিও তাই ডেকো।

এটাতে ওরা দুজনেই হাসতে পারত। কিন্তু আইভির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ধাক্কা খেল অঞ্জন। আইভি মোমবাতিটা সামনের টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জানলার পাশে। কাগজপত্র কীসব গোছাচ্ছে দ্রুত হাতে। কাজ করতে করতে বলল : আসলে জেনারেটরের দরকার পড়ে না। আমি তো বেশিরভাগ সময় অফিসেই থাকি। তুমি যদি না আসতে তাহলে এখন আমাকে ওখানেই থাকতে হত। অনেকগুলো ব্যাপার আমাকেই দেখতে হয়। রবিবারও ছুটি নিতে পারি না।

—তাই তোমাদের এই হসপিটাল এত ভাল। কলকাতায় আমরা তো এমনটা কল্পনাই করতে পারি না। অনিতাকে এখানে নিয়ে এসে ওরা ভালই করেছে। হয়তো এখানে চিকিৎসায় ওর ভাল হবে। জানোই তো এর আগে দুটো বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে।

—ভাল কি মন্দ হবে বলতে পারি না। তবে আমাদের ডাক্তাররা সবাই খুব খাটেন। যত্নও আছে। আমরা তো শুধু ডিগ্রী দেখে অ্যাপয়েন্ট করি না, মানুষ দেখেও করি। আর মুকুল তো গায়নোকোলজিস্ট। বিদেশে কত ভাল জায়গায় কাজ করেছে, এখানেও বোম্বে, ম্যাড্রাসে ওকে ডাকছে। ও তো গেল না। অনিতা ওর হাতেই আছে, ভয় পেয় না।

—না, তোমাকে দেখার পর আমি আর ভয় পাইনি। তুমি খুব কেয়ার নেবে আমি জানি।

আইভি চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নার দিকে চেয়েই বলল, তুমি অনিতার কাছে একটু বসো। ও ভাববে বাবা আমার কাছে এসে থেকে ম্যাডামের কাছেই রয়েছে।

আইভির সঙ্গে অঞ্জন তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

—অনিতা তো জানে না আমি তোমার কাছে এসেছি।

—সেকি, ওকে বলনি তুমি?

—তোমার পরিচয় ও জানে না। মানে আমার কাছ থেকে কিছু শোনেনি।

—তুমি কি জানাতে চাও না? আইভ ওর দিকে তাকাল। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করল অঞ্জন। বলল : জানাতে চাই না এমনটা নয়। তবে কী জানাব, মানে তোমার কী পরিচয় দেব সেটাই মুশকিল।

—তোমার জামাই যে কাল দেখল তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ।

—দেখেছে। আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছে।

—কী বললে তুমি?

—বললাম তুমি আমার পরিচিত। কলকাতার মেয়ে। তোমাকে তো ওরা খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোতলায় নেমে আইভি বলল, সত্যি কথা বলতে পারলে না।

—কোন্ সত্যিটা বলব?

—কেন বললে না তুমি আমাকে প্রথম বিয়ে করেছিলে।

—তুমি এখনও ওটা মনে করে রেখেছ। আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু বিয়েটাতো সেই বয়েসে একটা ইমোশনাল ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। আইনটাইন জানতাম না আমরা—যাকগে। অনেকদিন তো পার হয়ে এলাম। এখন এসব ভেবে লাভ নেই।

আইভির অনেক কথা মাথায় ঝাঁপাচ্ছিল। ঘরে থাকলেও অঞ্জনকে বহু কথা বলা যেত। কিন্তু যে জায়গায় তারা দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানটায় লোকজন যাতায়াত করছে। একতলার মতো ভিড় না হলেও তাদের দুজনকে চোখে পড়ছে। তাছাড়া ম্যাডামের ওপর সবাইকারই চোখ। স্বাভাবিকও সেটা। নিজের চেম্বারে ঢোকার আগে অঞ্জনকে বিদায় করে দিতে সে চায়। কাজে মন দিতে চায়। তার সংসার নেই, সন্তানাদি নেই, কিন্তু হসপিটাল আছে, সমিতি আছে, তারা তাকে চায়। আইভিও এসব নিয়ে বেঁচে আছে। মাঝখান থেকে অঞ্জনের মতো উটকো লোক এসে তার সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল। বিদায় দেবার সময়ও আইভি নিজেকে নরম দেখাল না। অঞ্জন এখন আইন টাইনের কথা তুলছে। যখন বিয়ে করেছিল তখন আইভি নাবালিকা ছিল ঠিকই কিন্তু অঞ্জনেরও কি বয়স হয়নি? আইভি বলল, যা সত্যি খারাপ হোক ভাল হোক ছেলেমেয়েদের জানাই ভাল। আর এটা যখন কোনও ব্যাপার নয়।

—তা ঠিক নয়। আসলে অনিতার শ্বশুরবাড়ি খুব কনজারভেটিভ। ব্যাপারটা আমার পক্ষে যত না, ওর পক্ষে মুশকিল হবে।

—ইরাকে জানিয়েছ?

—না, ও হয়তো আসবে কদিন পর। তখন নিশ্চয় তোমাকে দেখবে। মানে বাচ্চা ভালোয় ভালোয় না হলে ও আসবে না। যদি ধর না আসতেই পারল ও, তখন এসব বলে জলঘোলা করা কেন মিছিমিছি?

—ইরাকে ভয় পাও তুমি খুব?

—একেবারেই নয়, অশান্তি এড়াই। ভালবাসা আর সংসার অন্য জিনিস। হয়তো সংসার করনি বলেই তুমি এমন থাকতে পারছ।

—কথা আর বোল না তুমি। যাও। অনিতা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমারও কাজ পড়ে আছে।

দোতলার করিডোর দীর্ঘ। তারপর ওদিকে সিঁড়ি বেয়ে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢোকা যায়। অঞ্জন যাচ্ছিল। পাঞ্জাবি পাজামা পরা ওর দীর্ঘ দেহ। পিছন থেকে বয়স বোঝা যায় না। আইভি সব ভুলে দেখছিল। লোকটাকে প্রায় ঘর থেকে হটিয়েই দিল সে। মাঝেমাঝে খুব খারাপ লাগছিল অঞ্জনকে। রাগ হচ্ছিল ওর ওপর। তবু প্রকাশ করার মতো পরিবেশ এ নয়। রাগও এমন একটা অনুভবের প্রকাশ, যে যার তার ওপর তা প্রয়োগ করা যায় না। অঞ্জন দোতলার সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল। মুহূর্তের জন্য বিব্রত হল আইভি। পরমুহূর্তেই ফাঁকা লাগল। সবকিছু ফাঁকা। নিজের অফিসটাতে এসে চুপচাপ চেয়ারে বসল। মুকুল ভাগ্যে ডেকেছিল, নইলে সে লক্ষ্যই করেনি কখন ও ঘরে ঢুকেছে।

—ম্যাডাম, ডাক্তারদের উইকলি মিটিং-এ তাহলে তুমি যাচ্ছ নাতো?

—কেন যাব না, এখনও তো সাতটা বাজেনি।

—আজকে রেস্ট নিলে হত না।

—কোনওদিন দেখেছ এটাতে অ্যাবসেন্ট থেকেছি?

—আজ না হয় না গেলে। আমার ওপর একটু ভরসা কর।

—সে কথা নয়। তোমারই তো সব। আমার গেলে ভাল লাগে। এইমাত্র।

—তাহলে চল, নইলে আমি সবাইকে বলে দিয়েছিলাম, তুমি একটু অসুস্থ। যাবে না।

—ছিঃ মুকুল, এখন ওরা সবাই কী ভাববেন?

—অসুস্থ অবস্থায় এসেছ ভাববেন। আর তোমার মুখচোখের যা চেহারা হয়েছে!

—কী হয়েছে? মুকুলের মুখোমুখি দাঁড়াল আইভি। একটু আগেই তো আয়না দেখলাম।

—নিজের মুখ নিজে সবসময় বোঝা যায় না। কাল রাতে তুমি ঘুমোওনি তার ছাপ পড়েছে।

—তুমি তোমার বাবার মতো মুকুল। খুব লক্ষ্য তোমার। এতটা ভাল নয়। আমি ঠিক আছি। তোমার কোনও ভাবনা নেই। আইভির হঠাৎ মনে হল অঞ্জনের কথাই ঠিক। সব কথা বলে লাভ কী? মুকুলকে হয়তো যেটুকু বলেছে সেটুকু বলাও ঠিক হয়নি। এর থেকে কত কী কল্পনা করে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমনকি ডাক্তারদেরও বলতে গেছে যে সে অসুস্থ, মিটিং এ যাবে না। মুকুল মাঝেমাঝে বাড়াবাড়ি করে।

মুকুল বলল, মিস্টার সোমের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বললে না কেন ম্যাডাম?

বিরক্তি ঢেকে আইভি বলল, অনেকক্ষণ বললাম তো, আর কত বলব। তাছাড়া উনি তো ওনার মেয়ের কাছে এসেছেন, আমার কাছে তো আসেননি। আচ্ছা মুকুল, তুমি অনিতাকে দেখলে? ব্যাপারটাকে পজিটিভ করে তুলো। চেনাশোনার মধ্যে তো।

—অনিতা খুব বাচ্চা মেয়ে। এত ছোট বয়েসে বিয়ে দিলেন উনি? আঠারো তো পার হয়নি।

চমকে উঠল আইভি। সে কী? ওরা যে কুড়ি বছর বয়স লিখিয়েছে। সত্যিই তো। সেটা কী করে সম্ভব?

—সম্ভবত ষোলোতে বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে দু'বার মিসক্যারেজ হয়েছে। আর মেয়েটা খুব ভয়ও পেয়েছে। ভয় পাবার কথাও। আমি ম্যাডাম, ওর সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছি। মনে হচ্ছে কেসটা সাকসেসফুল হবে। এমনিতে কোনও প্রবলেম নেই। কলকাতার কোনও ডাক্তার খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

মুকুল মাঝেমাঝে নিজের বয়স থেকে নেমে এমন আচরণ করে যে আইভির মনটা ভাল হয়ে যায়। আঠারো উনিশ বছর থেকে মুকুলকে দেখে আসছে সে। কতরকম অবস্থায় ওদের দেখেছে। কত রাগ করেছে ওদের দেখে। ওদের জন্য কতবার মনে হয়েছে ভরতপুর থেকে সে চলে যায়। মুকুল আমেরিকা থেকে ফেরার পর খুবই সাবধানে থাকতে হয়েছে আইভিকে। তবু এসব ছেলেমানুষিই তাদের সম্পর্কটাকে স্বাভাবিক করে দিয়েছে।

একতলার সেমিনাররুমে তখনও মিটিং শুরু হয়নি। অ্যাসোসিয়েসন এর চেয়ারপার্সন হিসাবে আইভি তখন সেন্টারের চেয়ারে বসেছে। এমনসময় বেয়ারা এসে বলল ম্যাডাম আপনাকে বাইরে ডাকছে।

ভ্রু কুঁচকে গেল আইভির। এইসময় কে তাকে ডাকে? মুকুল এসে প্রায় কানেকানে ফিসফিস করে বলল, মিস্টার সোম, তুমি একটু বাইরে যাও।

আইভির ভেতরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এত লোকের সামনে কী ব্যাপার অঞ্জনের? এভাবে মিটিং থেকে তাকে ডাকার কারুর সাহস হয়নি। প্রথমে ভাবল সে যাবে না। পরক্ষণেই মনে হল অনিতার কোনও বিপদ হয়নি তো। এই ব্যাপারটা তাকে উতরে দিতেই হবে। অঞ্জনকে চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ করে রাখতেই হবে। কিন্তু নার্সেরা কী করছে?

দ্রুত পায়ে আইভি দরজার কাছে দাঁড়াল। অঞ্জন মিটিংটার গুরুত্ব বোঝেনি। গুরুত্ব যে মিটিংটার এমন কিছু আছে তা নয়। কিন্তু এটা রীতি। আসলে ও ম্যাডামের গুরুত্বও বোঝে না।

—কিছু মনে কোর না, একটা কথা বলতে এলাম।

—খুব প্রয়োজনীয় কিছু?

—আমার কাছে তাই। রাগ কোর না। অনিতাকে আমাদের সম্পর্কে কিছু বোল না। প্লিজ আমার সম্পর্কে ওর অন্য ধারণা। তাছাড়া এসব নেবার মতো ওর বয়স হয়নি।

আইভির ইচ্ছে হল বলে তোমার সম্পর্কে যদি এতই অন্য ধারণা তো ষোল বছর বয়সে বিয়ে দিলে কেন? পরিবর্তে নিজেকে দমন করল সে। বলল বাড়ি যাও। এদিকে বেশি রাতে বাস পাওয়া যায় না।

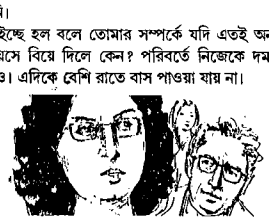

পরপর দুরাত্রিই ঘুম হল না। মিটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা ছিল না, কিন্তু হল। গৌতমীকে নিয়ে খুবই সমস্যা করছে মুকুল। মুকুল কয়েক বছর এসেছে ঠিকই, কিন্তু গৌতমীর তো এখানে বছর দুয়েক হয়ে গেল। একসময় যখন ও একমাত্র গাইনি ছিল, বাকি দু'জন ছেড়ে দিয়েছিল তখন দু'হাতে সব সামলেছে গৌতমী। কী পরিশ্রমই না করেছে ও। আইভি সেসব দিনের কথা ভুলতে পারে না। মুক্তেশ মারা যাবার পর তখন বেশ কয়েকমাস ফান্ড নিয়েও ভুগতে হয়েছে বেশ কিছু স্টাফ তখন তাদের ছেড়ে গেছে। গৌতমী যায়নি। এখানে চারদিকের গ্রাম থেকে মেয়েরা আসে। আজকাল দূরের শহরের লোকও আসছে। এই ডিপার্টমেন্টটায় চাপটা সত্যিই বেশি। আইভির বেশ মনে আছে মুকুল যখন ভরতপুরে পাকাপাকি ভাবে আসেনি, বছরে একবার আসত, তখন ওরা দুজনে কত বিষয় পরামর্শ করত। কত কেস নিয়ে আলোচনা করত। একবার গৌতমী তাকে পরিষ্কার বলেছিল: ম্যাডাম ডক্টর বোস যদি এখানে চলে আসেন তো দারুণ কাজের কাজ হয়। আমরা একেবারে আলাদা একটা মেটারনিটি ইউনিট করতে পারি।

আসলে ভরতপুরের এই হসপিটালে তো প্রথম দিকে শহরের লোকেরা ঠাঁই পেত না। মুক্তেশ তা চায়নি। গরীব মানুষদের জন্য নিজের সব টাকাপয়সা খরচ করে চেয়েচিন্তে এটা তৈরি করেছিল। মুক্তেশের মৃত্যুর পর গৌতমীই আইভিকে এমন সুপরামর্শ দিয়েছিল। খুলে দেওয়া হোক এই হাসপাতাল শহরের জন্যও। ওদের কাছ থেকে ভাল টাকাপয়সা পাওয়া যাবে। সেই পয়সায় আমরা সাঁওতালমুণ্ডাদের দেখব।' গৌতমীর মতো এত বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে মুকুলের এত কীসের লড়াই আইভি বুঝতে পারে না। মুকুলের অনেকরকম দোষ থাকতে পারে, কিন্তু গৌতমীকেও কয়েকটা সাধারণ ব্যাপারে বড় অনড় দেখল সে। আজকাল প্রায়ই ও ছুটি নেয়। হসপিটালে কাজ না করে সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে। এটা ভাল কি মন্দ, সেটা ব্যাপার নয়। এটা তাদের হসপিটালের নিয়মও নয়। এতে কাজের অসুবিধা হয় মিটিং এ আইভি দুজনকেই কিছু বলতে পারেনি। আলাদা করে কথা বলবে ভেবেছে। কিন্তু ওদের দুজনের এমন কথা-কাটাকাটি হল সবার সামনে যেটা তার ভাল লাগল না। আইভির মুকুলকে থামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডঃ বক্সী বা অমিতাভরা তার দিকে তাকিয়েওছিলেন। কিন্তু আইভি কিছু বলেনি। মুকুলকে কিছু বলার আগে বড় ভাবতে হয়। গৌতমী একসময়ের তার খুব প্রিয় পাত্রী। গৌতমীকে মুকুলের হাত থেকে বাঁচানর কথা ছিল তার। কিন্তু মুকুলের বিরুদ্ধে সে যায়নি।

রাত্রে আজকাল মুকুল তার ঘরে আসে। যদি অবশ্য নাইট ডিউটি না থাকে। সামান্য পান করে দুজনে। একপেগের বেশি আইভি কখনও নেয় না। অঞ্জন যে তার চেহারার চাকচিক্যের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছিল তা হয়তো এই জন্যই। মুকুলের দোষ দেবে না আইভি। মুক্তেশও ইচ্ছে করে তার এই অভ্যাস ধরায়নি। নিজেই ধরেছিল। মুক্তেশ নিজেকে অনেক বদলেছিল। এটা ছাড়তে পারেনি। মাঝেমাঝে চেষ্টা করত। কিন্তু ওইটুকুই। যখন পারত না তখন মজা করে বলত ওরা হাড়িয়া খায়, আর আমিও এটা খাই। আইভিকে হাড়িয়াও খেতে হয় ওদের উৎসব অনুষ্ঠানে। নইলে ওরা অসন্তুষ্ট হয়, অপমানিত হয়।

ফলত রাতে মুকুল ঘণ্টাখানেক থাকে। তখন নানান কথাবার্তা হয়। ব্যক্তিগত কথাও আজকাল সে বলে। প্রথমদিকে জেনির কথা যত বলত, এখন আর বলে না। জেনির চলে যাওয়াটা ওর খুব লেগেছিল। বদলেছেও ছেলেটা সেইজন্য। ডিভোর্স না হলে ভরতপুরে ও আসত কিনা সন্দেহ। আইভির সবকথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস নেই। মুকুলের সঙ্গে সহজও সে কোনওকালে ছিল না। মুক্তেশের ছেলে বলে যতটুকু গুরুত্ব দিতে হয়। কিংবা মুক্তেশ তাকে গুরুত্ব দিত বলে মুকুলের সঙ্গে যতখানি সুসম্পর্ক রাখতে হয় ততখানিই রাখে আইভি। তার বেশি নয়।

আগে গৌতমী তার কাছে আসত। এখন আর আসে না। আগে মাঝেমাঝে গৌতমীর সঙ্গে সে বেড়াতেও গেছে। গৌতমীর সঙ্গে ভরতপুরের নানা পরিবারের ভাব। খুব আলাপী মেয়ে ও। আইভির মতো একা একা থাকে না। গৌতমী আইভিকে নিয়ে গেছে কত সাঁওতাল বাড়িতে। ওদিকের জঙ্গলে, যেখানে এখনও লম্বা লম্বা শালগাছ আছে। নিয়ে গেছে কোলিয়ারিতে। ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছে আইভি। মোটা ডোনেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। ওদের টাকায় কয়েকটা গ্রামের মাঝে আটটা কুয়োও তৈরি করাতে পেরেছিল তারা। গৌতমীকে দেখে বারবার আইভির মনে হয়েছে মুক্তেশ এমন মেয়েকে দেখল না। কত খুশি হত গৌতমীকে দেখলে। মুক্তেশ যেমন তার হসপিটালের ভার আইভিকে দিয়ে গিয়েছিল, আইভির মনে হত এই ভরতপুর যেন গৌতমীর মতো মেয়ের জন্যই অপেক্ষা করছে। ক্রমে ক্রমে নানা ব্যাপারে আইভি যে ওর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলনা এমনও নয়। অবশ্য সে মুকুলের মতো কখনওই ছিল না। আইভি সব দায়িত্ব একসঙ্গে নিত না। ছাড়তেও জানত। অন্যদের বিশ্বাস করত। গৌতমী, ডক্টর বক্সী, এমনকি ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য স্টাফরা যে পুরোপুরি ফাঁকি দেবে এরকম ভাবনা তার ছিল না। অনেক লোক তো মুক্তেশের আমলের। মুক্তেশ লোক চিনত। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে ও লোক আনত। তারা সবাই অন্যরকম মানুষ। এক একজনের এক একরকম দায়িত্বও। মুক্তেশ বলত ওদেরকেও মনে করতে দাও যে হসপিটালটা ওদের নিজেদের। নইলে ভালবাসতে পারবে কেন? সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবে কেন? আর সত্যি বলতে কি তেমন সমস্যাও হয়নি। শুধু আইভির আমলেই দুটো ইউনিট তারা বাড়াতে পেরেছে। একটা চামড়ার আর একটা চোখের। ডাক্তারদের কোয়ার্টার্সও তৈরি করতে হয়েছে কয়েকটা। সত্যিই তো ভাল ডাক্তার নইলে এই অজ পাড়া গ্রামে আসবে কেন? সবাই ডেডিকেটেডই হবেন— এটাও আশা করা যায় না। তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টটাও এইসময় তৈরি করিয়েছিল সে। এতসব উন্নতি কি মুকুল দেখতে পায় না? তবে আর কী অতিরিক্ত সে করতে চায়? কোনও আমেরিকান পলিসি ও ছাড়ছে এখানে?

ভোর রাতে ড্রেস করে উঠে এল আইভি। আগে মাঝেমাঝে রাতে-বিরেতে ওয়ার্ডে ঘুরত সে। মুকুল দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অনেকদিকেই চোখকান দেওয়া বন্ধ রেখেছে সে। এটা হয়তো অন্যায় হয়েছে। আবার অন্যায়ই বা হবে কেন? মুকুলকে ভালমন্দ সবকিছু বুঝতে দেওয়া ভাল। নিজের বাবার জিনিস ঠিকঠাক বুঝে নিক। অন্যে তার বাবার মান রাখছে কি রাখছে না সেটা ওর ভাল করে জানা দরকার। হয়তো অন্য কারুর সঙ্গে গোলমাল হলে আইভির এত খারাপ লাগত না, খারাপ লেগেছে গৌতমী বলেই।

ওয়ার্ডে ঢুকতেই নার্স উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত একটি ফাঁকা বেডে একজন

নার্স ঘুমোচ্ছিল। একটি আয়া তাকে তুলে দিলে সেও প্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না আইভি। ও যে দেখেছে তাতেই যথেষ্ট কাজ হবে। একজনের অক্সিজেন চলছিল। আইভি তার কাছে এসে দাঁড়াল। নলটা ঠিকঠাক করে দিল। নার্স জানাল আজ ও অন্যদিনের থেকে ভাল।

মেয়েদের ওয়ার্ডে গৌতমীকে দেখতে পেল না। ওর আজকে তো নাইট ডিউটি ছিল। তবে কি কোয়ার্টারে ফিরে গেছে। যেরকম ঘটনাটা ঘটছে তাতে হয়তো আজকেও ছুটি নিয়েছে। ওর জায়গায় হয়তো কমলা চৌধুরী আছে। কিন্তু ডিউটি লিস্টে তো তা দেখেনি আইভি।

ডাক্তারদের রেস্টরুমে আইভি ঢুকল না। মুকুলের সঙ্গে দেখা হতে পারে। সে যে আগেকারমতো সব কিছু দেখতে বের হয়েছে এটা মুকুলের চোখে না পড়লেই ভাল। অবশ্য দেখলেই বা কী? তার অবজারভেশন থামানোই ভুল হয়েছিল। দায়িত্ব তো তাকে মুকুল দেয়নি, মুক্তেশ দিয়েছিল। মুক্তেশ নেই বলে তার অধিকার সব চলে গেছে এমন তো নয়। মুকুলের নামেই তো সব। তবু মুকুল তাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি। গৌতমীর সঙ্গে আজকের ব্যবহারে আইভির সেই পুরনো ভয়টা জাগছে। মুকুল কোনওদিন তার সঙ্গে গৌতমীর মতো আচরণ করবে না তো? তবে কি মুকুলকে জানান দরকার যে সে এখনও এখানে আছে। খাতায় কলমে আইনের চোখে মুকুল সব হলেও সেই এখানকার প্রধান। এই হসপিটাল, এই সমিতি এই গ্রাম সবকিছুকে সে হাতের চেটোর মতো চেনে। এখানে মুকুল একা কী করবে? আইভি যদি চলে যায় মুকুল কি সব চালাতে পারবে? মুকুলের কাছে মাঝেমাঝে নিজেকে জানান দেওয়া প্রয়োজন।

রেস্টরুমে অনেকে ছিলেন। সামান্য কথা বলল আইভি। ওরা চা খাওয়াতে চাইল। খেল না। খুব একটা গালগল্প কখনও করে না সে। মুক্তেশের সঙ্গে থেকে থেকে চিরকালই অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গে একধরনের দূরত্বে অভ্যস্ত সে। আসলে মুক্তেশ আর তাকে নিয়ে এত প্রশ্ন ছিল লোকের মনে, যে তার পক্ষে সকলের কাছে সহজ হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছে তারপর সবই মেনে নিয়েছে। আইভি কথায় কথায় গৌতমীর কথা জিজ্ঞেস করল কায়দা করে। গৌতমী এই ঘরে নেই। তবে তাকে কিছু আগে দেখা গেছে এটা জানাল সকলেই।

মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে বমির আওয়াজ আসছে। বমি করছে কেউ। গৌতমী করছেটা কী? তার তো একবার যাওয়া দরকার ছিল। মুকুল তাহলে ঠিকই লক্ষ্য করেছে গৌতমী অমনোযোগী হয়েছে। এসব কথা বললে গৌতমী বলতেই পারে কেন যাব? সিস্টাররা তো আমাকে খবর দেয়নি। অথচ আগে আগে একা হাতে গৌতমী সব করত। কখনও সে ডাক্তার, কখনও সেই সিস্টার। কাজের ভাগ জানত না ও। আইভি মিটিং-এ বারবার ওর প্রশংসা করত। ওর উদাহরণ দিত। এখন হয়তো তেমন কিছু হয়নি। যদি হয় গৌতমীকে সিস্টাররা খুঁজবে কোথায়? মুকুল হয়তো ঠিক কথাই বলে।

মুকুলের চেম্বারটা একতলাতেই, একটু ভেতরে। ও নির্জনতা পছন্দ করে। মুক্তেশ তো মাঠেই টেবিল নিয়ে বসে পড়ত। যে খুশি কাছে আসতে পারত। যে কোনও প্রবলেম বলতে পারত। এখন সে কাজ দেখে রিসেপসনিস্টদের। মুক্তেশ কি এসব পছন্দ করতে পারত? মুকুল বলবে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে আমাদের। বাবার পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, চেয়েচিন্তে বহু কিছু জোগাড় করেছিলেন। আমরা তা পারি না। কত দূর থেকে আমাদের পেশেন্ট আসছে আজ। এ তো আর সেই ছোট হসপিটাল নেই। সায় দিয়েছিল আইভি। কমপিউটার ফোন ফ্যাক্স লাগিয়ে সবই আধুনিক করে তুলেছে মুকুল। জোর করে আইভিকেও কমপিউটার শিখিয়েছে। প্রথম প্রথম সবই বেমানান লাগত, এখন মানিয়ে নিয়েছে। মুকুল অবশ্য ভরতপুরের নামটাকে অনেকদূর ছড়িয়েছে। মুক্তেশের আমলে ভরতপুরের বাইরে মুক্তেশের নাম লোকে জানত না, মুকুলের আমলে জানে।

মুকুলের চেম্বারের পর্দা ওঠাল আইভি। কমপিউটারে মুকুল কী সব করছে। চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ডানদিকে। সামনে গৌতমী বসে মুকুলকে একদৃষ্টে দেখছে। দৃশ্যটা অদ্ভুত। যেন কিছু বলতে এসেছিল সে। মুকুল শুনছে না। শুনবে না। গৌতমীকে অসহায় লাগল। চেহারায়, আচরণে, সবকিছুতেই ওর একটা ডাকাবুকো ভাব আছে। অথচ সব যেন হারিয়ে ফেলেছে।

পর্দাটা ছেড়ে দিল আইভি। দুলতে লাগল সেটা। দ্রুত সরে এল সে। গৌতমী আর মুকুলের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। যদি নিজেরা নিজেরা সব বোঝে, সব মিটিয়ে ফ্যালে তো কোনও সমস্যা থাকবে না। একথা মুকুলকেও বলবে আইভি।

মেয়েটার বমির আওয়াজ ভয়ঙ্কররকম বেড়ে গেছে। ওয়ার্ড থেকে এতদূরেও সেটা শোনা যাচ্ছে। আইভি দেখল গৌতমী ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদিকেই গেল ও। গৌতমীর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

মেয়েটা বমি করতে করতে সব পড়েছে। গৌতমী সিস্টারদের সাহায্যে ওকে শুইয়ে দিচ্ছে। ইনজেকশন দিল ও। আইভি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। গৌতমীও ওকে একঝলক দেখল। সে ভেবেছিল গৌতমী এগিয়ে আসবে। কিন্তু এল না। ওয়ার্ডটায় দুবার পাক দিয়ে ওপাশের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

আইভিকেও যেতে হল। তখন ভোর হচ্ছে। বড় বড় গাছের ওপর পাখিরা বিশৃঙ্খল ভাবে উড়ছে। খুব ডাকছে ওরা। শীতও খুব বেশি। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এসময়ে বাইরে থাকা আইভির পক্ষে ঠিক নয়। তবু সে গৌতমীর কাছাকাছি দাঁড়াল। গৌতমী তার দিকে তাকাচ্ছে না। তার অস্তিত্ব উপেক্ষা করছে যেন। অথচ এরকম হবার কথা নয়। মুক্তেশের সে ডানহাত ছিল। মুক্তেশ মারা যাবার পরও, যতদিন না মুকুল ওদেশ থেকে এসেছে। ততদিন ও তো ছিল সর্বময় কর্তা, আজও আইভিকে উপেক্ষা করা সোজা নয়। গৌতমীর কি তবে খুবই অভিমান হয়েছে? আইভির ইচ্ছে হল ওর কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু এটা পাবলিক প্লেস। এটা তাদের কারুরই ঘর নয়। কী বলবে ভেবে না পেয়ে আইভি অনিতারই কথা তুলল। সাত নম্বর কেবিনের পেশেন্ট কেমন আছে গৌতমী?

—ও আপনার ক্যান্ডিডেট, না?

—ওদেরকে আমি চিনি এইটুকুই।

—শুধু এইটুকুই?

ওর কথার ধরনে বিরক্ত হল আইভি। কী বলতে চায় গৌতমী? তবে কি মুকুল ওকে...। তীব্র চোখে চেয়েছিল সে। তুমি কী বলতে চাও স্পষ্ট বল।

—বলতে চাই, এখন যা হচ্ছে আগে এরকম হত না।

—মানে?

—মানে, সাত নম্বরের পেশেন্ট তো সাত নম্বরে নেই, নয় নম্বরে চলে গেছে এয়ার কন্ডিশনে। এভাবে তো অ্যাডমিশন হয়নি।

আইভি আকাশ থেকে পড়ল। —সে কী? আমি তো কিছু জানি না। আমি তো সাত নম্বরেই জানি। কী করে এটা হল?

—ফেভারিটদের এরকমই হচ্ছে আজকাল। কিন্তু এটা তো এখানকার নিয়ম নয়।

কোথাও ভুল হয়েছে তাহলে, দেখছি।

—কোথাও ভুল নেই ম্যাডাম, ডক্টর বোসই নিয়ে এসেছেন। এখন তো কোন লোক নেই তাই। কিন্তু যদি হঠাৎ পেশেন্ট চলে আসে তখন কী হবে? তখন আবার সাত নম্বরে নিয়ে আসবেন তো উনি?

আইভি অবাক হল। মুকুল কি সত্যিই এমনটা করেছে? এ কাজ করতে গেল কেন ও? অঞ্জনের সঙ্গে তো আলাপ পর্যন্ত করে দেয়নি ওরা। তবে কি আইভির জন্য? আইভিকে এতটা নীচে নামান ওর ঠিক হয়নি। সে তো কেবল বলেছিল একটু দেখতে। গৌতমী বলছে মাত্র অন্য কেউ ভাবছে নিশ্চয়। এভাবে কি এখানে কাজ চলবে?

ফিরে যাচ্ছিল আইভি। হঠাৎ পিছনে ফিরে বলল: তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কী করতে বল।

—আমার কিছুই বলার নেই। ইনফ্যাক্ট এখানে আর আমার কোনও কথা থাকছেও না। আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। কী করবেন সেটা আপনারা ঠিক করবেন।

আইভি গম্ভীর হল। গৌতমী তার সঙ্গে এভাবে কখনও কথা বলে না। ও যা ইঙ্গিত করছে তা আইভির বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এমন নয়। ও মিটিং-এর কথা তুলছে। মুকুলকে ফেভার করা হচ্ছে বলে ভাবছে। গৌতমীরা কেউই যে কথা ভাবতে পারছে না সেটা হল রথের রশি আর আইভির হাতে নেই। সে শুধু লোক দেখান টানছে। কোনও জোর তার নেই। সবই মুকুলের।

আইভি কেবিনের দিকেই আসছিল। কী ভেবে গৌতমী তার সঙ্গ নিয়েছে। হয়তো ভাবছে ম্যাডামের খারাপ লেগেছে। সুর তার নরম হয়ে এসেছে। আইভি কোনও কথা বলছিল না। একতরফা গৌতমী বলে যাচ্ছিল। ওই পেশেন্ট ভাল আছে ম্যাডাম। আমরা সব চেকআপ করে ফেলেছি। ওর শুধু রেস্ট দরকার। বেডসোর্স্ট। মাস দেড়েক তো বাকি আছে ডেলিভারির। ওকে ছুটি দিয়ে দিলেই তো হয়।

আইভি উত্তর দিচ্ছিল না। ব্যাপার সরেজমিনে দেখেই সে মুকুলের কাছে যাবে। মুকুল হসপিটাল নিয়ে যা খুশি করুক তাতে আইভির আপত্তি নেই। কিন্তু তাকে জড়িয়ে এসব উল্টোপাল্টা কাজ করবে কেন? এতে ভুল সংকেত পৌঁছাচ্ছে।

গৌতমীকে ছেড়ে গিয়ে আইভি ন'নম্বর কেবিনের কাছে এল। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে দেখল রাজকন্যার মতো একটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে। প্রথমদিন একঝলক দেখেছিল তখনও তো জানত না ও

অঞ্জনের মেয়ে। তারপর অঞ্জনকে দেখেছিল ভিড়ের মধ্যে। ওর সঙ্গে প্রাথমিক কথাটুকু বলাই তখন ছিল মুশকিলের। তাছাড়া এতদিন পর ওইরকম ভিড়ে রিসেপসনে অঞ্জনের মতো কাউকে দেখার অনুভূতি বর্ণনা করা কঠিন। তখন আবার মুকুল এসেছে একটা কাজে। সেদিন কাজও এত বেশি ছিল অঞ্জনের সঙ্গে এই মেয়ের কাছে আসা হয়নি। আর তারপরের দিন তো কে যেন তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাইশ বছর পিছনে টানছিল। আর অঞ্জনকে তো তার অফিসে বসানো গেল না। ঘরে আনতে হল। এই তবে অঞ্জনের মেয়ে। ইরার মেয়ে। আইভি শরীরে কাঠিন্য টের পাচ্ছিল। সুন্দরী। ইরার মতোই দেখতে। মুখের নিচের দিকটা অঞ্জনের মতো। তখন হয়তো এইরকমই ইরা দেখতে ছিল যখন অঞ্জন তাকে বিয়ে করেছিল। সুন্দরের প্রতি, বিশেষত সুন্দরীর প্রতি অসম্ভব টান অঞ্জনের। একসময় বারবার ইরার কথা বলেছে সে। আজ তার মেয়ে আইভির হাতে। আর অঞ্জন কৃপাপ্রার্থী। কী করবে অঞ্জন, আইভি যদি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলে; দ্যাখো, আমার পরিচয় তুমি জান? বললেই বা কী হবে? কষ্ট পাবে? অঞ্জন ছোট হয়ে যাবে? শুধু এইটুকু? এতটুকু কষ্টে কাতর। এরকমই বয়সে তো অঞ্জন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল— সে কথা কী ওর মনে নেই? সে কষ্টের সঙ্গে এ কষ্টের তুলনা? এটুকু বলতেই অঞ্জন তাকে মিটিং থেকে ডেকে আনল? হায়রে!

আইভি লক্ষ্য করল, কেবিনে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে মুকুল ঢুকছে। ওর হাতে দুটো সাদা গোলাপের কুঁড়ি। মুকুল নিঃশব্দে অনিতার মাথার পাশে টেবিলে রাখল। ফিসফিস করে বলল: তুমি কতক্ষণ? বেরিয়ে এল আইভি। অনিতাকে নিয়ে মুকুলের বাড়াবাড়িটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

—একটু পরে উঠেই দেখবে। খুব খুশি হবে।

আইভির মুখে কথা ছিল না। ভাবছিল সুন্দরী মেয়েদের কত ক্ষমতা। যে কোনও বয়সের পুরুষকেই হাত করে নেয়। মুকুল আজ যেটা করল সেটা কি কোনও সাঁওতাল মেয়ের জন্য ও করবে? গৌতমী বোঝেনি, মুকুল আইভির পরিচিত বলে এসব করছে না, অনিতা বলেই করছে।

—ওর একটু বেশিক্ষণ ঘুমান ভাল। সিস্টারদের বলেছি ওকে না জাগাতে।

আইভি বলল, গৌতমী বলছিল ওর এখন কোনও প্রবলেম নেই। খালি রেস্ট-এর দরকার। সে তো ঘরেও হবে।

—উঃ, বিরক্ত হল মুকুল। গৌতমী শরীরটাই দেখছে। ওর মেন্টাল প্রেসার আছে। ও সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট। এইসময় ও যে বাড়ি ফিরে বেডরেস্ট-এ থাকবে এর কোনও মানে আছে? এতে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

—তুমি আজকাল ও চিকিৎসাও করছ নাকি মুকুল?

—আরে, কী বলব তোমাকে? গৌতমী তোমার কাছে এসব রিপোর্ট করেছে?

—রিপোর্ট করার ব্যাপার নয় মুকুল। ঘটনাটা হচ্ছে অনিতা যে আমার পরিচিত সেটা যেভাবেই হোক সকলে জানে। কাজেই তুমি যদি তার জন্য কিছু স্পেশাল ব্যবস্থা কর তাহলেও লোকে ভাববে সেটা আমার জন্য। আমি এরকম নই মুকুল। আইভির গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

—আশ্চর্য, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ম্যাডাম।

—তুমি সবজিনিস বুঝবেও না। মুকুল। আমরা এখানে ইক্যুয়ালিটির ওপর জোর দিয়েছিলাম। আমরা শপথ নিয়েছিলাম একজন সাঁওতালের সঙ্গে ভদ্রলোকের কোনও পার্থক্য রাখব না। কারুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করব না।

—তুমিই তো অনেককিছু বদলেছ ম্যাডাম, কেবিন সিস্টেম আর যাই হোক, আমি অন্তত এসে করিনি। মুকুল ব্যাপারটা লঘু করার চেষ্টা করছিল।

—কেবিন সিস্টেম করেছি, যে যেরকম টাকা দেয়, সেইমতো ব্যবস্থা করেছি। যে সাধারণ কেবিনে থাকতে চেয়েছে তারজন্য স্যুইটের ব্যবস্থা করিনি। আইভি হাঁফাচ্ছিল।

—বুঝেছি তোমার কথা। আসলে ওটা তো ফাঁকা ছিল। ক'দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই।

—আমার বলার কিছু নেই মুকুল। আগেও তোমায় বলেছি তোমার যা ভাল লাগে তাই কর। কিন্তু এর সঙ্গে আমি জড়িত। তাই খারাপ লাগছে।

—গৌতমী তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

—না, চাপা চিৎকার করল আইভি। মুকুল দাঁড়িয়ে গেল। বলল: রাগ কর না এত, শরীর খারাপ হবে। তুমি আইনটাইন নিয়ে যদি কথা বল, এমনকি গৌতমীও যদি বলে, আমি বলব ভুল করেছি। কিন্তু আইন ছাড়া আরও অন্য ব্যাপার আছে ম্যাডাম। সবকিছু অত বাধো বাধো চলে না। এটায় এমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি হয়নি।

—বললাম তো, তুমি বুঝবে না।

—বুঝব না সত্যিই। আচ্ছা তুমি আমার চেম্বারে চল, চা খাবে। মাথা ঠাণ্ডা কর তো।

আইভি নিজের ঘরে ওঠার সিঁড়ি ধরল। মাথাটা সকালবেলাতেই ধরে গেছে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না আজকাল শরীরটাও খারাপ লাগছে।

—তুমি যাবে না আমার চেম্বারে? ফার্স্ট ক্লাস চা খাওয়াতাম। মিস করলে।

আইভি পাশ ফিরে চেষ্টাকৃত হাসল। মুকুল এরকমই। যা করার তা করবে। তারপর এইভাবে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে।

—ওকে তো তুমি দেখলে ম্যাডাম। জাস্ট লাইক অ্যা বেবি। ডল। ওর জন্য ভাল একটু ব্যবস্থা করা যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, করব না?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল আইভি। নিচে দাঁড়িয়ে মুকুল বলল: তুমি রাগ করলে, অথচ এ কাজ তোমারই করা উচিত ছিল।

—আমি এরকম কাজ কখনও করি না, নেভার।

আইভিকে চমকে দিয়ে মুকুল বলল, ও তোমার মেয়ে হতে পারত। এটাই সবচেয়ে পসিবিলিটি ছিল। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা। মানুষ নিজের জনের জন্য একটু বেশিই করে। এটা রিয়ালিটি।

আইভি আর থামল না। সে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগল।

আইভি বিছানায় শুয়ে লেপটাকে প্রায় মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিল। সবকিছুই তার ঠাণ্ডা লাগছে। এত ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আসলে ভোরবেলাতে তার বের হওয়াই উচিত হয়নি। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া লাগল। পা থেকেই তার কাঁপুনি উঠছিল। এসময় কফি পাওয়া গেলে ভাল হত। কিন্তু কে আবার করে। এ ঘরে একটা কলিংবেল আছে। টিপলে নিচ থেকে কেউ না কেউ উঠে আসবে। কিন্তু ইচ্ছে হল না। মাঝেমাঝে আইভির মনে হয় কেন এখনও আছে এখানে? নিজেকে খুব ছোট লাগে, হতাশ লাগে। মাঝেমাঝে এরকম পর্ব যায়। তারপর আবার সব ঠেলেঠুলে ভুস করে জেগে ওঠে। উঠতে হয়।

কিন্তু কোথায় যাবে আইভি? যাবার কোনও জায়গাই রাখেনি সে। আস্তে আস্তে সবকটা জায়গা ছেঁটে ফেলেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুর অস্তিত্বটুকু নেই। শুধু আছে ভরতপুর, এই হসপিটাল। কয়েকটা গ্রাম। শুধু মুক্তেশ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তার মনে হত এই তো বাঁচবার জায়গা। এখানে সে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে। অন্যের জন্য কিছু করছি— এ ভাবনা এত পরিতৃপ্তির, যে নিজের চাওয়া পাওয়াগুলোর কথা মানুষ ভুলে যায়। তাছাড়া মুক্তেশ তাকে গার্ড দিয়ে রাখত। অবশ্য গার্ড দেবারই বা কী ছিল? মুক্তেশ এমন ধরনের মানুষ, যার প্রতি আপনাআপনিই মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। জামাকাপড়ের ঠিক নেই, খাওয়াপরার ঠিক নেই। আইভিকে দেখতে হত সব। মাঝেমাঝে মুক্তেশের সবকিছু পরিপাটি করে সাজিয়ে দিলে ও আফসোস করত। বলত তোমাকে এখানে নিয়ে আসা আমার ঠিক হয়নি ম্যাডাম। আমি তিল থেকে তাল করেছি। একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেললাম, আর তোমার জন্য একটা পাত্র জোগাড় করতে পারতাম না? এটা তোমার ঠিক জায়গা হল?

—এটাই আমার ঠিক জায়গা ডাক্তার। এখানেই যেন আমি মরি। আপনি এই জায়গা গড়ে তুলেছেন। এটা আপনার সৃষ্টি। আর আমি এখানে এসে বেঁচে গেছি। আমি আর কোথায় যেতাম বলুন?

—তুমি কেন বলত কিছুই ভুলতে পার না? এখনও অতীতকে আঁকড়ে আছ তুমি? আমি তোমায় খুব বকব। তুমি আমাকে দেখ তো।

—আপনার ব্যাপারটা অন্যরকম।

—সবেরই দুঃখ আছে। সব দুঃখেরই গভীরতা আছে। একসময় যেখানে তীব্র স্রোত বইত, সেখানে কি চড়া পড়ে না? তুমি একজায়গায় কেবল আটকে থাকবে?

—আমি যে ভুলতে পারি না ডাক্তার।

—এইটুকু ঘটনা ভুলতে পার না? মুক্তেশ হাহা করে হাসত। দ্যাখ, এই যে একটা গাছ, এ যখন বড় হচ্ছে এর তখন একটা ডাল যদি কেটে ফেল, এ বাঁচবে না? কত শাখা বের হবে। কত সুন্দর হবে এই বৃক্ষ। আমরা তো এই প্রকৃতিরই সন্তান, প্রকৃতিকে দেখে আমরা কিছু শিখব না?

শিখেছিল আইভি। নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল ভরতপুরের সর্বত্র। জড়িয়ে গিয়েছিল ডাক্তার মুক্তেশ বোসের সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। সে তো সামান্য নার্স। মুক্তেশ তাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মরার মতো ঘুমিয়েছে। তখন তো নিজেকে কত সার্থক মনে হত। গ্রামের পর গ্রাম যখন অ্যামবুলেন্স নিয়ে মুক্তেশের সঙ্গে ঘুরত। তখন লোকজনের চোখমুখে তাকে পরিশ্রমে অনুপ্রেরণা দিত। সে কী কৃতার্থের হাসি। মুক্তেশকে তো কত লোক দেবতাজ্ঞান করত। তাকেও কী কম কিছু মনে করত। সেইসব সমৃদ্ধির দিনে আইভি কেন এরকম দিনের কথা একেবারে ভাবেনি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেনি। সে কি মুক্তেশকে দেখে? ও রকম বলিষ্ঠ সবল চেহারা দেখে? আইভি যখন তাকে দেখত মনে হত এই মানুষটার কী অসীম সাহস, কী অসীম ক্ষমতা। পৃথিবীর সমস্ত এনার্জি যেন মুক্তেশের মধ্যে এসে মিলেছে। এই লোক কখনও মরতে পারে? এ অমর মানুষ। এ মরে গেলে পৃথিবীই থাকবে না। যথেষ্ট দীর্ঘজীবী হয়েছিল মুক্তেশ, কিন্তু সে তো জীব। প্রাণী। মানুষ। সে তো দেবতা নয়। অশিক্ষিত মানুষগুলোর মতো সেও ভুল করে তাকে দেবতা ভেবেছিল।

বিছানার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে আইভি। লেপটা যেন কিছুতেই গরম হচ্ছে না। তির তির করে কেঁপে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। থার্মোমিটার হাতের কাছে রাখা উচিত ছিল। ঘরে ওষুধপত্রও তেমন নেই। অনেক জমেছিল বলে সেদিন একবাক্স প্রায় স্টোরে দিয়ে এসেছিল। অন্তত একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ছাড়া এ মুহূর্তে চলবে না।

কাকে ডাকা যায়? ক্লাস ফোর কোনও স্টাফকে ডেকে বলা যায়। কলিংবেল টিপলে যাদের উঠে আসার কথা। কিন্তু ওদের তো তেমন করণীয় কিছু নেই। ওদের মাধ্যমে কোন ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। ভরতপুরে তো আলাদা করে কোনও ওষুধের দোকানও নেই। গৌতমীকে ডাকতে পারত। কিন্তু গৌতমী তাকে এতটা ভুল বুঝল কেন? ভরতপুরে মুক্তেশের মৃত্যুর পর যাদের কিছুটা সান্নিধ্য সে দিয়েছিল— তার মধ্যে তো গৌতমী প্রধান ছিল। তবে কি গৌতমী বুঝে গেছে পাওয়ার তার হাত থেকে চলে গেছে। অনিতাকে যদি আজকেই বেলা বারোটায় ছুটি দেওয়াতে পারত আইভি, তাহলে একটা কাজের কাজ হত। কিন্তু মুকুলের রকমসকম দেখে সেটা যে সম্ভব নয় এটা বুঝে গেছে।

ডক্টর বক্সী বয়স্ক লোক, তিনি থাকলে আইভি ডেকে পাঠাত।। কিন্তু বাকি সব জুনিয়ররা এখন ডিউটিতে আছে। মুকুলকে বাদ দিয়ে ওদের কাউকে ডেকে নিজেকে দেখান শোভনও নয়। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া সেন্টার থেকে এক দানা বড়িও বের করা যাবে না। তবে কি সে ডক্টর বক্সীর জন্য অপেক্ষা করবে? সকলা দশটা পর্যন্ত। আজ তো ওনার আউটডোর।

পূর্বমুখী জানলা দিয়ে তেরচা ভাবে রোদ এসে পড়ল। আইভির মনে হল এভাবেই হয়তো একদিন সে মরে যাবে। লছমি বিকেলবেলায় ঘরসাফ করতে এসে তাকে দেখবে। কিংবা অফিসে নেই দেখে মুকুল ঘন ঘন ফোন করবে। সেই ফোন কেউ ধরছে না দেখে কোনও লোক পাঠাবে। এই তো উপযুক্ত সময় তার মৃত্যুর। এই সময়ই অঞ্জনের কথা মনে করে একটু হাসি পেল আইভির। সে নাকি আশ্চর্যরকমের সুন্দর হয়ে উঠেছে। হায় ভগবান, এই বয়স কি সুন্দর হবার মতো? মৃত মুখ দেখেও আজ হয়তো অঞ্জন বলবে— কী সুন্দর।

মুক্তেশ কখনও এরকম কথা বলেনি। সে সুন্দরী না অসুন্দরী কখনও খেয়াল করেই দেখেনি। তাই একধরনের বাঁচোয়া ছিল। বরং বলত নার্সের পোশাক দেখলেই পেশেন্টের মনে একটা জোর আসে, জান ম্যাডাম। আমাদের ডাক্তারদেরও নির্দিষ্ট পোশাক পরা বাধ্যমূলক হওয়া উচিত।

আইভি বলত, আপনি তাহলে অমন একটা ড্রেস বানান না কেন? দেখতে তো ভালই লাগবে। কীরকম চাষার মতো হয়ে থাকেন।

মুক্তেশ হাসত। তোমার বুঝি সখ হয় আমি অমনি পোশাক পরি? ডাক্তার অদ্ভুতভাবে তার দিকে মাঝেমাঝে তাকাত। সে চোখের ভাষা ঠিকঠাক পড়তে পারত না আইভি। তবে বেশিক্ষণ নয়। বদলে ফেলত নিজেকে। বলত এই পোশাকের থেকেও যদি ওঝাদের মতো লাল পাগড়ি, আলখাল্লা পরতে পারতাম তো আরও ভাল হত। বুঝলে ম্যাডাম।

—কিছু বুঝলাম না।

—তোমার মাথাটা একদিন হাতুড়ি দিয়ে ঠুকব।

—একদিন মেরে ফেলুন না আমাকে, ল্যাটা চুকে যায়।

—কে যে কাকে মারে! মুহূর্তে জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যেত মুক্তেশ। তারপর বলত: আসল কথাটা তো শুনছ না। ওঝাদের মতো পোশাক পরলে কী হত জান, যেসব লোক এখনও রোগটোগ লুকোচ্ছে তারা দৌড়ে এসে হত্যে দিত। বুঝলে এবার বোকা মেয়ে।

মুক্তেশকে এইসময় কত নরম লাগত। আবার যখন রোগী দেখতে যেত, অসুস্থদের তুলে নিয়ে আসত হসপিটালে তখন সামান্য এদিক ওদিক হয়ে গেলে ভয়ানক বকুনি খেত আইভি। কার সামনে বকছে, কী কথা বলছে কিছুই খেয়াল থাকত না। প্রথমদিকে অপমানে চোখে জল চলে আসত। তারপর মুক্তেশের মেজাজ বুঝে গিয়েছিল, শিখে নিয়েছিল সে কী চায়। শেষদিন পর্যন্ত মুক্তেশ রোগী দেখলে তার পাশে সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। তখন তো অনেক সিস্টার এসেছে ভরতপুরে। দু'জন মেল নার্সও রেখেছে তারা। তবু মুক্তেশের মেজাজের সঙ্গে আর কেউ কাজ করতে পারত না। মুক্তেশ কাউকে নিতও না।

মুক্তেশ তো অন্যরকম মানুষ। সংসারের মাপে ওকে বিচার কখনও করতে যায়নি আইভি, ওর রক্তমাংস কদাচিৎ অনুভব করেছে। ওর চোখই তো অন্যরকম। আইভি তো মুক্তেশের মত নয়। আদর্শবানও নয়। মানুষের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও নয়। মুক্তেশ তাকে বদলে তৈরি করেছিল। নতুন করে রূপ দিয়েছিল। সে ছিল তখন গনগনে আঁচে পোড়া লোহার মতো। নরম, গলন্ত। যাকে যেভাবে ইচ্ছে বাঁকান যায়।

সে ছিল সাধারণ ধাতু। সাধারণ মেয়ে। বিয়ের স্বপ্ন, সংসার, সন্তানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে ওঠা একটি নবকিশোরী। এই পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে পা ফেলে সে হাঁটত, পাখির মতো গান গাইত। অঞ্জনের জন্য, অঞ্জনের পথে হাঁটতে গিয়ে সে আগুনে এসে পড়ল। আইভির জীবন তো এরকম হবার কথা ছিল না। তার কি প্রেম পাবার, স্বামীসঙ্গ পাবার অধিকার ছিল না?

মাথাটা ব্যথা করছে খুবই। আইভি খাটের খাঁজে কপালটা ঢুকিয়ে দিতে চাইল। কাঠের তীক্ষ্ণ খাঁজের সঙ্গে কপালের ধাক্কায় যে যন্ত্রণা সে পাচ্ছে তাকে সে গ্রহণ করছে। দশটা পর্যন্ত কি সে সহ্য করতে পারবে। ঘড়ি মাত্র সাতটা দশ বেজে টিকটিক করছে। ঘড়ি দেখার পর অস্থিরতা আরও বাড়ল। কোনও উপায় নেই। গৌতমীকে খবর দেওয়া ভাল। কেউ উঠে এলে দুকলম লিখে তাকে দিয়ে গৌতমীকে পাঠাবে। ওকে আসতে বারণ করবে। কয়েকটা ওষুধ পাঠিয়ে দিলেই হবে।

কলিংবেলটা টিপে বিছানা থেকে একটু উঠে টেবিল থেকে টুকরো কাগজ নিল লেখার জন্য। কিন্তু লেখা গেল না। কাঁপতে কাঁপতে ফের লেপের তলায় ঢুকে গেল। হাতের মধ্যে কাগজ মুচড়ে গেল। একটা অসহ্য কষ্টে তার সমস্ত শরীরটা গুটিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর সে তার দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েছিল। লছমি ঘরে ঢোকার সময় সে মাথাটাকে কেবল লেপের বাইরে বের করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনও কথা বলতে পারেনি। খানিকপরে মুকুল এসেছিল। ওকে ওষুধ খাইয়ে গিয়েছিল। মুকুলের সামনে আইভি নিজেকে শক্ত রাখছিল। একটু আগে যে বাঁধভাঙা একটা কষ্ট তার শরীরকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছিল সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করছিল।

মুকুল বলল: বাধালে তো। তখনই বলেছিলাম এত রাগ ভাল নয়।

জ্বরের মধ্যেই তীব্ররাগে আইভি মুকুলের দিকে চেয়েছিল। মুকুলকে বলতে হয়েছিল: দুঃখিত ম্যাডাম। কিন্তু এখানে একা ঘরে কী করে থাকবে? চল নিচে চল। দশ নম্বরে থাকবে। অনিতার পাশে। আমি সারাক্ষণ দেখতে পারব।

—এয়ারকন্ডিশনড? আমার পোষাবে না। তোমারও অসুবিধা হবে মুকুল। আইভির গলায় শ্লেষ ফুটল।

—অসুবিধা? কীসের জন্য? মুকুল যেন বুঝতে পারছে না।

—তোমার অনেক কাজ আছে। আমার এ সামান্য জ্বর। একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করলে কি না করলেও ভাল হয়ে যাবে। ঠাণ্ডাটা লেগে গেল।

—তুমি তো ডাক্তার, তাই না ম্যাডাম? বাবা তোমাকে এটাও শিখিয়ে দিয়েছেন তো।

—ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করো না। আমার ভাল লাগে না।

—তুমি বড় সিরিয়াস। মুকুল নিচু হয়ে ওর ঠাণ্ডা আঙুলের টোকা মারল আইভির কপালে।

আইভি লেপটাকে ফের মাথা পর্যন্ত টেনে নিল। মুকুল এভাবে ঘনিষ্টতা করতে চায়। তার ভাল লাগে না। মুক্তেশের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল, মুকুলের সঙ্গে তার তা নেই। হবার কথাও নয়। মালিক আর কর্মচারির সম্পর্কের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা থাকে সেটুকু আইভি বারবার নির্ধারণ করে দিতে চেয়েছে। নির্দিষ্ট সময় কাজ করে সে, নির্দিষ্ট মাইনে নেয়। বাড়িভাড়া দেয়। আসলে মুকুল যে কী চায় সেটা হয়তো নিজের কাছেই ওর পরিষ্কার নয়। হয়তো ও খুব চালাক। হয়তো এটা ও বুঝেছে যে ওরপক্ষে একা এত

তাড়াতাড়ি এই হসপিটাল, এই সমিতি চালানো সম্ভব নয়। কাজেই ব্যবহার করছে আইভিকে। মুকুল জানে না মুক্তেশের শিক্ষার প্রভাব তারমধ্যে এমন শিকড় চালিয়েছে যে— সে এখানকার সর্বময়কর্ত্রী হলেও যা করবে, সাধারণ কর্মী হিসাবেও তাই করবে। আইভি লেপটাকে সামান্য সরাতে গেল। দেখল মুকুল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে। অবাক লাগল আইভির, অস্বস্তিও হল, বলল: আমি ভাবলাম তুমি চলে গেছ।

—কেবিনে যাবে? এভাবে একা থাকবে তুমি?

—একাই তো থাকি, অভ্যাস আছে আমার।

—চল কেবিনে, ওখানে আরও অনেকে আছে।

আমারও কাজ আছে। মাঝেমাঝে তোমায় এসে দেখতে পারব।

—তোমার কি চিন্তা হচ্ছে? আইভির গলায় সামান্য বিদ্রুপ। তারপর নিজেকে সামলে বলল: তুমি যাও, লছমিকে বরং পাঠিয়ে দাও।

চলে যাচ্ছিল মুকুল। আবার ফিরে এল। বলল: আচ্ছা, তুমি কী চাও বল তো অনিতাকে ছেড়েদি?

—তুমি ছাড়বে না রাখবে তা আমি কী করে বলব? আমি ডাক্তার? তাছাড়া এসব আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

মুকুল হাসল। নীরব হাসি। তুমি অনেক অভিজ্ঞ ম্যাডাম।

—সব জায়গায় অভিজ্ঞতার দাম হয় না। দরকার নেই।

—আচ্ছা, তুমি সত্যি একটা কথা বলবে? গৌতমী বলল বলেই তুমি চাইলে না যে অনিতা এখানে আরও কিছুদিন থাকুক, নাকি এটা তোমার নিজস্ব মত?

—এ নিয়ে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। আমার শরীর ভাল নয়, দেখছ তো। তাছাড়া এই হসপিটাল এখন তোমার দায়িত্বে। ডিসিশন নেবার সব ভার তোমার। আমি কী ভাবছি আর না ভাবছি তাতে সত্যিই কি কিছু এতে এসে যায়?

তবু মুকুল চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়েই আছে। মুকুল আইভিকে যেন পরীক্ষা করছে। যেন ওকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায় এই হসপিটাল তার। মুক্তেশের পর তার প্রথম অধিকার। মুকুলের অধিকার অনেক পরে। মুকুল যেন শুনতে চায় আইভি বলছে তোমরা দু'ভাই তখন কোথায় ছিলে যখন মুক্তেশ সাঁওতালদের ঘরে নুনভাত খেয়ে ভরতপুরে পড়ে ছিল? মুক্তেশ তার সব সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছে বলে তোমরা কি কম খারাপ কথা বলেছ? ডাক্তার হয়ে আমেরিকা গেছ, তবু ভরতপুরের হসপিটালের জন্য কিছু করনি। তখন কে সব আগলে ছিল? সে না থাকলে মুক্তেশের এত বড় সাধনা ধুলোয় লুটিয়ে যেত না? আইভি নিজেকে শান্ত করতে করতে বলল: মুকুল তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও? বলতে পারছ না? আমার কোনও খারাপ লাগবে না, তোমার যা মনে হয় বলতে পার। আমি সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত।

মুকুল ইতস্তত করছিল। তারপর বলল, অঞ্জন সোমের কথা বলছিলাম। অনিতা থাকলে তো উনি তোমার কাছেও আসতে পারবেন।

—মুকুল! আইভির গলার স্বর কেঁপে গেল।

—এতটা রিঅ্যাক্ট কর না। জীবনে সবেরই প্রয়োজন আছে।

আইভি উঠে বসার চেষ্টা করছিল। তুমি আমেরিকা থেকে এসেছ, এখানকার মেয়েদের বুঝতে তোমার ঢের সময় লাগবে। এসব কথা আর কখনও তুলো না।

—বেশ তুলব না। মুকুল কাঁধ নাচাল। তারপর বলল ঘুমিয়ে পড়। একটু পর আবার এসে দেখে যাব।

—তার আর দরকার নেই।

—মিস্টার সোম ফোন করে বলেছেন তিনি বেলা আড়াইটে নাগাদ আসবেন।

আইভির মনে হল বলে আমার ঘরে পাঠাবে না। কিন্তু বলতে পারল না। ততক্ষণে মুকুল চলে গেছে।

আইভির ঘুমের দরকার। ঘুম আর কোথায় আসে? মুকুলের কাছে একটা ঘুমের ওষুধ চেয়ে নিলে বেশ হত। বিকেলের আগে উঠত না। অঞ্জনের মুকুলকে ফোন করে একথা জানানোর মানে কী? তাহলে মেয়ের মাধ্যমে খবর পেয়েছে মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই আখেরে লাভ হবে। কিন্তু এরকমও কি হতে পারে যে আসলে তাকেই অঞ্জন চাইছিল। ফোনটার কানেকশন মুকুল তার ঘরে দেয়নি।

মুকুল আমেরিকায় কয়েক বছর কাটিয়ে মাথাটা পুরো ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে। কী সব উল্টোপাল্টা বকছে। অথচ এই মুকুলকে তো সে আগেও দেখেছে। আগেও চিনত। মুকুল কখনও বদলাবে আইভি ভাবেনি। বরং মুকুল-রাহুলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যই সে বারবার প্রস্তুত থাকত। ওরা এলে দূরে দূরে থাকত। মুক্তেশের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না।

আইভির সন্দেহ হয় বড় মুকুলকে। মুকুলের সঙ্গে সম্পর্কটা বিন্দুমাত্র সহজ করতে পারে না। লোকে বলে মদের সঙ্গীর কাছে মানুষ সব বলে। আইভি এত সচেতন। মুকুল থাকলে সচেতনতার মাত্রা তার বরং বেড়ে যায়। প্রতিটি কথাকে মাপ করতে থাকে।

অঞ্জনের সম্পর্কে এত কী উৎসাহ মুকুলের? সে আইভির শুভাকাঙ্ক্ষীই বা হতে যাবে কেন? অঞ্জনকে সে এখানে দেখেছে পরিচিত। তাই ঘরে নিয়ে এসেছে এর থেকে বেশি কী হতে পারে? আর এখন তার অঞ্জনের সঙ্গে, বিশেষত এই সময়ে নতুন কী হবে? দিন কি বয়ে যায়নি? তাহলে মুকুল কি এই কথার অন্য কোনও মানে করতে চায়। বলতে চায় অঞ্জনের হাত ধরে তুমি কেটে পড়। আর অনিতা সম্পর্কে, অঞ্জন সম্পর্কে এত কথা, এত গল্প, এত নাটক তৈরি করা এইজন্য।

কষ্ট হচ্ছিল খুব। শরীরের কষ্ট একটু একটু করে কমছে, মনের কষ্ট বাড়ছে। মুক্তেশের ছবি দেওয়া স্যুভেনিরটা সে স্পর্শ করল। বুকের মাঝখানে নিল। লেপের তলায় বুকের ওপর মুক্তেশ বোসের ছবি নিয়ে সে ধীরে ধীরে শান্ত হল। একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙল অনেক পরে। লছমি তখন তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। খানিকটা শরীর ঝরঝরেও হয়েছে। দুরাত্রি জাগরণের পরে এটুকু ঘুমই তার শরীরকে চাঙ্গা করে তুলেছে। শরীর ভাল লাগলে কী হবে, মনে পড়ে যাচ্ছে একে একে সব। মুক্তেশের মৃত্যুর পর পর যদি সে চলে যেত। উত্তর প্রদেশের একটা প্রাইভেট নার্সিংহোমে অফার ছিল। ওরা মুক্তেশের অনেকদিনের পরিচিত। তাকেও চিনত। ভাল পোস্ট, ভাল মাইনে দেবে বলেছিল। ভরতপুরের প্রতি মায়ায় সে যেতে পারেনি। কেবলই মনে হত সে চলে গেলে যদি মুক্তেশের এতদিনের সাধনা নষ্ট হয়ে যায়। তবে ভাবনা নেই মুকুলের, সে চলে যাবে। সামান্য সময় লাগবে নিজের জায়গা খুঁজতে—তবু সে যাবে।

লছমি বলল—তোমার ম্যাডাম, অনেকদিন অসুখ করেনি। সেই একবার ডাক্তার সাহেবের আমলে করেছিল, অনেকদিন ভুগেছিলে তুমি।

—তোর মনে আছে লছমি?

—মনে থাকবে না, ডাক্তার সাহেব তখনই তো আমাকে গাঁ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে আছি না। কত বছর হয়ে দেল, বাপ রে বাপ।

—তোর একবার বাবার অসুখ করেছিল না। ডাক্তার তখনই তো তোকে দেখেছিলেন কত ভাল সেবা করতে পারিস।

—ভাগ্যে দেখেছিলেন। নইলে কি চাকরি মিলত বল?

—এত চাকরি পছন্দ তোর? আরও তোরা কত কী করিস। চাষের কাজ, তালাই বোনা, ঝাঁটা বোনা। কি করিস না?

—ওতে আজকাল পয়সা হয় না। সবাই হাসপাতালে চাকরি খোঁজে। কতজন মেথরের জন্য নাম লিখিয়েছে দেখোগে।

—সে কি। ডাক্তার যে তোদের জন্য কত লোক নিয়ে এল। আমরা সেমিনার করলাম। নতুন রকমের চাষবাস নিয়ে কথা হল। গরু পোষা, হাঁস পোষা নিয়ে কথা হল। আমরা লোন দিলাম। ভালই তো চলছিল। সে সব কী হল রে, ওদিকটা আমি বেশ কিছুদিন দেখি না।

—সব হাওয়া হয়ে গেছে। টাকা যে যার খেয়ে উড়িয়েছে। লছমি ওড়ানোর ভঙ্গী করল। ডাক্তারদাদা আর দেবে না বলেছে। এখানে কি টাকার গাছ আছে? বেশ হয়েছে। ওরা সব বুঝুক এবার। আমার বাপও তো টাকা ফেরৎ দেয়নি। গরু বেচে দিয়ে টাকাও সব ঘরে আনেনি।

—কী করল এত টাকা?

—ফূর্তি করেছে, বুঝলে না ফূর্তি।

আইভির চিন্তা হল। বুকের কাছে হাত দিয়ে স্যুভেনিরটা বের করে আনল। এই মানুষটা শুধু দান করতে চায়নি। ভরতপুর আর তার চারপাশের কয়েকটা গ্রামকে সাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিল। বলত আজ ওদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা করছি, কাল যেন তা করতে না হয়। আমাদের দয়া করারও অধিকার নেই। আমাদের কাজ তাই চিকিৎসা করাই নয়। আমাদের কাজ ওদের সাহায্য করা। যতদিন না ওরা দাঁড়াচ্ছে ততদিন ওদের পাশে থেকে যাওয়া। অমিতাভকে মুকুল এটার দায়িত্ব দিয়েছে। ও নতুন ছেলে। নিশ্চয় বুঝেই দিয়েছে। মুকুলের প্রিয়পাত্র বলে আইভিও প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করে ফল হবে না জেনেই। অথচ আইভির মনে হয়েছে হসপিটালের কাজ যে কোনও লোককে দিয়ে হয়, গ্রামোন্নয়নের কাজ যে কারুর কাজ নয়।

আইভিকে চুপ করে থাকতে দেখে লছমি আবার বলল ম্যাডাম শুনছো, ভরতপুরের লোকেরা এখন ফূর্তিতে মেতেছে। মানুষ আছে এগুলো কেউ গো? মাঝেমাঝে মনে হয় এখান থেকে পালাই। তা আমার বাপ কেমন শয়তান জান তো।

—এত রাগ তোর?

—খুব রাগ।

—আমারও। আইভি বলল।

—যা বলেছ ম্যাডাম।

—আমার সঙ্গে চলে যাবি লছমি?

—কোথায় গো? কোন চুলোর দুয়ারে?

—ভরতপুর ছেড়ে অন্য কোথাও। বল যাবি?

—দূর। কী যে বল। এখান ছেড়ে গিয়ে কোথায় মরব? লছমি মুর্মুর কোথাও মরণ নেই।

—কলকাতা যাবি? বিরাট শহর। কত কী দেখবি।

—ওখানে তোমরা থাকতে পার, আমরা কি পারি?

—তোদের মতো কত মেয়ে আছে। ওখানে তোর ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব।

—ওটি হবে না। ঘাড় নাড়ল লছমি। আমার এখানে লোক আছে না? লছমি লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল।

—তোর লোক, কেরে? আইভি কৌতূহলী হল। তুই আগে কখনও বলিসনি তো?

—কবে বলব তোমায়? তোমারও টাইম নেই। আমারও নেই। আমাকে তো এখন মেয়েদের ওয়ার্ডে কাজ করতে হয়, কোয়ার্টারে যেতে হয়। কম কাজ? ডাক্তারদাদা সবাইকে খাটিয়ে মারছে। এখন কি সেই সময় আছে?

—তুই আসল কথা বল।

—বলছি তোমায়। অনেকদিনের ব্যাপার হল। বুধনকে আমার মনে ধরল। ওরও তাই। লছমি মুখে হাত চাপা দিল লজ্জা বোঝাতে।

—ভালই তো। হয়ে যাক। হাড়িয়া টাড়িয়া খাই।

—হাড়িয়া টাড়িয়া কিছুই হবে না। মুহূর্তে রেগে যায় লছমি। বাপ সব টাকা আমার ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারপর ওতেই সব যাচ্ছে। আর বুধন সাঙা করতে চাইলে বলছে দুহাজার টাকা নেব। ও কোথায় পাবে বল। মাঠে খাটে, সবদিন হয়ও না।

—তা একদিন দুজনে পালিয়ে যা। আইভি বলল বটে, কিন্তু নিজের কথা যেন নিজেই শুনতে চাইল না। এ কোন বিপদের কথা বলছে ও। নিজেকে সংশোধন করে ও বলল : বাপকে বল, পাড়াপ্রতিবেশীকে বল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিছু ঠিক হবে না। গাঁময় আমার শত্তুর। ভাবে আমার প্রচুর পয়সা।

—তাহলে তুই আমার সঙ্গে কদিন চলে চল। তোর্ বাপ যখন আনতে যাবে তখন আমি বলব, আগে বুধনকে নিয়ে এসে, ওর বিয়ে দাও, তারপর এখান থেকে যাবে।

—তুমি আমার বাপকে চেন না ম্যাডাম।

—চিনি, ওই মাতাল মুর্মুতো। ডাক্তার থাকতে কতবার তোদের ওদিকে গেছি।

—তোমার কথা তাই সবাই বলে। সবাই কে কত তুমি ভালবাসতে। বুধনও বলে।

—আমি তো চলে যাব। তুই তাহলে যাবি না তো। ওর সঙ্গে তাহলে তোর বিয়েও হচ্ছে না।

—তা হবে। তবু তো ওকে দেখতে পাব। সকাল বিকেল দেখি, তাই কি কম কিছু। লছমিকে উদাসীন দেখাল।

আইভি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। লছমি বলল, আমার সঙ্গে তুমিও মিছা কথা বলছ?

—কী আবার মিথ্যা বললাম?

—এই যে চলে যাবে। তুমি গেলে আমাদের হাসপাতালে আর আপনজন বলে কে থাকবে বল।

—অনেকে আছে। ডাক্তার দাদা আছে। আরও কত কে আছে, নতুন নতুন কতজন আসবে?

—সবাই তো বাইরের। তুমি ছাড়া কেউ ভরতপুরের নেই।

—দূর বোকা, আমিও কি ভরতপুরের নাকি? তাহলে তো তোদের মতো দেখতে হতাম। হতাম না?

—ও আমি জানি, তবু ভেবে দ্যাখো। তুমি আর ডাক্তারসাহেব ব্যাস। এ দুজন ছাড়া আর কাউকে নিজের লোক বলে মনে হয় না।

আইভি বলল, চুপ, চুপ। সবাই শুনতে পাবে। কারুর কাছে বলিস না এ কথা। বলল, আবার ভাবল এই কথাটা যেন মুকুল শোনে। মুকুলের দলবল শোনে। মুকুল তাকে নতুন কী দেবে? এগুলি তো তার পুরস্কার।

লছমি দ্বিগুণ উৎসাহে আইভির মাথা টিপছিল। থামতে বললেও থামছিল না। তারপর বলল: তোমাকে একটা কথা বলব ম্যাডাম। আমি বলেছি কাউকে জানাবে না তো।

—বল কী কথা—

—বুধনকে একটা কাজ দাও না। খুব ভাল কাজ করবে দেখ। খুব খাটিয়ে ও।

আইভি কী একটা বলতে যাচ্ছিল। তাকে চাপা দিয়ে ব্যাকুল হয়ে লছমি বলল: তুমি বললেই হবে। তুমি একবার যদি চাও তো বুধনের কাজ হয়ে যাবে। তা হলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। দু হাজার টাকা বছর দুয়েকের মধ্যেই ও দিয়ে দিতে পারবে। ম্যাডাম তুমি তো আগে কত জনকে নিয়েছ।

একটা চৌকোনো বড় বাড়ির কথা ভাবছে আইভি। তার খুব লম্বা বারান্দা। কত রকম, কত রঙের শাড়ি শুকোয়, ধুতি শুকোয়, বাচ্চাদের হাজারো জামাকাপড়, কত কাঁথাকানি। তার মধ্যে দুটোমাত্র ঘর তাদের। একটা ঘরে ঠাকুমার গায়ে লেপ্টে দুই বোন, অন্য ঘরে বাবা। বাবার অসাক্ষাতে ঠাকুমা কতবার বাবার বিয়ের কথা বলত, আত্মীয়স্বজন বলত, পিসিরা অবশ্যি সামনা সামনিই বলত। তবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি বাবা। আইভির নিজের মাকে মনেই পড়ে না। তার দিদির কাছে সামান্য সামান্য গল্প শুনেছে, সেটুকুই। তবু মায়ের জন্য তার কখনও দুঃখও ছিল না। চারপাশে প্রচুর বাচ্চা, চেঁচামেচি। ওদের মায়েরা তেমনি পিটাতো ওদের। বাবা বলতেন, যেমন মা, তেমনি ছা। আসলে আইভিদের যে বাবা ছিল, অমন বাবা কারুর ছিল না। প্রতি বিকেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। ওকালতি করতেন তিনি। তেমন পসার ছিল না বলে টাকা ছিল না, কিন্তু অঢেল সময় ছিল। বাবা তাদের গান শেখাতেন। একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে একটা বড়ো দীঘির পাড়ে বসে তারা দুই বোন গান শিখত মুখে মুখে।

বাবা বলতেন, আমার যদি আর কিছু টাকাপয়সা থাকত, তাহলেই তোদের নিয়ে অন্য জায়গায় থাকতাম। ও বাড়িতে আবার মানুষ থাকে? গানবাজনার জন্য অন্যরকম জায়গা দরকার হয়। এ সব সাধনার জিনিস। এসব হলে লোককে হাত জোড় করে বসতে হয়, ঠাকুরের সামনে বসার মতো। বাবা শেখাত তাদের ক্ল্যাসিকাল গান, অতুলপ্রসাদী, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

তবে এ খবর চাপা থাকেনি। বাপসোহাগী মেয়েদের কথা ঠাকুমাই সাতকান করেছিলেন। তারা তো ঘরে গাইত না। বাবার কড়া নির্দেশ ছিল: অপাত্রে গান পরিবেশন করবে না। তাতে অমর্যাদা হয়। কিছুতেই তোমরা নিজেদের নষ্ট করবে না। অথচ তা হবার ছিল না। বাবা কোর্টে গেলেই চারপাশের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, তাদের মা সমেত ঘরে আড্ডা দিতে আসত। তারা গান গাইতে বলত। খুব জোরাজুরি করলে দিদি একটা আলাপ শুরু করত। অমনি খিলখিল হাসিতে ভরে যেত ঘর। তবে আইভি ছিল তার দিদির তুলনায় চালাক। সে রেডিও থেকে শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীত দু লাইন গেয়ে শোনাত। যেমন—

এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে।
হরিবোল হরিবোল।।

সবাই এরপর হাসত ঠিকই। কিন্তু খুশি হত কম নয়। কিন্তু বিপদ হল এই যে এবার সর্বত্রই আইভিকে গান শোনাতে হয়। বাবার কথামতো লোকে হাতজোর করে বসে না ঠিকই, তবে না হেসেই গান শোনে। গানের জন্য আইভির কদরও বেড়ে গেল।

অথচ বাবা যেদিন প্রথম শুনতে পেলেন সেদিন মেরেছিলেন বড়। আইভিকে কখনও তার আগে মার খেতে হয়নি। বাইরে সেদিন ঘোর বর্ষা, বাবার কোর্ট বন্ধ। বাড়িতে কেউ খায়নি। সচেতন আইভি সেদিন প্রথম কেঁদেছিল। ভেবেছিল আর কোনওদিন গান গাইবে না। জোর করে গান বন্ধও রেখেছিল। কোনওদিন আর সেই দীঘির ধারে গান শিখতে যায়নি।

কত ছোট ছিল তখন আইভি। কত অল্পেই তখন অভিমান হত। বাবার ওপর দিদির ওপর সামান্য অভিমানে তখন চোখে জল আসত। ভালবাসার লোক বেশি থাকলে বোধহয় এরকমই হয়! তবে তখন বাবারই মনখারাপ ছিল বেশি। একবার মেরে নিজেকে এত অপরাধী ভাবছিলেন যে আইভিকে শুধু সবার সামনে গান করার অনুমতিটুকুই নয়, তাদের মফঃস্বল শহরে, সেইসব দিনে এখানে ওখানে গান গাওয়াতেও নিয়ে গেছেন। কত প্রশংসা তখন আইভির। বাবাও তখন, টিঙটিঙে রোগা, ঈষৎ ফর্সা মেয়ের গর্বে অস্থির। বলতেন লেখাপড়া কর, তা থেকেও বেশি কর গান। গান তোমাকে ভাল করে শিখতে হবে। আইভি জানত কত কষ্ট করে বাবা রেকর্ড প্লেয়ার

কিনেছিলেন। বাড়িতে বাজত ওস্তাদদের গান। বাবা বলতেন, ভাল করে কান খুলে শোন আর শিখে নাও। নইলে ভবিষ্যত কেমন জান তো। বাবা পাশের বাড়ির মহিলাদের দিকে ইঙ্গিত করতেন। বাবার এইসমস্ত গৃহবধূ মেয়েদের ওপর এত রাগ ছিল কেন—কে জানে? ঠাকুমা বলত অকালে বউ মরে গেছে বলে। আইভিরাও ঠাকুমার কথা শুনতে শুনতে তাই বিশ্বাস করত। নইলে তাদের থেকে ওইসব বউগুলোর জীবন তুলনামূলক বর্ণময় ছিল বৈকি। নতুন বউ হলে তো কথাই নেই। বাবা কোর্টে চলে যাবার পর তারা দুই বোন—সুরভি আর আইভি সেইসব বউদের কাছাছাড়া হত না। ওরা চাইত না, তবু তারা থাকত। তাদের কথাবার্তা, হাবভাব, সাজগোজ হাঁ করে গিলত।

বাবা গান শেখাতেন মেয়েদের ভাগ্য অন্যরকম হবে বলে। হলও তাই। তবে যেমনটি চেয়েছিলেন তেমন নয়। অন্যরকম। একজন বাধ্য হল গানকে জীবিকা হিসাবে নিতে। অনজনের গান চিরকালের জন্য বন্ধ হল। আইভির ভাগ্য গানের গলা ধরে খাদের দিকে টেনে নিয়ে গেল। বাবা যদি স্বাভাবিক মানুষ হতেন!

—তোমার শুনলাম জ্বর হয়েছে!

আইভির কানে যেন কথাটা পৌঁছাচ্ছিলই না। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে। অন্তহীন সাদা দেওয়াল তার সামনে। কতরকম ছবি এতক্ষণ তাতে ফুটিয়েছে ও। অঞ্জনের গলার আওয়াজে সে সব যেন ভেঙে গিয়েও যাচ্ছে না।

—তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

—না, জেগে আছি। আইভি বুঝতে পারে অঞ্জনের একটা হাত তাকে ছুঁতে এসেও ফিরে যাচ্ছে। অথচ শরীরে সে একদম শক্তি পাচ্ছে না। শুনতে পেল অঞ্জন বলছে

—খুব কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? এদিকে ফিরতে পারবে না?

উত্তর দিচ্ছে না আইভি। অঞ্জন তার চুলে হাত দিল। ছোট চুল ঘেঁটে যাচ্ছে অঞ্জনের হাতে। আইভি চুপ করে সে স্পর্শ নিতে চাইছিল কিন্তু হঠাৎ সে উঠে বসল। তার দরজা জ্বরের কারণে ভেজান ছিল। তবু যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। তা ছাড়া অঞ্জনের হাতে নিজেকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। দেবেই বা কেন? এতদিন সে তো এভাবেই থেকেছে।

অঞ্জনের দিকে চেয়ে একটু হাসে আইভি। সামাজিকতার জন্য যেরকম হাসি বিতরণ করতে হয়, সেরকম হাসি। কোনওরকমে পোষাক ঠিক করে সে। লেপটেপ চাপাচাপি দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে চুলগুলো ঠিক করে। অঞ্জন সামনের চেয়ারে বসে আছে। সম্পূর্ণ মনোযোগ তারই দিকে। সামান্য লজ্জা লাগছিল তার। ভরতপুর হসপিটালে তার পজিশনের কথা, তার স্ট্যাটাসের কথা মনে হতেই নিজেকে সামলে ফেলল আইভি। মনে হল সে তো অঞ্জনের কেবল চেনা মেয়েটি নয়। যার সঙ্গে কলকাতার হোটেলে রাত কাটিয়েছিল। বলল, জ্বরটা কমতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি যখন এলে তখনও তন্দ্রা কাটেনি। তোমাকে স্বপ্নই ভাবছিলাম—আমার যে মেয়েটি কাজ করে।

অঞ্জন দৃষ্টি সরাচ্ছে না। তোমার কথা সেই থেকে কেবল ভাবছি। আজ সকালেই আসতাম, ভাবলাম ওরা আবার কী মনে করবে।

—মনে করার কী আছে, মেয়ের কাছে তো আসছ!

—মেয়ের তো তোমরা খুব কেয়ার নিচ্ছ।

—আমি নই,

—এ কথা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল। আমি খুব গ্রেটফুল তোমার কাছে। অনিতাও হবে নিশ্চয়।

আইভির মনে হল মুকুলের কথা একবার বলে। তারপর ভাবল ঘরের কথা সাতকান করে লাভ কী? অঞ্জন দুদিন পর চলে যাবে। তখন এই ইমপ্রেশন নিয়ে যাবে সে ভরতপুরে আইভি ভাল নেই। সে ওখানকার কেউ নয়। আইভি বলল: এতে গ্রেটফুল হবার কিছু নেই, মানুষের কাজ তো মানুষ করে।

এই কথাটার মধ্যে দিয়ে আইভি কি অঞ্জনকে খোঁচা দিতে চেয়েছিল, নইলে অঞ্জন মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল কেন। অঞ্জনের দিকে তাকাতে গিয়েই আইভির চোখে পড়ে তার ফুলদানিতে দুটো টাটকা হলুদ রঙের চন্দ্রমল্লিকা। ভ্রূ কুঁচকে যায় তার। ফুল দুটো তার অচেনা নয়। হসপিটালের গেটের দুধারে কয়েকবছর ধরে ফুলের বাগান করা হচ্ছে। সেখানকার ফুল এগুলো। কে তুলল অঞ্জন? এখানে ফুল তোলা নিষেধ।

—তুমি এনেছ এ দুটো?

—না তো। একটু বিব্রত হল অঞ্জন। কাঁচুমাচু হয়ে বলল আসলে তোমার জ্বর তো জানতাম না। ডক্টর বোস ফোনে সেরকম কিছু বললেনও না।

তা হলে কে এসে রেখে গেল, মুকুল? হঠাৎ? সেদিন অনিতাকে ফুল দিচ্ছিল সেটা ও দেখে ফেলেছে বলে। তারপর ইক্যুয়ালিটির কথা ওকে শুনিয়েছে বলে। একধরনের হাসি খেলে গেল আইভির ঠোঁটে। কাঁচা খেলা খেলছে মুকুল।

—খুব ভাল লাগছে ওখানে ফুলদুটো। তুমি ফুল খুব ভালবাস, তাই না। অঞ্জন বলল।

—গাছ থেকে তুললে ভালবাসি না। গাছেই দেখতে ভাল লাগে। ওগুলো কেউ রেখে গেছে, তাই দেখছি।

—আমার মনে আছে তোমাদের বাড়িতে গাছ লাগানোর জায়গা ছিল না বলে তোমরা জানলায় টব রাখতে।

আসলে সামনের বারান্দায় রাখলে সবাই ছিঁড়ে দিত। তাই ওখানে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে ফুলটুল তেমন ফুটত না। গাছটাই হত। রোদ পেত না যে। সত্যি কতদিন পর ওগুলোর কথা মনে পড়ল। ইনফ্যাক্ট আজ আমি বাড়ির কথা ভাবছিলাম।

—তুমি বাতাসপুর কবে শেষ গেছ?

আইভি নিজের হাত দিয়ে দুই চোখ ঢাকল। যেন মনে করছে এমনিই ভাব দেখাচ্ছিল। অথচ অসংখ্য সুঁচ যেন তার রক্তের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দিচ্ছিল। ভরতপুরের ম্যাডামের ভেতর থেকে সেই সতেরো বছরের মেয়েটা বের হয়ে পড়ছিল। সে বলছিল, বাতাসপুরের কথা আর কেন, সেখানে কিছু তো পাইনি।

আইভির এরকম পরিবর্তন অঞ্জন আশা করেনি এমন নয়। হয়তো এই আইভিকেই সে চেনে। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আইভির কাছে এগিয়ে আসছিল। বলছিল, কাল থেকে আমি এটাই ভাবছি আই, আমার এত লজ্জা লাগছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।

আইভি সরে গিয়েছিল। খাট থেকে নেমে পড়েছিল। এত দ্রুত আর হঠাৎ নামার ফলে তার পায়ের কাপড় উঠে গিয়েছিল। অনাবৃত সাদা হাঁটু অঞ্জনের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়েছিল। আইভি বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। সেই অস্থির মুহূর্তগুলোতে অঞ্জন শোবার ঘরের ভেতর পায়চারি করেছিল। আইভি বাথরুমে একটু বেশি সময় নিচ্ছিল। অঞ্জন ড্রইংরুমে এসে বসেছিল। বাথরুমের জল পড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না। আইভি এত দেরি করছিল যে অঞ্জনের মনে হচ্ছিল বোধহয় অনন্তকাল সে বসে আছে। হয়ত আইভি তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল এবার তার চলে যাবার কথা। কিংবা সে যা করতে যাচ্ছিল তার কোনও অধিকার তার নেই।

অনেকক্ষণ অঞ্জনকে বসিয়ে রেখে আইভি যখন বের হয়েছিল তখন সে অন্য মানুষ। ড্রেস করা ফিটফাট চেহারা। যেমন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রথম দিনে। সাধারণ কথা বলতেও যে মানুষের সঙ্গে তখন ভয় করে। এই আইভিকে দেখে অঞ্জনের লজ্জা হয়েছিল। আইভি ছিল স্থির। তবে তার চোখমুখ বসে গিয়েছিল। জ্বরের জন্য নাকি এই উত্তেজনার জন্য বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা খানিকক্ষণ কথা না বলে চুপচাপ বসে ছিল। তারপর আইভিই শুরু করল

—চল, তোমাকে কিছু খাইয়ে আনি। দুদিন ধরে আসছ, অতিথির অসম্মান হবে। ঘরে কিছু ভালমন্দ রাখা দরকার।

—আমি খেয়েই এসেছি।

—অতিথিকে তো খাওয়াতেই হয়। নারায়ণ বলে কথা। নইলে পাপ লাগে। হাসতে পারছে আইভি। জ্বরক্লান্ত মুখটাতে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে। অনেক ফর্সা হয়েছে আগের চেয়ে—অঞ্জন ভাবল। আইভি বলল, চল, নিচে আমাদের সুলভ ক্যান্টিন। ওখানে খেয়ে তোমার মেয়ের জন্যও কিছু নিয়ে যাব।

অঞ্জন একটু ঘাবড়ে গেল। কিছু বলল না। আইভি অঞ্জনের ব্যাপার দেখে হাসল। সে হাসি সামান্য উচ্চকণ্ঠও হয়ে গেল। বলল, ভয় নেই মিস্টার সোম। তোমার আমি কেউ নই। ইরার বন্ধু আমি, বাতাসপুরের মেয়ে। এটুকু অন্তত বলতে দিও। পারমিশন দিচ্ছ তো। অঞ্জনকে নিয়ে করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগল। দূরের গাছপালার দিকে মুখ করে অঞ্জন মৃদু স্বরে বলল: তুমি আমার অসহায়তা জান।

অঞ্জনের দিকে মুখ তুলে তাকাল আইভি। অঞ্জন মুখ নামিয়ে নিল। তারপর অসংখ্য প্রশ্নচিহ্নময় নির্বাক মুখের ভাষা থেকে পরিত্রাণ পেতে সে আইভিকে এই হসপিটাল নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগল। জিজ্ঞাসার যেন তার অন্ত নেই। সে জিজ্ঞাসা, সে কথাবার্তা মাঝেমাঝে থেমে যাচ্ছিল। কারণ ভরতপুরের ম্যাডাম এখন কেমন আছেন তা সকলে জানতে চাইছিল। পরিমিত অফিসিয়াল ব্যবহার অঞ্জন চেনে, আইভিকে দেখে সে অবাক হয়। কেন না তাকে এ সবের উর্ধ্বে মনে হয়। ম্যাডামের সঙ্গে হাঁটার ফলে সে যে বিশেষ হয়ে গেছে, তাও অঞ্জন বোধ করছিল। কিছুক্ষণ আগে লেপ ঢাকা

দেওয়া যে আইভিকে সে চিনত, এ আইভি সে নয়। ওই আইভি তার চেনা, তার ঘনিষ্ঠ, কিন্তু এই আইভির সঙ্গে চলতে তার গর্ব হচ্ছে। আইভির প্রতি এখানকার মানুষ যে কত নত, তা ক্যান্টিনে বসেও টের পেল অঞ্জন।

ছোট একটা টিফিন বক্সে চারটে সন্দেশ নিয়ে যখন আইভি অনিতার সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন মুকুল ওইঘরে বসেছিল। ওদের দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুকুল। আইভি বেশ বুঝতে পারছিল কোনওরকম চেকআপের জন্য মুকুল আসেনি। নেহাতই অনিতার টানে।

আইভি প্রথমে মুকুলকে দেখেনি এমন ভাব করল। অনিতার শরীর নিয়ে অনিতার সঙ্গেই কথা বলছিল। অঞ্জনের মুকুলের সঙ্গে ফোনে আলাপ। সরাসরি সে চেনে না। অঞ্জন মুকুলের দিকে চেয়ে একটু হেসে, অনিতার সঙ্গে কথা বলছিল। মুকুল একপাশে অবাঞ্ছিতের মতো দাঁড়িয়েছিল। তার যাবার রাস্তা আইভি আর অঞ্জনে মিলে এমন আটকে রেখেছিল যে দরজা ঠেলে যাওয়া সহজ ছিল না। আইভি দেখছিল অনিতারও চোখ ছটফট করছে মুকুলের সঙ্গে তার বাবার আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। সে বেচারিও সুযোগ পাচ্ছে না।

আইভি কোনও ভূমিকা ছাড়াই মুকুলের সঙ্গে অঞ্জনের আলাপ করিয়ে দিল। সে যে প্রতিষ্ঠাতার সন্তান—তা জানাল। ওর ডিগ্রী জানাল। এমনকি মুকুল যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গৌতমীকে বাদ দিয়ে অনিতার দায়িত্ব নিয়েছে সেটা জানাতেও কসুর করল না। সে যে অনিতার প্রতি বিশেষ যত্ন নিচ্ছে সেটাও বলল। আইভি মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমেরিকা ফেরৎ ডিভোর্সি পুরুষের মুখে রক্ত ঝলকাচ্ছিল। আইভির মজা লাগল। ভাবল অনিতা নেহাতই বাচ্চা মেয়ে। বিশেষত মুকুলের তুলনায়। আইভির থেকে মুকুল বেশি ছোট নয়। অনিতা যেমন ছোট মেয়ে তাকে বশ করা সোজা। তবু এখানেও মুকুলের পরাজয় ছাড়া জয় দেখতে পায় না আইভি। যতই অনিতার তাকে ভাল লাগুক, সন্তান নিয়ে নিজের স্বামীর কাছে চলে যাবে সে। তোমাকে ভালবেসেছে বলে সব নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়ে আসবে না। এসব মেয়েকে সে ভালই চেনে। তবু মুকুলের এ অবস্থা দেখে হাসি পেল। মুকুলের পেশেন্টের প্রতি একনিষ্ঠতা নিয়ে খানিক ঠাট্টাও করল।

জ্বর থেকে উঠে আইভি যেন মুড়ে ছিল। অনিতার কেবিনে খুব হাসাহাসি করছিল। আইভিকে এরকমটা দেখা যায় না। অধিকাংশ সময় সে খুব গম্ভীর থাকে। কখনও সাঁওতাল পল্লীতে গেলে কিংবা লছমি টুডমি থাকলে বেশি কথা বলে। তখন মনে হয় এগুলো ওদের সঙ্গে কম্যুনিকেট করার একমাত্র অস্ত্র। মুকুল বোধহয় তাই অবাক হয়ে তাকে দেখছিল।

আইভি, অঞ্জন দুজনেই কন্যার সামনে উচ্ছ্বসিত ছিল। অনেক ব্যক্তিগত কথা হচ্ছিল, বিশেষত আইভির বাল্যকালের কথা। মুকুলের এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তবু কৌতূহলী চোখ নিয়ে সে চেয়ে ছিল। আইভি অনিতাকে এমন করে আদর করছিল যেন মনে হচ্ছিল ও তার নিজেরই সন্তান। সে অনিতার মায়ের বন্ধু বলে নিজেকে পরিচয় করাচ্ছিল। তাদের স্কুলজীবনের নানা গল্প বলে খুব হাসাচ্ছিল। মুকুল নানা কথায় একটু আধটু টিপ্পনি কেটে তাদের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু বের হয়ে আসছিল। আসলে আইভি একাই প্রায় কথা বলছিল। বলেই যাচ্ছিল। অঞ্জনও প্রায় মুকুলের মত হাঁ করে তাকে দেখছিল। মুকুল অবাক হয়ে শুনছিল আইভি বলছে ডাক্তার বোস চাইলে ও এখানে আরও কিছুদিন থাকতে পারে। কোনও অসুবিধে নেই।

অঞ্জনেরও সেইরকম অনুরোধ ছিল। আইভি একেবারে অঞ্জনকে মুকুলের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মুকুল সেই মুহূর্তে অনিতাকে রাখা না রাখা নিয়ে কোনও ডিশিসনে আসতে না পেরে দেখি, দেখতে হবে—এইসব কথাবার্তা বলছিল।

অঞ্জন অবশ্য তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিল। ওর কেবিনটা নিজের ঘরই মনে হচ্ছিল, মেয়ের বিছানাতে ও হেলান দিয়ে বসেছিল। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এভাবে বলেছিল জানিস তো—এই আন্টি খুব ভাল গান গায়। সাংঘাতিক ভাল। বাতাসপুরে তখন সবাই ওর নাম জানত।

আইভির সব বাচালতা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুকুলও আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করছিল—সে কী কথা। আমি যে এতবছর ধরে ওকে চিনি, কখনও তো এটা জানি না। কই, কখনও বলনি তো ম্যাডাম?

—না না, সেরকম কিছু নয়। ছোটবেলায় যেমন সব মেয়েরা অল্পবিস্তর গান শেখে আমিও তেমনি শিখেছিলাম। বিয়ের জন্য।

অঞ্জন প্রতিবাদ করল। ডক্টর বোস আপনি একদিন শুনে তারপর বলবেন। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।

মুকুল বলল: এটা সত্যি আশ্চর্যের। কেবল আমি নয়। আমার ধারণা এখানে কেউ ওর গানের কথাটা জানে না। আপনি ভাগ্যে বললেন। মুকুলের বিস্ময় শেষ হচ্ছিল না।

আইভি বলল, আচ্ছা মুকুল, তুমি এত হা হুতাশ করছ কেন? ভরতপুরে আমার গানের কী প্রয়োজন বল তো? আমি কি গান গেয়ে গেয়ে পেশেন্টকে ঘুম পাড়াব?

আইভির কথায় ওরা চারজনই হেসে উঠল। এর কিছুক্ষণ পর আইভি অঞ্জনকে নিয়ে নিজের অফিসে এল। বলল তোমার মেয়েকে দেখে আজ বড় ভাল লাগল। আমাদের বাচ্চা বয়সটা মনে পড়ে গেল। ও তো ইরার মতোই দেখতে হয়েছে। আমার নাইন টেন ক্লাসগুলো মনে পড়ছিল। তখনও তো জানতাম না তোমার সঙ্গে ইরার বিয়ে হবে। ফলে আমরা বন্ধু ছিলাম।

অঞ্জন চুপ করে ছিল। ওর নীরবতা ওর মুখটিকে ম্লান করেছিল। এবার সত্যিকারের অসহায় লাগছিল ওকে। এটা আইভির চোখেও যেন ধরা পড়েছিল। বয়স্ক লাগছিল ওকে। সোয়েটারের ভেতরেও দ্রুত নিশ্বাস নেওয়া বুকের ওঠাপড়া টের পাচ্ছিল।

আইভি কমপিউটার চালু করেছিল। বলছিল আজ ছুটি নিয়েছি। কালকেও নিতে হবে। একটা দরখাস্ত লিখি ছুটি চেয়ে।

—তুমি আবার কার কাছে লিখবে? এখানে এত নিয়ম আছে নাকি?

—বারে, একটা প্রতিষ্ঠান কি এমনি এমনি চলে, কোনও নিয়ম ছাড়া। আমরাও নির্দিষ্ট ছুটি পাই। তবে আমার তো ছুটি নেওয়া হয়েই ওঠে না। অনেকদিন পর অসুখবিসুখ করল। অবশ্য তাতে ছুটিও পেলাম। আইভি কমপিউটারে টাইপ করতে করতে বলল।

—আমি তো অসুখে অসুখে থাকি। ধরা লাগল অঞ্জনের গলা।

—ভাল, তাতে তো বাড়ির লোকের যত্ন পাও। আমি এখানে একা, তাতেই মনে হয় অসুখ করুক। তা হলে ছুটি পাই। শরীরটা একটু বেশিই ভাল। খুব কাজের চাপ। আইভি কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলল। তারপর অঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। ম্রিয়মান হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

আইভি বলল: কী হল তোমার। মেয়ে তো ভাল আছে। কোনও ভয় নেই আর।

অঞ্জন বলল, সে কথা নয়।

আইভি হাসল, কী কথা তবে? অঞ্জন তখনও চুপ।

আইভি খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলল: চল তোমায় পৌঁছে দিই। অন্তত গেট পর্যন্ত যাই।

তখন অন্ধকার নেমেছে। আইভি তার শালটাকে মাথা পর্যন্ত মুড়িয়ে নিয়েছে। শীতও করেছে, হয়তো অল্প অল্প জ্বর আছে। তাও অঞ্জনের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল সে। অন্ধকারে পিছনের হসপিটাল সমস্ত আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি চতুর্দিকে তীব্র আঁধার। রাস্তার মাঝেমাঝে একটা দুটো আলো। আইভি মাথা পর্যন্ত চাদর দেওয়াতে সুবিধাও হয়েছিল, তাকে ম্যাডাম বলে কেউ চিনতে পারছিল না।

অঞ্জন যেন অনেক প্রস্তুতি নিয়ে কথাগুলো বলছিল। হয়তো সে অনেকক্ষণ ভেবেভেবে কথাগুলো তৈরি করেছিল। আইভিকে কিছুতেই বলা যাচ্ছিল না। কমপিউটারের সামনে ফ্রেমলেস চশমা পরে যে বসে থাকে, কিংবা স্টাফদের সম্ভাষণ কুড়োতে কুড়োতে যে যায় তাকে কিছুই বলা যায় না। তবে এটুকু সময় ছাড়া অঞ্জনের সময়ই বা কোথায়? আইভি তাকে দয়া করে সময় দিয়েছে বলেই তো। এইটুকুর সদ্ব্যবহার সে করতে চাইল।

—তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে একটা কথা আমি ভাবছি জান। তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া দরকার।

—বাইশ বছর পর এতে কী এসে যায়।

—তোমার যায় না, আমার যায়।

—ভাল তো আছ তুমি, ভরা সংসার। সকলেই খুশি। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ তুমি।

—যদি বলি সন্তুষ্টই করতে চেয়েছি সবাইকে, নিজে একফোঁটা হইনি।

গেট সামনেই ছিল। ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুখোমুখি। তবু খুব কাছাকাছি নয়। ওদের মাঝখানে দূরত্ব ছিল। আইভি একটা কথাও বলছিল না। শব্দহীন অন্ধকার অঞ্জনকে আইভির চোখমুখের ভাষা পড়তে সাহায্য করছিল না। আইভি নড়ছিলও না। ওকে কালো একটা লম্বা ঝোপের মত লাগছিল । অঞ্জন সমস্ত মনের শক্তিকে সংগৃহীত করে বলছিল: তোমাকে দেখে আমি এখন আরও বুঝতে পারছি আমি সুখি নই। পরশুদিন থেকে আমি প্রতি মুহূর্ত অনুশোচনা করেছি।

অঞ্জনের আবেগ কোথাও গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। নিশ্চল প্রতিমাটি নড়ে উঠেছে। আইভি রেডিয়াম লাগান তার ঘড়ি দেখল। বলল, সন্ধ্যের পর মাত্র দুটো বাস। লাস্ট বাস চলে গেলে মুশকিল হবে। তুমি যদি বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে। এখানে আর একটুও সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। অবশ্য এক যদি তুমি আমাদের গেস্টহাউসে থেকে যাও।

—না, এটা ওরা ভাল চোখে নেবে না। কথাটা বলল অঞ্জন। তারপর যেন নিজের বাক্যে সন্তুষ্ট না হয়ে ভাল করে সেটা বানাতে চাইল। নিজের বাড়ি তো নয়, আত্মীয়বাড়ি। ওরা চিন্তা করবে।

—নিজের বাড়ি হলে আরও বেশি করত।

—তা করত হয়তো। তবু তাকে মানব কি মানব না সে তো আমার ব্যাপার।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমিও বদলেছ, আগে এমন তো ছিলে না।

—তুমি কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। অঞ্জনের জন্য আইভিও গেটের বাইরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল।

—কী বুঝেছ? আইভি মুখ তুলেছিল। চাদরের ঘোমটাটা সে ঠিক করেছিল। অঞ্জনের এই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও মনে হয়েছিল আইভির চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এর তুলনায় ইরা নিতান্তই সাদামাটা। ওর সবকথা সব ভাবনা তার মাপা। সবই মোটের ওপর মোটা দাগের। প্রতি মুহূর্তে আইভির সঙ্গে প্রতিটি কথায় অঞ্জনকে সচেতন থাকতে হচ্ছে। তার সবসময়ই ভয় হচ্ছে বুঝি একটু অসতর্ক হলেই সে গর্তে পড়ে যাবে। আর সেই মুহূর্তেই তার পরাজয় ঘটবে। অঞ্জন আর হারতে চায় না।

—তুমি হয়তো একটা কথা ভুলে যাও, আমার সেদিন বয়স অল্প ছিল। তা ছাড়া আমি বাবার একমাত্র সন্তান। আমাদের মতো পরিবারগুলোর পুত্রসন্তান হওয়া যে কত যন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না।

অঞ্জন কথাগুলো জোরের সঙ্গেই বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাতেও আইভিকে খুব একটা কথা বলানো যাচ্ছিল। অথচ একটু আগে অনিতার সঙ্গে সে এমন ভাবেই কথা বলেছে যে ওকে আলাদা কিছু বলে বোঝাই যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ও যেন তাদের পরিবারের কত নিকটজন।

অঞ্জন বলল, একটা সত্যি কথা বলব। হয়তো কথাটা তুমিও মানবে। সেদিন যদি তুমি নিছক আমার বউ হয়ে যেতে তা হলে তোমার এ উন্নতি হত না। তুমি এত উঁচু জায়গায় পৌঁছাতে পারতে না।

—কীরকম হতাম? আইভি যেন কথার খেলা খেলছে অঞ্জনের সঙ্গে। যেন এইসব কথাবার্তার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই।

—কী আবার হতে। হাউস ওয়াইফদের দেখছ না। ওদের দেখেই বোধহয় কুড়িতে বুড়ি কথাটা এসেছে। কোনও কাজ নেই কর্ম নেই। সারাদিন বাড়ির লোকের পিছনে লেগে থাকে। বাড়ির কর্তাকে কখনও সন্দেহ করে, কখনও আবার তেল দেয়—এইরকম। কোনও পার্সোনালিটি নেই।

আইভি মন দিয়ে অঞ্জনের ব্যাখ্যা শুনছিল। ওর কথা শেষ হয়ে গেলে বলল: ইরা কেমন, ও কি আর সব হাউস ওয়াইফদের মতো?

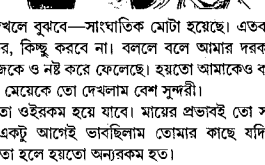

—তুমি দেখলে বুঝবে—সাংঘাতিক মোটা হয়েছে। এতবার করে বলি এক্সারসাইজ কর, কিচ্ছু করবে না। বললে বলে আমার দরকার নেই। কী বলব বল! নিজেকে ও নষ্ট করে ফেলেছে। হয়তো আমাকেও করেছে।

—তোমার মেয়েকে তো দেখলাম বেশ সুন্দরী।

—ও হয়তো ওইরকম হয়ে যাবে। মায়ের প্রভাবই তো সন্তানের মধ্যে বেশি। আমি একটু আগেই ভাবছিলাম তোমার কাছে যদি ও কিছুদিন থাকতে পারত তা হলে হয়তো অন্যরকম হত।

—আমি কি অন্যরকম নাকি?

—সে তো আমি বুঝছি। আমার মনের অবস্থা কাউকে বোঝানোর নয়। অঞ্জনের কথাটার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ছিল। শীতের ঠাণ্ডা আকাশের নিচে সেটা যেন ভারী হয়েই ঝুলছিল। ওরা বাসস্টপের কাছাকাছি চলে এসেছিল। দেখা যাচ্ছিল সেখানে কোনও লোক নেই। অঞ্জন ভয় পাচ্ছিল সত্যিই বাস আর আদৌ আসবে কি না ভেবে। আইভি ওকে আশ্বস্ত করছিল এই বলে যে তাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। তবে আইভির পক্ষে আজ ড্রাইভ করা সম্ভব নয়। মুকুলকে যদি অনিতা বলে তো মুকুল নিশ্চয় ব্যবস্থা করবে। আইভি বললেও হবে। তবে পেশেন্টের জোর বেশি কিনা।

শীতের হাওয়া তাদের দুজনকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তার মধ্যে অনেকদূরে বাসের হেডলাইট দেখা যাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরেই অঞ্জন নির্ধারিত বাসটি পাবে ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল। বলেছিল এই অন্ধকারে আইভি একা যাবে—এটা যথেষ্ট সাহসের লক্ষণ। আইভি বলেছিল, এ অনেকদিনের অভ্যাস। ঠাট্টা করে বলেছিল, রাত্রে আমাদের চোখ জ্বলে।

অঞ্জন বলেছিল, দিনের বেলায় জায়গাটা সুন্দর, রাত্রে ভয়ঙ্কর। মুক্তেশ বোস কলকাতার ওদিকে যদি হসপিটাল করতেন, সব দিক থেকেই ভাল হত।

আইভি বলে উঠেছিল: কলকাতায় আমার জন্য একটা ফ্ল্যাট দেখে দেবে? আমি এরপর ওখানে থাকতে চাই।

মুক্তেশ যখন আইভিকে নিয়ে ভরতপুরে এসেছিল তখন এখানে একটাও পাকা বাড়ি ছিল না। ধু ধু মাঠ, কোথাও কোথাও পলাশ গাছ খেয়ালখুশি মতো দাঁড়িয়ে আছে। কালচে রঙের পাথর স্থানে স্থানে। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়। ধোঁয়ার রেখায় যেন সেগুলো আঁকা। তার মধ্যে কালো কালো নারী পুরুষ। তাদেরই তৈরি ছোট ছোট মাটির ঘর। হাসপাতালটাও সেইরকম। মাটির তৈরি কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। তার মধ্যে একমাত্র হলের মতো পাকা ঘর করা হয়েছে। সেখানেই মুক্তেশ অপারেশন করে। ছিরি নেই, ছাঁদ নেই—লোকজন নেই, এইরকম একটা গ্রামে আইভি এসে পড়েছিল।

সেও কতদিন হয়ে গেল। তার মাথায় তখন লম্বা চুল ছিল। ভরতপুরে এসে এসে তার শীত করত খুব বেশি। গ্রীষ্মও তেমনি এখানে দারুণভাবে জানান দেয়। মুক্তেশ সেই রোদে রোদেই কাজ করত। কাজেই তার সঙ্গে তাকেও যেতে হত—চারপাশের সব গ্রামে।

একা থাকলে মুক্তেশ প্রাণ খুলে গল্প করত। এমনিতেও মানুষটা দিলখোলা ছিল। আইভি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—এতদূরে কেন এলেন, কলকাতায় কত নাম ছিল আপনার। এখানে এত কষ্ট করে পড়ে আছেন কেন?

—তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? তা হলে ফেরত দিয়ে আসি তোমায়।

—সে কথা তো বলিনি। আইভি নিজেকে লুকোয়। আসলে কষ্ট তো হচ্ছে। খড়ের বিছানায় শোওয়া। খাওয়াদাওয়াও ঠিকঠাক হয় না। সবজি পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিছুই প্রায় এদিকে আসে না। লোকের ক্রয়ক্ষমতাই নেই। তার ওপর সন্ধে ছটা থেকেই ঘরের ভেতরে প্রায় ঢুকে বসে থাকা। ইলেকট্রিক না থাকাটার সঙ্গে রপ্ত হতে দেরি হয়েছিল তার।

মুক্তেশ বলত, আমি ছাড়া কে আসবে এখানে বলত। কার দায় পড়েছে ডাক্তারি টাক্তারি পাশ করে সাঁওতাল বনে যেতে। কখনও কখনও মুক্তেশ সাঁওতালদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের জিজ্ঞেস করত—বল দেখি আমি সাঁওতাল কি না, বল দেখি, ঠিক করে বল তো। মুক্তেশের টকটকে ফর্সা রঙের দিকে চেয়ে ওরা হাসত। কেউ বলে ফেলত, তুই সাঁওতাল হবি কেন? মুক্তেশ বলত, সাঁওতাল না হলে কি তোদের কাছে মরতে এলাম?

মরতে আসাই বটে। এত গরিব মানুষ হয়! জল পর্যন্ত আনে কতদূরের বাঁধ থেকে। কত কষ্ট করে দুটিখানি ফসল ফলায়। কতদূর গিয়ে বাস রাস্তা, স্টেশন। তা গাঁয়ের লোকের মধ্যে ট্রেনে কজন চেপেছে তাই সন্দেহ। তার ওপর জাঁকিয়ে বসা কলেরা। টিবিও তখন ঘরে ঘরে।

এখানকার মানুষজন এত নির্বিকার, মৃত্যুর সঙ্গে এরা এমনই পরিচিত যে ঘরে কেউ মরলে কাঁদেও না। হাসি নেই, ঠাট্টা নেই, নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে খালি মানিয়ে নেওয়া আছে। কোথাও এতটুকু প্রতিবাদও নেই।

ডাক্তার মুক্তেশ বোস এদের জন্য কাজ করত। চিঠিপত্র লিখত। সদরে ছোটাছুটি করত। অথচ কিছুটা দূরের কোলিয়ারিতে ছিল সব সুবিধা সুযোগ। সরকার কোনও কিছু দিতে কার্পণ্য করেনি। সেখানে বড় হোটেল ছিল, ফূর্তি হত খুব। বড় বড় কোয়ার্টার ছিল। পিচরাস্তা ছিল। কোলিয়ারির জল কল বেয়ে উপচে পড়ত। মুক্তেশ শুধু চিকিৎসা করত না। মুক্তেশ বলত, চিকিৎসা করে শুধু কী হবে। এদের অনেক রোগ। কটা সারাব? যদি না খাবার জলের ব্যবস্থা করতে পারি। যদি না ইস্কুল করতে পারি, মুক্তেশ ভয় পেত, বলত আমার মনে হয় এই গ্রামগুলো ধ্বংস হতে পঞ্চাশ বছরও লাগবে না। এদের অস্থির ওপর তখন কোলিয়ারির বাবুরা পার্ক করবে। রেস্তোরাঁ করবে। নদী না থাকলে নদী বইয়ে আনবে। মেঘ না থাকলে মেঘ উড়িয়ে আনবে। অথচ এদের জমিতে এত কিছু কোলিয়ারি টোলিয়ারি হল—এদের এতটুকু উন্নতি হয়েছে? খুব রেগে যেত মুক্তেশ। একা একা সরকারের সঙ্গে যেন ও যুদ্ধ করত। নিজের মনে হত লোকটা বদ্ধ পাগল।

মুক্তেশ এমনভাবে ভরতপুরে থাকত, যেন মনে হত ওর কেউ নেই। অথচ কলকাতায় ওর বড় বাড়ি ছিল, শেষের দিকে যা বিক্রি করে ও এখানে হাসপাতালের বিল্ডিং করেছিল। মেদিনীপুরের গ্রামে ছিল ওর সব কিছু। ওর ছেলেবেলা ওখানে কেটেছিল। লোকে ওদের জমিদার বলত। ওর দুই ছেলে ছিল। তারা হস্টেলে থাকত। টাকা পাঠাত, আর সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখত। আইভি যখন ভরতপুর এসেছে তখন রাহুল ইস্কুলে পড়ে। মুকুল মেডিক্যাল কলেজে।

মুক্তেশের স্ত্রী মারা গিয়েছিল। মুক্তেশকে এ নিয়ে দুঃখ করতে কখনও দেখেনি আইভি। বলত আমার বউ আমাকে এত ভালবাসত বলেই

সাততাড়াতাড়ি চলে গেছে। ও ছিল বড়লে ! মেয়ে। ও থাকলে কি এত সব কাজকর্ম করতে পারতাম?

আইভির মনে হত সে কেন মুক্তেশের মতো করে ভাবতে পারে না? সে কি কেবল মুক্তেশের বয়স হয়েছে বলে? তবে জায়গাটার গুণ ছিল। বিকেলবেলা যখন সমস্ত কাজকর্মের শেষে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরত আইভি, দূরের মাঠে সূর্য আগুন জ্বালত। ঘরে ঘরে উনুন ধরানোর ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। সেই অন্তহীন শূন্য রুক্ষ মাঠ, কন্টিকারির নীলাভ ফুল সমেত তার বুকের ভেতর ঢুকে যেত। তখন কোথায় অঞ্জন, কোথায় বাতাসপুর, কোথায় তার গান। ঝিঁঝি পোকার একটানা আওয়াজের ভেতর তার গান হারিয়ে যেত। কোনওমতে টলতে টলতে সে ঘরে ফিরত।

ঘরে ফিরে অবাক হত মুক্তেশকে দেখে। টেবিলের ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বেলে সে পড়তে বসেছে। লছমির কাকি শনি মেঝেন তাকে খেতে দিয়ে রান্না চাপিয়েছে। শুকনো মুড়ি তার গলা দিয়ে নামত না। সে যে বাতাসপুরে খুব ভালমন্দ খেয়ে থাকত, এমন নয়। তবু গলায় তার ব্যথা ব্যথা করত। নিজেকে শান্ত করতে না পেরে মুক্তেশের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। কতক্ষণ পর মুক্তেশের খেয়াল হত একজন দাঁড়িয়ে আছে। মুক্তেশের অজস্র প্রশ্নের উত্তরে সে তখন কোনও কথাই বলত না। শুধু বলত : আরেকজন নার্স আনুন না।

মুক্তেশ বলত : তোমার মতো মেয়ে কোথায় পাব? গড়ব নাকি?

খুব রাগ হত আইভির। কিছু বলতে পারত না। মনে মনে ভাবত সে চলে যাবে। কিন্তু যাবেটা কোথায়? ভরতপুরে একটা খবরের কাগজ আসে না। কখনও সখনও মুক্তেশ বাইরে গেলে নিয়ে যায়। সে চাকরি খুঁজবে কীভাবে, পাবেই বা কীভাবে? অথচ মুক্তেশ একটা লোকও রাখবে না। তাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারবে।

মুক্তেশ কী বুঝে বলত, তুমি সন্ধ্যেবেলায় বসে কী কর। একটু বই টই পড়তে পার। বেশ কিছু বই এনেছি তো আমি, আদিবাসীদের ওপর, সাঁওতালদের ওপর। রুরাল হেল্‌থ-এর ওপর। এইরকম জমিতে কীভাবে চাষাবাদ করা যায় তার ওপর। তুমি পড়লে আমার সুবিধা হয়। হয়তো কখনও আমার থেকে তুমি ওদের জন্য বেশি ভাববে।

আইভি মনে মনে বলত, ভাবব না, ওদের জন্য আমি ভাবতে যাব কেন? আমি নার্স, আমার কাজ শুধু সেবা করা, আপনাকে অ্যাসিস্ট করা, আমি পড়তে যাব কোন দুঃখে। মুখে বলত : পড়তে আমার ভাল লাগে না।

মুক্তেশ আর কিছু বলত না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকত। আস্তে আস্তে আইভি বেরিয়ে আসত। শনি মেঝেনের পাশে বসে গল্প করত। তবে শনি লছমির মতো এত কথা বলত না। হুঁ হাঁ করত মাত্র। বেশিক্ষণ তাই ওর কাছেও বসা যেত না। তারপর ঘুরে ফিরে সেই মুক্তেশের কাছে আসা। টেবিলের পাশে দাঁড়ান।

—তোমার এখানে মন টিকছে না—তাই তো। মুক্তেশ বলত। দু'দিনের জন্য ঘুরে এস না হয়।

আইভি চুপ। মুক্তেশ আবারও বলে : আমি কলকাতা যাচ্ছি, তুমি যাবে? বাতাসপুরে ঘুরে এস না কয়েকদিন। মন ভাল লাগবে। এখানে একা একা থাকা। তুমি বাচ্চা মেয়ে।

—আমি তো বাচ্চা নই ডাক্তার।

—সরি, আমি ভুলে গেছি তোমার একুশ বছর হয়ে গেছে। মুক্তেশ হাসল।

আইভি গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি কী লিখছেন? একটা কাজ করলে হয় না, আপনি ডিকটেশন দিয়ে যান, আমি লিখি।

আইভি লিখতে লাগল, লেখার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে দিল। থেমে গেছে মাঝে মাঝে ডাক্তার। সেও থামছে। ডাক্তার চিঠিপত্র লিখছে। লেখাগুলোর প্রত্যেকটা অক্ষরে তার চোখ ঘুরছে। নেহাত কাজের চিঠি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ভরতপুরের জন্য নানারকম আবেদন করে লেখা চিঠি, উকিলকে লেখা চিঠি, এরকম কত চিঠি সে লিখত। এরকম একদিন ডিকটেশনের জন্য অপেক্ষা করছে সে, মুক্তেশ বলেছিল, আমি যখন বিয়ে করেছিলাম তখন ওর বয়স তোমার থেকেও কম ছিল।

আইভি প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। সে প্রায় সে লাইন লিখেই ফেলছিল। তারপর মুক্তেশের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ এ কথা কেন? এ কথা তার মনে খানিক বন বন করেছিল। তারপর ভেবেছিল ডাক্তার বোধহয় তার মতোই। বউ-এর কথা খুব ভাবে। জানতে দেয় না। তারপর এও ভেবেছিল হয়তো মুক্তেশ বলতে চাইছে তার কাজ যথার্থ হচ্ছে না, বয়সের তুলনায় ছোট আছে সে। হয়তো তার তাই এত মনোবিকলন। ভেতরটা তিতো হয়ে গিয়েছিল। এর থেকে বেশি তো তার পক্ষে কিছু দেওয়া সম্ভব নয়।

সেদিন কাজ আর এগোয়নি। উঠে গিয়েছিল আইভি। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে এই কথা ভেবেছিল। ভেবেছিল বাতাসপুরে তাকে সত্যিই ফিরতে হবে কিনা? বাতাসপুরের পরিস্থিতি কি এখানকার থেকে ভাল হবে? কলকাতা গিয়েই বা কোথায় থাকবে সে। তার তো এখন হস্টেল নেই। তবে কি থাকতে হবে মুক্তেশের বাড়িতে? মুক্তেশের সাহায্য নেবে আর এই কাজ করবে না তাই আবার হয়? নাকি সেটা সম্ভব!

আর বাতাসপুর? যেখানে তার দিদি আর বাবা আছে। সেই বিয়াল্লিশ জন অধিবাসীর সঙ্গে যারা দিন কাটাচ্ছে—তাদের মধ্যে সে ফিরে যাবে কেমন করে? এখান থেকে সে যেটুকু টাকা পায়, হাতখরচা রেখে সবটাই পাঠিয়ে দেয় তার বাবাকে। তবু তার বাবা বা দিদি কেউ একদিনের জন্য লেখে না তাকে আসতে। তার দিদি চিঠিতে লেখে তার বাবা আর বের হতে পারেন না। লেখে সে এখন গানের টুইশন করে চুটিয়ে। লেখে অঞ্জনের বউ তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। তার একটি মেয়ে হয়েছে। আরও লেখে বাবা তার বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে। ও বাড়ির সব লোক নাকি ভাঙিয়ে দিচ্ছে। সুরভি জানতে চায় ভরতপুরে তাদের জাতিগোত্রের কোনও তেমন ছেলে আছে কিনা। এত কথা লেখে তার দিদি, একবারও তার ফেরার কথা লেখে না তো।

তবে কি সে বাতাসপুরে কখনওই ফিরতে পারবে না? অঞ্জন তাকে ত্যাগ করার পর কলকাতার হোটেলে সে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়ে ছিল। যখন তার বাবা তাকে নিতে এসেছে, যখন বুঝতে পেরেছে সে কোন্ খাদের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে—বাবা তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলেন, বাতাসপুরে তুই আর ফিরিস না। ওখানে তুই বাঁচবি না। ফেরেনি সে। বাবার এক মক্কেলের বাড়ি দু'মাস থেকে নার্সিং-এ ভর্তি হয়েছিল। হস্টেলে থাকা। নার্সিং পড়ার খরচ মেটাতে মায়ের গয়নাগুলো সে নিঃশেষ করেছে।

মুক্তেশের বন্ধু এক ডাক্তারই তাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে আগেই বলেছিল মুক্তেশের নাকি কাউকেই পছন্দ হয় না। আইভি জানত তাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। যাওয়ার জন্য সে এক পা বাড়িয়েও ছিল। কারণ কলকাতা নামের সঙ্গে তার অনেক স্মৃতি পেরেক দিয়ে আটকান ছিল। তাছাড়া বাবা বা দিদির হাত থেকেও পরিত্রাণ পেতে চাইছিল সে। আইভি জানত তার অতীতটা আর কোনওমতে মেরামত করা যাবে না। তার অতীত তাকে যেমন তেমন তার পরিবারকেও শেষ করে দিয়েছে। যদি অন্য কোথাও বাঁচা যায়, যেখানে ওইসব ঘটনা তার আঁচল টেনে ধরবে না। তবে সেখানেই যাবে সে।

ইন্টারভিউতে মুক্তেশ একটা কথাই জিজ্ঞেস করেছিল। এই চাকরি থেকে আপনি কী পেতে চান?

আইভি কথা বলেনি। কেননা সে বুঝতে পারছিল না মুক্তেশ কী জিনিস পাবার কথা বলছে।

মুক্তেশ আবার বলেছিল, কত টাকা চান, বাড়ি গাড়ি গয়নাগাটি কী কী চান? মুক্তেশ যেন ইয়ার্কি মারছে। কিংবা সে যেন প্রচুর টাকা নিয়ে বসে আছে। চাইলেই দিয়ে দেবে।

আইভি গুটিয়ে গিয়েছিল। এই পৃথিবীতে তার চাইবার মতো তখন কিছুই ছিল না। সে শুধু বলেছিল, বাঁচার জন্য যতটুকু লাগে ততটুকুই চাই।

কথাটা শুনে শান্ত হয়ে গিয়েছিল মুক্তেশ। তারপর বলেছিল কালকেই যেতে পারবেন আমার সঙ্গে?

ভড়কে গিয়েছিল আইভি। কাল কী করে সম্ভব। তার বাবা বা দিদির সঙ্গে সে দেখা করবে না?

মুক্তেশ বলেছিল, আমি কালই যাচ্ছি। সাড়ে এগারোটায় ট্রেন। তারপর বারোদিন পর আসব। আমি তো কাজের মানুষ। কাজে কখন ফেঁসে গেলাম। হয়তো আসতেই পারলাম না। তখন আপনি যদি চান আপনাকেই যোগাযোগ রাখতে হবে। আমার কিন্তু আপনাকে চাই।

হস্টেলে সারারাত সেদিন ঘুম হয়নি আইভির। সুপারের নির্দেশ চারদিন পর সবাইকে হস্টেল ছাড়তে হবে। চারদিন পরে হস্টেল থেকে গুটিয়ে পাটিয়ে তাকে চলে যেতে হবে। তখন কি বাতাসপুরে তার জায়গা হবে? কোথায় যাবে সে। বাবাকে একটা চিঠি লিখে পোস্ট করে জিনিসপত্র প্যাক করে দশটা নাগাদই চলে এসেছিল স্টেশনে। তখনও জানত না ভরতপুর কেমন জায়গা। মনে হয়েছিল এ জায়গা যেন সভ্য পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত নয়। মুক্তেশ বুঝেছিল সে কথা। বুঝে রাত্রিবেলায় জিপে করে নিয়ে গিয়েছিল কোলিয়ারি দেখাতে। আলোয় ঝলমলে পৃথিবী। পাশাপাশি এত বৈপরীত্য।

বৈপরীত্য মুক্তেশের মধ্যেও। কলকাতার ডাক্তার আর মুক্তেশ—পার্থক্য আকাশপাতাল। মুক্তেশের তখন নাম হয়েছে কলকাতায়। ওর বন্ধুরা কেউ বলত বোকা, কেউ বলত গ্রেট। মুক্তেশ ওসব পাত্তা দিত না। আইভি বুঝতে পারত না লোকটা কোন ধাতুতে গড়া। কী বা প্রয়োজন ওর এত দিনহীনের মতো থাকার। শনি মেঝেনের হাতের রান্না খাবার। কেনইবা ও অত যত্ন

নিয়ে দ্যাখে আদিবাসীগুলোকে? পায় কী তার বদলে?

আইভি সে সময় সন্ধে হলেই হাঁফিয়ে উঠত। আর সকালবেলায় প্রাণপণে কাজে মন দেবার চেষ্টা করত। মানুষ তো কোনও একটা লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে পথ চলে। আইভি ভাবত সে টাকা জমিয়ে একটা বাড়ি করবে। আলাদা বাড়ি। ওই বিয়াল্লিশ জনের নরক থেকে সে বাবাকে দিদিকে উদ্ধার করবে। তাদের নিজেদের বাড়ি হবে। নিজেদের বাথরুম হবে। ঘরের দরজায় দাঁড়ালেই অবাঞ্ছিতের মুখ দেখতে হবে না। সেই জন্যই এত কাজ করা। তবু যাদের জন্য এত কিছু ভাবা তারা তাকে আসতে লেখে না কেন? সে তো এখন চাকরি করে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আইভির অভিমান শুধু বুকে বেঁধে না, ভরতপুরের প্রান্তরের হাহাকারের সঙ্গে মিশে যায়।

মুক্তেশ জিজ্ঞেস করে, বাতাসপুর তুমি যাবে না?

মুখ নিচু করে আইভি 'না' বলে।

মুক্তেশ বলে, তাহলে তোমাদের বাড়ি আমি যাই। গিয়ে ওদের দেখে আসি। ওরাও দেখুন আমাকে; কার কাছে মেয়েকে রেখেছেন—দেখতে হবে না?

আইভি বারণ করেছিল। বলেছিল আমার বাবার কোনও বন্ধুরাও কোনওদিন ওই বাড়িতে আসেনি। নরকের মতো জায়গা। আপনার কোনও মান রাখবে না।

—আমার কোনও মান নেই আইভি। সব অপমানেরই আমি নিজেকে যোগ্য বলে মনে করি। কিছু হবে না, আমি যাই।

—আমার অনুরোধ ডাক্তার। আপনি যাবেন না। আইভির নিজের কানে নিজের কথাগুলো আর্তনাদের মতো লেগেছিল।

কিছুদিন পর মুক্তেশ আরেকজনকে নিয়ে এসেছিল। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার। তারা সকলেই খুশি হয়েছিল। মুক্তেশ নিজের ভাল ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের জন্য খাট তৈরি হয়েছিল। আলমারি তৈরি হয়েছিল। গ্রামের লোকেদের নির্দেশ দিয়ে দিয়ে করান সব। মুক্তেশ ঘরের সঙ্গে লাগোয়া টয়লেট তৈরি করেছিল। আলাদা কিচেন। ভরতপুরের তুলনায় রাজকীয় বন্দোবস্ত।

ওদের ওখানে স্নান করে দিয়ে মুক্তেশ উঠে এসেছিল আইভির পাশের ছোট ঘরটিতে। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলত, আমার তো অভ্যাস আছে। ওদের নেই। তাছাড়া আমার বাপের দায়। ওরা বেচারা কষ্ট করতে যাবে কেন? সকলে এ কথা শুনে হাসত। আইভি ভাবত হয়তো তাকে দেখানোর জন্যই এ ব্যবস্থা। মুক্তেশ হয়তো তাঁকে সঙ্গ দিতে চাইছে। নইলে এই পৃথক ব্যবস্থা দৃষ্টিকটু হয়েছিল বৈকি।

একদিন মুখ ফুটে এ কথা বলেছিল আইভি। বলার একটা সুযোগও পেয়েছিল। রাত্রে খেয়ে একসঙ্গে তারা উঠোনে বসে গল্প করত। মুক্তেশ, আইভি, শনি মেঝেন, বুড়ো দারোয়ান বিষ্টু মাঝি সকলেই গোল হয়ে বসত। শনি মেঝেন বসে বসে চুলত, বিষ্টু খানিকক্ষণ গাঁয়ের সব খবরাখবর দিত। ডাক্তারবাবুর সম্পর্কে কে কী বলছে সে সব বলত। ডাক্তারবাবুও রহস্য করে বলত, আমাদের যে কত পাহারা দেয় বিষ্টু তা তো জানা আছে। তবে ও আমাদের রিপোর্টার তো বটে। তার জন্যই তো ওকে রেখেছি।

এরকম একদিন যখন বাকি দু'জন ঘুমিয়ে পড়েছে আইভি সেদিন তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অন্তত একটা খাট ছাড়া চলে না। খড়ের ওপর শুতে বড় গা কুটকুট করে। এতদিন সে কিছু বলেনি, কারণ ভেবেছে এখানকার এই রীতি। কিন্তু এটা তো না বলে সে পারছে না। কারণ মুক্তেশ অন্যদের তা দিচ্ছে।

মুক্তেশ আইভির মুখে এ কথাগুলো শুনবে আশা করেনি। সে একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। খানিক পরে বলেছিল তোমার ওপর আমি খুব অন্যায় করছি, তাই না। তোমার কাজের তুলনায় টাকাও যে কম তা আমি বুঝি না এমন নয়।

—আমি তো টাকার কথা বলিনি। ন্যূনতম বাঁচার কথা বলেছিলাম। আমি অন্তত ভেবেছিলাম এখানে তোষক জুটবে। আপনি এতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমি তো নই।

—আমি তো মেনে নিচ্ছি আইভি।

মুক্তেশের মুখটা ঝুলে পড়েছিল। ওই অবস্থায় সে কিছুক্ষণ বসেছিল। তারপর স্বগতোক্তি করছে এভাবে বলেছিল, আমি আসলে তোমাকে নিজের মতো ভেবেছিলাম। তাই হয়তো অবিচার হয়েছে।

আইভির খারাপ লাগছিল। তবু সে জোর করে বলেছিল, আপনি যে সমানাধিকারের কথা বলেন, আবার আপনিই ওদের জন্য এরকম ব্যবস্থা করলেন, আমাদের যারা সাঁওতাল কর্মী আছে তারাই বা কী ভাবছে?

—ওরা হয়তো কিছু ভাববে না। তবু এটা যে ঠিক হয়নি এ আমি বুঝিনি এমন নয়। কিন্তু কী করব? কোনও ডাক্তার পাচ্ছি না। সারা ভারত চষে বেড়াচ্ছি। আমি তো সারাক্ষণ এখানে বসে থাকতে পারি না। ডাক্তার আমার দরকার। তাও এত করেও ওদের খুশি করতে পারিনি। এরপর কোলিয়ারিতে ডাক্তার রাখার কথা ভাবতে হবে। তারা এখানে এসে এসে কাজ করে যাবে।

আইভি এই উদ্ভট পরিকল্পনা শুনে হেসে ফেলেছিল। মুক্তেশ হাসেনি। নিঃশব্দে উঠে ঘন অন্ধকার মাঠের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। আইভির ভয় হয়েছিল। বিষ্টু মাঝিকে উঠিয়েছিল। ওই দ্যাখো, ডাক্তার নেমে গেলেন—তুমি ওর সঙ্গে যাও। বিষ্টু মাঝি কাঁচা ঘুম ভাঙাতে রাগ করেছিল। বলেছিল, ও ডাক্তার পাগলা। যেখানে যেতে চায় যেতে দাও। শনি মেঝেনও যেতে চায়নি। বলেছিল ওই দিকে যাব না। ওই দিকে বড় ভুতেরা থাকে। ওই দিকে আমরা রাত্রে যাই না। আইভির শত অনুরোধেও শনি মেঝেনকে মাঠে নামানো যায়নি।

আইভির ভয় করছিল। অসহায়ও লাগছিল। তবু উপায় নেই দেখে মুক্তেশকে খুঁজতে বের হয়ে গিয়েছিল। এবড়ো খেবড়ো মাঠঘাট পার হয়ে মুক্তেশকে সে খুঁজে পেয়েছিল। একটা মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। আইভি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একধরনের অপরাধবোধ হচ্ছিল তার। তার যুক্তিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েও যেন তার দিকে ফিরে আসছিল। আইভি তাই শুধু দাঁড়িয়েছিল। কথা ছিল না মুখে।

মুক্তেশ বলছিল: খাট তুমি পাবে। কিন্তু তোমাকে আরও অনেক কিছু দেওয়া দরকার ঠিকঠাক হিসাব করলে।

—আমি আর চাই না সে সব।

কষ্টলাঞ্ছিত মৃদু হাসি হেসেছিল মুক্তেশ। গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সারা প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। দূরে সাঁওতাল গ্রামগুলো অন্ধকারে উঁচু উঁচু হয়ে আছে।

—আমি তোমাকে নিজের মতো ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আমার সাধনসঙ্গিনী। এই তো আমার সাধনার ক্ষেত্র। মুক্তেশ হাত তুলে গ্রামগুলোকে দেখায়। আসলে এরা তো শিশুর মতো। এত কিছু নেই। তবু নেই বলতে জানে না, চাইতে চায় না। এদের মারতে চাইলে মারাও কত সোজা। দুনিয়ার লোক এদের ব্যবহার করে। ওরা সেটা বুঝতে পারে না। এরা যদি শিশু না হয় তো শিশু কারা।

তুমি এমনভাবে কাজ কর এখানে, এত যত্ন কর ওদের, তোমাকে দেখে কতবার যে আমি অভিভূত হয়েছি তা বলার নয়। আমার থেকেও ভাল সেবা কর ওদের। আমি তো ওষুধ দিই। অপারেশন করি। তুমি কোনও কিছুকে ঘেন্না কর না। আমার কতবার মনে হয়েছে তুমি যেন ওদের আসল মা। আমি যদি ওদের বাবা হই, তবে তুমি নিশ্চয় তারও ওপরে।

আইভি, এসব সত্ত্বেও আমার ভুল হয়েছে নিশ্চয়। ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে তোমার দিকে আমি লক্ষ্য করিনি। তোমার সুখসুবিধা কিছুই দেখিনি। তবু কখনও তুমি বলনি। আজ এদের জন্য এমন ব্যবস্থা না করলে বলতেও না নিশ্চয়।

মুক্তেশ থামল। আইভি বলল, বাড়ি চলুন। ওসব কথা এখন রাখুন।

—রাখা ছাড়া কীই-বা করার আছে আমার? আমার পথ তোমার পথ এক হতে যাবেই বা কোন দুঃখে। আজকে যে আমাকে ডাক্তার বোস বলে লোকে চিনছে তার পিছনে যে এরকম একটি আদিবাসী ছেলের কান্না আছে। সত্যি আইভি, তুমি একটা তাজা তরুণী, তুমি কেন আমার দুঃখের জন্য নিজেকে বলিদান দেবে?

মুক্তেশ ফিরেছিল। জানিয়েছিল আইভি ফিরে যেতে পারে। কলকাতায় মুক্তেশ তার জন্য একটা চাকরির বন্দোবস্তও করে দিতে পারে। কলকাতায় না চাইলে উত্তরপ্রদেশে তার বন্ধুর নার্সিংহোমেও ঢুকিয়ে দেবে। কোনও অসুবিধা হবে না।

পাশাপাশি দুটি ঘরে সেদিন তারা দুজনকার কেউ-ই ঘুমোয়নি।

ভোরে উঠে মুক্তেশ আইভি-কে নিজের ঘরে ডেকেছিল। তার সামনে ব্যাঙ্কের পাশবই ফেলে দেখিয়েছিল তার টাকা প্রায় নিঃশেষের দিকে। জানিয়েছিল এবার তার সম্পদ বলতে দেশের বাড়ির ঘরদুয়ার, জমিজায়গা। সে সবও বেচে ফেলবে। সেগুলো এলে টাকা পাওয়া যাবে—যাতে আরও কয়েক বছর চলে যায়। তার পরেও কিছু টাকা তার বন্ধুবান্ধব দেবে বলেছে। কিন্তু সে সব আর কতটুকু। ক'দিনই বা চলবে এতে। কাজেই আইভি তার ভবিষ্যত কেন ঝরঝরে করবে ভরতপুরে থেকে। মুক্তেশ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পাবেই যে, হাসপাতালকে চিরদিনের জন্য সচল রাখতে পারবেই যে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। মুক্তেশ এসব কথা ডাক্তার দম্পতিদের জানাবে না কিন্তু আইভি-কে না

জানিয়ে সে পারছে না। ভরতপুরের জন্য আইভি অনেক করছে।

সেই থেকে কয়েকদিন মুক্তেশ মনমরা হয়ে ছিল। রাত্রে তারা আর গল্পগুজবও করত না। আইভি-র কাজ বেড়ে গিয়েছিল। ওই দু'জন ডাক্তারের সঙ্গেও তাকে কাজকর্ম করতে হত। খুব পরিশ্রম হত। তবে মুক্তেশের সঙ্গে কাজে আনন্দ ছিল। ওদের সঙ্গে তা ছিল না। খুবই বিরক্ত ছিল ওরা। বার বার শোনাত দেশের সেবা করার জন্যই তারা এসেছিল। অথচ ভরতপুরের পরিবেশে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। মহিলাটির ভাষার সমস্যাও ছিল। দিল্লিতেই সে মানুষ। বাংলা ভাল বুঝতেও পারে না। আইভির ওদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, তবু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পেরেছে এমন নয়। বেশিদিন ওরা থাকতেও পারেনি। মুক্তেশের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল। তবে ওরা সাঙ্ঘাতিক একটা সংবাদ রটিয়ে গিয়েছিল—তা হল মুক্তেশের সঙ্গে নাকি আইভির সম্পর্ক আছে। সেই রাতে তাদের দু'জনকে মাঠ বেয়ে উঠে আসতে দেখেছিল।

প্রথমটায় পাত্তা দেয়নি আইভি। দুঃখও পায়নি। তারপর লক্ষ্য করেছিল শনি মেঝেনও সে কথা জানে। কোলিয়ারির লোকেরা, যারা মুক্তেশকে দেখাতে আসে, অথবা মাঝে মাঝে মুক্তেশও যাদের সাহায্য নেয়, সেইসব লোকেরা আড়ালে আলোচনা করে। বিষ্টু দারোয়ানের তো কোনও বুদ্ধি নেই। এসব কথা তাদের দু'জনের সামনেই সে বলে। মুক্তেশ গম্ভীর হয়ে যায়। আইভি বড় বিচলিত হয়। যা সত্যি নয় তা তার ঘাড়ে এমনি করে চেপে বসবে কেন? বদনাম কি তার পিছন ছাড়বে না? তাছাড়া বাইরে থেকে যে কোনও লোক দেখবে সেও তো এ কথাটাই প্রথমে ভাববে। কেনই বা আইভি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এই গণ্ডগ্রামে, তেপান্তরের মাঠে পড়ে আছে? কেনই বা অন্য কোনও নার্স নিয়ে আসে না মুক্তেশ। তার ওপর দু'জনের পাশাপাশি ঘরে থাকা। শনি মেঝেন বা বিষ্টু এদের কাউকে মানুষ ভাবে নাকি শহরের লোক?

এই ঘটনাটাই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। বাতাসপুর ফিরে যাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আইভি। কয়েকদিন পর মুক্তেশ ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কলকাতায়। সেই সময় তাহলে সে বাতাসপুর ফিরে যাবে এই কথা হয়েছিল।

কয়েকদিন খুব চিন্তামগ্ন ছিল আইভি। মুক্তেশও কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা কিছুই করছিল না। মুক্তেশ যে তার চলে যাওয়া পছন্দ করছে না—এটা মুখে বলার অপেক্ষা ছিল না। আইভির ভয় হচ্ছিল মুক্তেশের কাছ থেকে চলে গেলেও বস্তুত মুক্তেশের ভরসাতেই সে ফিরছে। কলকাতায় কোথাও একটা কিছু সে করে দেবে নিশ্চয়। তার বাবার চিঠি পায়নি বহুদিন। দিদিরও পায়নি। গত মাসে টাকাও তার ফেরত এসেছে। সব কিছু মিলিয়ে তার মনে হচ্ছিল সে যেন বাড়ি যাচ্ছে না। হয়তো ভয়ঙ্কর কিছু দেখবে। কিন্তু কীই-বা দেখবে, সব কিছুর জন্যই সে প্রস্তুত। হয়তো মুক্তেশের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা বাতাসপুরে গিয়েও পৌঁছেছে। হয়তো সেই বাড়িতে কত লোক তার নাম করে বা না করে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। তার বাবা, তার দিদি কানে আঙুল দিচ্ছে। হয়তো ওরা ভাবছে অঞ্জনের ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ভরতপুরে গিয়ে কি আইভি একেবারে খারাপ মেয়ে হয়ে গেল।

মুক্তেশ আর সে এইসব নানান চিন্তা নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল। আইভির কান্না পাচ্ছিল। ভরতপুর সংলগ্ন মালভূমি অঞ্চলের উঁচুনিচু জমি, পাহাড়, জঙ্গল কাজুবাগান পেরিয়ে চলছিল দ্রুত। আইভি নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল। ভাবছিল অঞ্জনের সঙ্গে যদি দেখা হয়? অঞ্জনের সঙ্গে সে কথা বলবে না। কথা বলা উচিতও নয়। সে এখন অন্যের স্বামী। কিন্তু সে কী একবারের জন্যও প্রশ্ন করবে না—যে তাকে সে বিয়ে করেছিল কেন? কিংবা তার জীবন এরকম হয়ে গেল কেন? অঞ্জনের কি কোনও দায় নেই এতে? চোখে জল আসছিল প্রায়। চাদরটা আড়াল করে তাকে ঢাকতে চাইছিল। হঠাৎই মুক্তেশের দিকে চোখ যায়। অত্যন্ত জড়সড় হয়ে লোকটা বসে আছে। হাতে ধরা আছে বই, অথচ পড়ছে না। হয়তো শীত করছে খুব। ট্রেনের মধ্যে ফাঁকফোকর দিয়ে হাওয়াও কম আসছে না। ব্যাগ থেকে চাদর বের করে মুক্তেশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। বলেছিল : আপনি অদ্ভুত মানুষ তো। শীত করছে, একটু আমাকে বলবেন তো।

চাদরটা গায়ে জড়াতে জড়াতে মুক্তেশ বলেছিল : তুমি তো চিরকালই আমাকে তাই ভেবে গেলে। অথচ আমি অতি সাধারণ, সাধারণ বাসনা কামনা আমার আছে। কিন্তু আমার কিছু দায় আছে, পিতৃঋণ। আর সেই করতে এসে এদের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। এখন তো পিছু ফিরে যেতে পারি না। নইলে মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে করে তোমার মতো চলে যেতে। তোমরা কেউ বুঝতে পার না ভরতপুর মাঝে মাঝে আমার গলাও চেপে ধরে। খুব বিষণ্ণ লাগছিল মুক্তেশকে।

আইভি বলছিল, আপনি নিশ্চয় আমার থেকেও ভাল নার্স পেয়ে যাবেন। তখন দেখবেন কাজও ভাল চলছে।

মুক্তেশ গভীর নিঃশ্বাস ফেলেছিল জানলার দিকে তাকিয়ে। তখন সমতল ভূমিতে ট্রেন পা রেখেছে। কলাগাছের সারি, আর ছোটবড় জলাশয়ের মাঝ দিয়ে তারা যাচ্ছে। সেইসব পুকুরে ডোবায় পানিফলের চাষ। হাঁড়ি ভাসিয়ে ফসল তুলছে কত জন। আইভি জিজ্ঞেস করেছিল এখানে আমাকে কাজ করে দেবেন তো। আপনি ছাড়া আমার ভরসা বলতে কেউ নেই।

মুক্তেশ হেসেছিল। হাসিটাও যেন আইভির চলে যাওয়ার প্রতিবাদ ছিল। মুক্তেশ বলছিল : এটাই তো মুশকিল।

আর্ত হয়ে আইভি জিজ্ঞেস করেছিল : তাহলে কি আমার কোনও কাজ জুটবে না?

—অত ভাবছ কেন, আগে বাড়ি যাও। কয়েকদিন বাড়িতে আড্ডা দাও, বিশ্রাম নাও।

—সবই ঠিক। কিন্তু আপনি আমার অবস্থাটা বুঝছেন না ডাক্তার। আমার সত্যি সত্যি কেউ নেই। হয়তো চাকরি পাব, কিন্তু কবে পাব তার তো নিশ্চয়তা নেই।

—আমারও কেউ নেই।

এরপর আর কোনও কথা চলে না। মুক্তেশ হয়তো তার কথা রাখবে না। ভরতপুর থেকে সে চলে এসেছে। আইভি জানে ভরতপুরের জন্য কোনও প্রফেসনাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিস্টার পাওয়া কত কঠিন। তার যদি ব্যক্তিগত জীবনে এই ঘটনা না ঘটত, তাহলে কি সে যেতে চাইত? ভরতপুর তো পৃথিবীর এক প্রান্তে।

হাওড়ায় নেমে মুক্তেশ বলল তোমার সঙ্গে আমি যাই। বাতাসপুরে তোমার বাড়িতে তোমায় রেখে ফিরে আসব।

আইভিও তাই চাইছিল। আসলে সে যে কোন পরিস্থিতির সামনে পড়বে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তার বুক দুরু দুরু করছিল। তবু নিজেকে শক্ত করে সে বলেছিল, থাক, তার দরকার নেই।

মুক্তেশ জানিয়েছিল কলকাতার বাড়িতে সে কয়েকদিন থাকবে। তাকে শেষ মাসের মাইনেটাও সে দিতে চায় ওই বাড়ি থেকে। কেননা কলকাতা থেকেই সে টাকা তুলবে। অবশ্য আইভি না এলে তাকে পাঠিয়ে দেবে। তবে মুক্তেশ তো চায় আইভি মাঝে মাঝে আসুক। বলেছিল ভরতপুর থেকে দূরে থাকলেও মন থেকে তাকে সরিয়ে দিও না।

আইভির ওসব কিছু শোনার অবস্থা ছিল না। সে শুধু জানিয়েছিল : আপনার কাছে তো আমাকে আসতেই হবে। সেই চাকরিটার কথা বলেছিলেন যে।

আইভি যখন বাতাসপুরের ট্রেনে উঠেছিল তখন সে শীতের ধারালো বাতাসকে সহ্য করছিল। তার দিদি আর বাবাকে কত দিন পর দেখতে পাবে এই উত্তেজনা ছিল, আবার বাতাসপুরের লোকে তাকে কীভাবে নেবে সেই ভয়ও ছিল। আইভি ক্রমাগত নিজেকে শক্ত করছিল। সমস্ত আবেগকে সে বুকের ভেতর গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। আর যখন বাতাসপুর এসেছিল সে তখন তার মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিল চাদরে, যাতে খুব সামান্যই তাকে দেখা যায়। আর রাস্তায় কেউ তাকে চিনতেও পারেনি, যতক্ষণ না সে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

অল্পবয়সীরা তাকে দেখে হই হই করে উঠেছিল। তা দেখে শরীরে উল্লাস এসেছিল। পরক্ষণেই তাদের মায়েরা-বাবারা তাকে ঘিরে ভূত দেখার মতো করে দেখছিল। যত বিরূপতা আশা করেছিল আইভি, তত সে পায়নি। একজন কেবল বলেছিল, কী খেয়ে এমন স্বাস্থ্য করলি রে? তাতে কয়েকজন হেসেছিল। বুড়িমতো একজন বলেছিল, ওদের খাবারদাবার কি আমাদের মতো? না ওরা আমাদের মতো লোক। নাম ডোবালে এই বাড়ির! বলতে বলতে সে ভেতরে গিয়েছিল। আইভি এদের সবাইকে ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল আর তখনই শুনতে পাচ্ছিল এ বাড়িতে তার বাবা দিদি কেউ থাকে না। দোতলায় উঠে যখন সে অন্য লোক দেখেছিল তখন তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সে লোকেরাই তার দিদির ঠিকানা দিয়েছিল। দিদি নাকি বিয়ে করেছে।

রিক্সা করে সে যখন দিদির বাড়ি যাচ্ছিল তখন আর তার শীতও করছিল না। বিয়ে করেছে ভাল কথা। তবে তাকে জানাল না কেন? সেই সময় রিক্সা তাকে অঞ্জনদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে আপাদমস্তক ঢেকে সে বাড়ির আনাচে কানাচে অঞ্জনকে খুঁজছিল। অঞ্জনকে সে দেখতে পায়নি। একটি বউকে দেখেছিল। আর ভাল করে তাকাতেই সে বুঝেছিল সে ইরা, তার স্কুলের সহপাঠী, যার রূপের প্রশংসা করত সে। তবে কি এ কথা সত্য নয় যে অঞ্জনের বাবা জোর করে তার কাছ থেকে নিজের ছেলেকে ছাড়িয়ে এনেছে? তবে কি ইরাই তার সর্বনাশ করেছে। ইরা কেন

হবে, অঞ্জন বড় বেইমান। তার সঙ্গে এই সর্বনাশের খেলা খেলার কীই-বা প্রয়োজন ছিল? ইরাও রিস্কা করে চলে যাওয়া সর্বাঙ্গঢাকা মেয়েটিকে দেখছিল। কিন্তু সে তো আইভি বলে চিনতে পারছিল না।

আইভি-কে দেখা মাত্র তার দিদি জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। আইভিও সমস্ত কষ্ট, অপমান ঢেলে দিয়েছিল। দু'জনের আবেগ যখন স্তিমিত হয়েছিল তখন বাবা তাদের দিকে জুলজুল করে চেয়েছিলেন। সুরভি জানিয়েছিল বাবা কেমন হয়ে গেছে। কথাও বলে না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, কোনও লাভ হয়নি। আইভি বাবার শরীরে হাত দিয়ে জানিয়েছিল সে এসেছে। বাবারও চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। তবে ওইটুকুই। আইভি দেখেছিল বাবার বড় দৈন্যদশা। সুরভিরও। ঘরটাও ছোট। একটা ঘর, একটা বারান্দা। ঘেরা বারান্দায় বাবাকে রেখেছে তার দিদি ফুটোফাটায় চট গুঁজে। সে ঘর দেখছিল। তার দিদিও ব্যস্ত হয়ে বলেছিল : ওখানে আর থাকতে পারছিলাম না রে। চারদিকে এত জ্বলন—এরপর আর উটকো ঝামেলা ভাল লাগে না। তাই ভাড়া দিয়ে এখানে এলাম।

—বেশ করেছিস। এখানে অন্তত শান্তি আছে।

—তুই খুশি হয়েছিস আই, আমার বড় ভাবনা ছিল। সুরভি কেঁদে ফেলল।

আইভি খুব অপ্রস্তুত হল। বলল : কাঁদছিস কেন, তুই এখানে থাকবি, তুই যা ভাল বুঝবি তাই করবি।

—তোর টাকাতেই তো চলছিলাম। আমার তো তেমন কিছু নেই। খুব খারাপ লাগত রে!

—চুপ কর তো। ধমক দিল আইভি। তারপর বলল বিয়েতে আমাকে খবর দিলি না কেন রে? তোর বরকে নিয়ে নিতাম?

—বিয়ে হয়ে আমাকে কেমন দেখতে লাগছে রে আই?

—দারুণ। আইভি সুরভিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বলল বরটি কে, দেখাবি না?

তারপর আইভি শুনল সেই বিয়ের উপাখ্যান। এক বয়স্ক ছাত্রকে বিয়ে করেছে সুরভি। সেই ছাত্র অবশ্য তার থেকে বয়েসে অনেক বড়। বউও আছে। স্কুলের টিচার। বউ সব জানে। তার যাবার কোনও জায়গা নেই। লোকটি তবে বিবেচক। পালা করে থাকে, একদিন এখানে, একদিন ওখানে।

আইভির চোখে অন্ধকার নামল। মুহূর্তে বুঝে গেল ওই বাড়ির লোক তাকে কী বলতে চাইছিল। সুরভির প্রতি রাগে ঘৃণায় তার মনও কুঁকড়ে গেল। এই তবে তার দিদি? বাবা তবে এইরকম ভাবে তাদের তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যে তার বাবা এমন স্থবির হয়ে গেছে, তাই বুঝতেও পারছে না সুরভি, তার বড় মেয়ে কী কাণ্ডটাই না করেছে।

সুরভির ঘরে একটা বড় তক্তপোষ। একটা ট্রাঙ্ক। তার ওপর তানপুরা। তানপুরার নীচে দুটো গাঁদা ফুল। পুজো করে নাকি সুরভি? দেওয়ালে দুজনকার যুগ্ম ছবি।

সুরভি বাবাকে দুধভাত খাইয়ে দিচ্ছিল। আইভি না থাকতে পেরে বলল : এমন বেআইনি কাজ করলি কেন?

—আইনে আমার দরকার নেই বলে। সুরভি যেন প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুতই ছিল।

—তুই কি বলতে চাইছিস? তোর যদি কোনও বিপদ হয় ওই লোকটা তোকে দেখবে? মজা লুটে চলে যাবে না?

—ও তো যে কেউ যেতে পারে।

আইভি ধাক্কা খেল। সুরভি কি অঞ্জনের কথা বলতে চাইছে! সে বলল, আমাকে দেখেও বুঝলি না, শিখলি না কিছু।

সুরভি বড় শান্ত। আইভির মতো নয়। ধীরে ধীরে বলল, তুই তো বিয়ে করেছিলি রে। কালিঘাটে বিয়ে-কে তো আমাদের হিন্দুরা কম মানে না। তবু তো কিছু হল না। সেই দেখে তো চোখ খুলে গেল রে। আচ্ছা আই, তোর কি খুব দুঃখ হচ্ছে আমার জন্য। দুঃখ করিস না। সত্যিই আমি ভাল আছি। ভাবনা তোদের সবার সবটুকু টাকা খসিয়ে আমার বিয়ে হল। ছেলেপুলে হল। গানটান চুলোয় গেল। তারপর হয়তো আমাকে হয় ভাগিয়ে দিল নয় ঘরের এক কোণে লাথিঝাঁটা মেরে ফেলে রাখল। কী লাভ বল দেখি। অনেক ভেবেছি রে আমি। লোকটা মন্দ নয়। টাকাপয়সা কিছু দেয়। যেদিন থাকে রাত্রে খায়। আমিও গান শেখাই। এখানে খুব একটা হয় না, তবে হয়ে যাবে। ভাড়াটা পাই। বাবার চলে যায়। মৃদু হাসল। যেন সব সমাধান করে দিল তার দিদি।

—তোর টাকা নিতে বড় খারাপ লাগত রে। সুরভি বলছে।

আইভি তখন হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই ঘরে তার কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। জায়গা নেই তার দিদির কাছেও।

সুরভি তার মাথায় হাত রাখল। বলল : বোকা মেয়ে, তোর বুঝি নিজের জীবন নেই? তুই বুঝি টাকা জমাবি না, বাঁচবি না,

বিয়ে করবি না? আমি জানি সব টাকা তুই পাঠিয়ে দিতিস। আমার নিতে বড় কষ্ট হত। তোর পরিশ্রমের বিনিময়ে আমি বাঁচব? কোথায় আমার তোকে দেখা দরকার বড় দিদি হিসাবে।

—তুই আমাকে একদম ভালবাসিস না। তুই তো ওই লোকটার কাছ থেকে টাকা নিস।

—ওই লোকটা বুঝি তোর কেউ হয় না। ওই লোকটা ওই লোকটা তখন থেকে বলছিস যে। সুরভির গলায় স্নেহ উথলে এল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, আমাদের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কটা আছে রে। আমার কাছ থেকে ও কিছু পায় বৈকি। তুই এও ভাবতে পারিস আমি ওর বউ-এর সর্বনাশ করলাম কেন? আমারও এ নিয়ে খুব মনখারাপ হত। পরে ভেবেছি ওর সর্বনাশ আগেই ঘটেছিল, তাই ওর স্বামী অন্যপথে এসেছে। এরজন্য আমি দায়ী হতে যাব কেন? ধর অঞ্জন আজ তোর বন্ধু ইরাকে বিয়ে করেছে। তোর দুভার্গ্যের জন্য ইরা দায়ী হতে যাবে কেন?

—দিদি, আইভির বুকের ভেতর থেকে তীব্র চাপা স্বর বের হয়ে আসে। দিদি, আমিই যে ইরার সঙ্গে পাষণ্ডটার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তখন যে বুঝিনি কিছুই। এত বোকা আমি— আইভির গলার স্বর চেপে এল।

সুরভি বাবাকে খাইয়ে শুইয়ে দিচ্ছে। দুপুরে তারা একটু বিশ্রাম নেবে। সুরভি বিকেল বেলায় গান শেখাতে বের হবে। অন্যদিন সে তালা দিয়ে যায় বাবাকে। একটা চাবি প্রতিবেশীদের হাতে দিয়ে রাখে। কোনও প্রয়োজন হলে তারা দ্যাখে। ও বাড়ির মতো অবস্থা নয়। ও বাড়ির লোক তাদের জন্য কম করত না, কিন্তু কথা শোনাতেও ছাড়ত না। এ ব্যাপারে তারা নির্মমতার সীমা স্পর্শ করেছিল। সুরভির জীবন এখানে অন্যরকম। তবে একান্তই তার নিজের মতো। এখানে আইভির কোনও স্থান নেই।

দুপুরে আইভিকে পাশে শুইয়ে সুরভি বরের গল্প করছিল। শুধু বরের গল্পই নয়, বরের বছর তিনেকের ছেলের গল্পও। মাঝেমাঝে তাকে সে বেড়াতে নিয়ে আসে। সতীনের গল্পও করে। সুরভির মতো ভালমানুষ মেয়েও বলে যে— তার বরকে সতীন কত কষ্ট দেয়। আইভি বড়ো অবাক হয়। ভাবে এই বিয়েকে বাবা সুস্থ থাকলে কীভাবে নিতেন। ভাগ্যে তিনি এরকম হয়ে গেছেন। তবে সুরভি তার যত্ন করে। কলকাতায় চাকরি করলে কি এভাবে বাবাকে দেখা সম্ভব?

সুরভি বলে, তুই নিজের পাত্র নিজেই দেখিস আই, আমাদের জন্য কে আর দেখবে বল?

—আমি তো আর বিয়ে করব না দিদি।

—আজ বলছিস, কাল আর বলবি না। তখন খুব একা লাগবে।

—আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না।

—পারবি দেখিস। আমার মতো ভীতু মেয়ে পারল, আর তুই পারবি না— এ হতেই পারে না। জীবনে তো কাউকে প্রয়োজন— অবলম্বন করার জন্য। নইলে আমরা বাঁচি কেন বল, কী লাভ বেঁচে থেকে? আজকে ও আছে বলেই না এত কষ্ট গায়ে লাগছে না।

আইভি ভাবছিল মুক্তেশের তো কেউ নেই। মানুষ নয়, কাজ অবলম্বন হয়েছে তার। তারও না হয় এরকম হবে। কিন্তু সেরকম হলে তো ফের মুক্তেশের কাছে ফিরতে হয়। কিন্তু ফেরার মুখ কী তার আছে? মুক্তেশ হয়তো খুশি হবে, কিন্তু ভরতপুরে বাকি জীবন কাটানো যাবে তো।

সুরভি জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁরে তোদের ডাক্তারের তো বউ মরে গেছে। ওর সঙ্গে তোর কিছু হয় না।

—কী যে বলিস দিদি, ও অনেক বড় আমার চেয়ে। এটা ভাবাই যায় না। আইভি উড়িয়ে দিল। ওর ছেলেরই আমার কাছাকাছি বয়স।

—তাতে কী এসে যায়। মনের মিল হলেই হল।

বিকেল বেলায় সুরভি গান শেখাতে চলে গেলে ঘরে থাকতে বড় অসহ্য লাগল আইভির। খানিকক্ষণ বাবার কাছে বসল। বাবা এখন অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেন। উ আ করে হয়তো কোনও কথা তাকে বলতে চাইছেন, সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। অসহায় হয়ে বাবার সামনে বসেছিল সে। কিছুতেই ভাবতে পারছিল না এ তার বাবা। একবার কল্পনা করল কলকাতার কোথাও সে বাসা করে বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা ভাবতেই তার অসহ্য মনে হল। এই কয়েক বছর যেন তার কাছে কয়েকটা যুগের ফারাক এনে দিয়েছে। মনে হচ্ছে সে যেন আলাদা গ্রহের লোক। একটা বৃন্ত থেকে যে তারা দুটো ফুলের মতো ফুটেছিল, একই রকম তাদের রঙ, গন্ধ ছিল। হঠাৎ বদলে গেছে সব। ওই বাড়ির জানলা, দরজা, গালিগালাজ, বাচ্চাকাচ্চার সঙ্গে তার ছোটবেলা জড়িয়ে ছিল, সেখানটায় যতই খারাপ লাগুক তার নিজস্ব একটা জায়গা ছিল, আজ কিছুই নেই। আর আজ যদি সুরভির বর আসে? সে কোথায় থাকবে? যদিও সে শুনেছে তার বর আজ

আসবে না, কিন্তু কাল তো আসবে। কাল কি তাকে দেখে সে ফিরে যাবে? আইভি ধীরে ধীরে একটা চরম সত্য অনুভব করছিল। অঞ্জন চলে যাবার পরও তার দিদি ছিল, বাবা ছিল। আজ তার কেউ নেই। এই বড় নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সে একা। এক যদি মুক্তেশ তাকে নেয়। তবে সেও নেবে তার কাজের জন্য, স্বার্থের জন্য। এই মাটির পৃথিবীতে তার আপনার লোক বলতে কেউই রইল না। আইভি জীবনে এই প্রথম তার মায়ের অভাব বোধ করল। মা থাকলে এমনটা হত না নিশ্চয়।

সুরভির মতো বাবাকে তালা দিয়ে চাবি প্রতিবেশীর হাতে সমর্পন করে বাইরে বের হল। এ কবছরে বাতাসপুরের সব যেন আমূল বদলে গেছে। পায়ে পায়ে সে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। এই স্টেশনে অঞ্জনের সঙ্গে সে দেখা করত। বাবলুদার চায়ের দোকানে চা খেত। বাবলুদার দোকানটা সেইরকমই আছে। অঞ্জন কি এখনও বিকেলে আসে? বাবলুদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে হত। আইভির বড় লজ্জা হল। বাবলুদার কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে! আসলে অঞ্জন আর সে, দুজনকে একসঙ্গে ও চিনত। দুজনের যেন একটাই অস্তিত্ব ছিল। আজ আইভি কে? অনেকক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল আইভি। আগে নিয়ম করে অঞ্জন বেড়াতে আসত বিকেলে। আজ এলে সে সামনে দাঁড়াবে। তার তখন একটাই প্রশ্ন— আমাকে হোটেলে একা ফেলে গেলে কেন? একবার বলে গেলে না কেন? যদি সাংঘাতিক বিপদ হত। তখন তো সে কলকাতার কিছু চেনে না। হোটেল মালিক তাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলেছিল। ব্যাগ নিয়ে সে রিসেপশনে বসেছিল। সেদিনকার কথা ভাবলে গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। যাকে অঞ্জন বিয়ে করেছিল তার কি সামান্যতম সম্মান থাকতে নেই? চিরদিনের মতো সেদিন তার সব লজ্জা চলে গিয়েছিল। সে যে একটা ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সেকথা রাস্তার লোকেরও জানা হয়ে গেছে। তাকে রেখে আবার সেই ছেলেটিও পালিয়েছে। কত লোকের কত প্রশ্ন। মাথা ভর্তি সিঁদুর নিয়ে মুখ নিচু করে সে দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ না তার বাবা এসে তাকে উদ্ধার করেন।

আইভি ভাবল সত্যি অঞ্জন তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেই ঘটনার পর তো তার বেঁচে থাকার কিংবা কোনও কিছু অনুভব করার কথা ছিল না। যে কোনও খারাপ লাগাই সেদিনকার তুলনায় কত তুচ্ছ। অথচ ভরতপুরে মুক্তেশকে জড়িয়ে কত সামান্য কথাই তাকে বিদ্ধ করল। সে চাকরি ছেড়ে দিল। স্টেশনের পাতাঝরা শীর্ণ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আইভির মনে হল সে বড় শূন্য। তার কিছু নেই। রূপ নেই, যৌবন নেই, অর্থ নেই, ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সারা শরীর সেকথা ভাবামাত্রই থরথর করে কেঁপে উঠল। এত খালি আগে তার কখনও লাগে নি। যখন সে হোটেলে সকলের চোখের সামনে রাস্তার মেয়ের মতো দাঁড়িয়েছিল তখন ভাবত তার অঞ্জন আছে। যখন ভরতপুরে মুক্তেশ বা কেউ তাকে কোনওরকম কষ্ট দিত সে ভাবত এবার সে বাড়ি চলে যাবে। বাড়িতে তার দিদি আছে, বাবা আছে। আজ তার কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। সামনে দিয়ে ঝমঝম করে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে গেল। লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠল। হাওড়ার দিকের লোকাল আসছে। লোকজন তাকেও দেখছে। কিছুই গায়ে লাগছে না আইভির। হঠাৎ মুক্তেশকে মনে পড়ল। কাজের জন্য হোক যে কারণেই হোক মুক্তেশ তাকে চায়। তাকে ফিরতেই হবে। ভরতপুর ছাড়া কোথাও তার কোনও জায়গা নেই। আইভি সেইমুহূর্তেই মুক্তেশের কাছে যেতে চাইল।

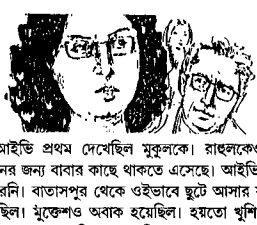

সেইরাতে আইভি প্রথম দেখেছিল মুকুলকে। রাহুলকেও। হোস্টেল থেকে কয়েকদিনের জন্য বাবার কাছে থাকতে এসেছে। আইভি একেবারেই ওদের আশা করেনি। বাতাসপুর থেকে ওইভাবে ছুটে আসার ফলে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মুক্তেশও অবাক হয়েছিল। হয়তো খুশিও হয়েছিল। কিন্তু দুই পুত্রের সামনে খুব বেশি কথা বলছিল না। বলার সুযোগও ছিল না। দুই ভাইয়ের সমস্ত মনোযোগই তার দিকে। তারা দুজন সারাক্ষণই মুক্তেশের পাশে বসেছিল। যেন ইচ্ছে করেই তাকে একা ছাড়বে না। মুক্তেশ শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কাল আছ তো? এর উত্তরে আইভি বলতে চাইছিল চিরদিনের জন্য এসেছি। তার বদলে সে শুধু ঘাড় নেড়েছিল। মুকুল জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি সঙ্গে কিছুই আনেননি দেখছি, আপনার ড্রেস কি এখানেই থাকে?

চমকে উঠেছিল আইভি। মুকুল তখন চালাকির চোখে তাকে দেখছে। বদ ছেলেগুলোর মতো তার লম্বা লম্বা চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে। জুতো পরা পা দুটো সমানেই নাচিয়ে চলেছে সে। আইভি সঙ্গে কিছুই আনেনি। স্টেশনে সে পয়সার ব্যাগটা নিয়ে বের হয়েছিল। তারপর মনটা হঠাৎই তার খারাপ হয়ে যায়। সুরভি তাকে কিছু না বললেও সে স্পষ্ট অনুভব করেছিল তার কাছে থাকা সম্ভব নয়। কিছু না ভেবেই ট্রেনে চেপে এসেছিল সে। মুক্তেশের সঙ্গে ভরতপুরে থাকতে থাকতে এতই সহজ হয়েছিল সম্পর্ক যে তার কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে সে অনায়াসে জামাকাপড় কিনতে পারে। তাছাড়া মুক্তেশের কাছে সে টাকা পাবেও। কিন্তু মুকুল কোনও সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করছে না। তির্যক কথার তিরে আইভিকে বিদ্ধ করাই তার উদ্দেশ্য।

আইভি বলেছিল, আমার কাল পর্যন্ত এতেই চলে যাবে। মুক্তেশ হয়তো আইভিকে এতটা লক্ষ্য করেনি।

বলতে চায় মুকুল সেটাও নিশ্চয় বোঝেনি কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান করছিল। মুক্তেশ আইভির দিকে তাকিয়ে বলেছিল: জামাকাপড় আনতে ভুলে গেছ বুঝি! রাতে পরার জন্য কিছু একটা আনতে পারতে।

আইভির মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। মুক্তেশ সেটা লক্ষ্য করে বলেছিল— ঠিক আছে, এক কাজ কর। তুমি তো অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু বিশ্রাম কর। দোতলায় গিয়ে একটু শুতে পার।

মুকুল বলছিল, আপনি আমাদের এই বাড়ির সব চেনেন দেখছি।। মাঝেমাঝেই এসে থাকেন বুঝি। একবারই এসেছিল, তখন বাড়িটা ভালোকরে দেখিয়েছি। মুক্তেশ উত্তর দিয়েছিল।

কাঠ হয়ে বসেছিল আইভি। মনে হচ্ছিল এ বাড়ি যেন আর মুক্তেশের নেই। মুকুল রাহুলদেরই হয়ে গেছে। তার মধ্যে মুকুল সাংঘাতিক। ওই বাপের এই ছেলে!

কলকাতার চাকরিটা সম্পর্কে আপনি কিছু জেনেছেন? ব্যস্ত হয়ে বলে ফেলেছিল আইভি। কলকাতার চাকরি সম্পর্কে আর আদৌ সে ইন্টারেস্টেড ছিল না। তবু এই ছেলেগুলোর কাছে ভরতপুরে সে ফিরে যেতে চায় তাও বলতে পারছিল না। কারণ আইভি বুঝতে পারছিল না, এরা এই সংবাদ জানে কিনা যে সে চাকরি ছেড়েই ফিরেছিল।

মুক্তেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। মাথা চুলকে সে বলেছিল একথাটা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। ওদের সামনেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল: তুমি ভেবে দেখেছ যে ভরতপুরে একেবারে থাকতে পারবে না?

আইভি কোনও কথা বলতে পারছিল না। ভাবছিল মুক্তেশকে কি একেবারে একা পাওয়া যাবে না। একাও তার দরকার নেই। মুকুলটাকে যদি বের করে দেওয়া যায়।

মুক্তেশ বলল, কাল পর্যন্ত ভাব। একান্তই যদি ভরতপুর না যেতে চাও তো কাল ফোন করে জানব— এদিকে তোমার জন্য কোনও ভ্যাকেন্সি আছে কিনা।

ওরা চারজন একসঙ্গেই খেতে বসেছিল। দুপুরের পর পেটে কিছুই পড়েনি। তার ওপর এত টেনশন। তবু সে প্রায় কিছুই খেতে পারছিল না।

মুকুল বলল, ভরতপুরে তো আপনি বছর খানেক রইলেন। কেমন লাগল আপনার?

—ভাল। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আইভি।

—এটাই তো স্ট্রেঞ্জ! তা একবার যখন ওখানে মন মজেছে তখন আবার এদিকে কেন?

আইভি মুকুলের দিকে সরাসরি তাকায়। তার ভ্রু কুঁচকে আসে। মুকুল যেন আইভির রাগ দেখে মজা পায়, হাসে। মুখ থেকে তার খাবার প্রায় ছিটকে যায়। বলে, আপনি রাগ করলেন। ভরতপুরের মতো আপনিও অদ্ভুত। আমার তো ভরতপুরে থাকতে হবে ভাবলেই কান্না পায়।

মুক্তেশ বলল, মুকুল, আজ কে বলতে পারে হয়তো ওরা ওভাবে কষ্টে আছে বলেই তুমি ভাল থাকতে পারছ।

—বাবা, তুমি ফিলজফিতে যেও না। এটা থাকতে পারার ঘটনা নয় তোমাকে আমি ধরি না। কিন্তু এনার মতো অল্পবয়সীকে দেখেই আমি অবাক হচ্ছি। নিশ্চয় উনি মাঠ, ঘাট, ট্রাইবাল এলিমেন্ট ছাড়াও ঊর্ধ্বজগতের কিছু পেয়েছেন।

—মুকুল, বয়সে বড় হলেই যে সববুদ্ধি পাকে না তা তুমি বোঝ কি? খাওয়া হলে উঠে যাও। এক্তিয়ারের বাইরে কথা বোলো না।

মুক্তেশের ধমক খেয়েই মুকুল চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ থালায় আঁকিবুকি কেটে সে উঠে পড়ল। আইভির খাওয়াও থেমে গেল। মুক্তেশ অবশ্য মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছিল। কিছু হয়নি এরকম ভান করছিল। রাহুল

তাদের দুজনকে দেখছিল। মুকুলের থেকে রাহুল অনেকটাই ছোট। তার চোখগুলো গোলগোল। সম্ভবত ও ওর মায়ের মতো দেখতে। ও ভয়ে ভয়েই তাকাচ্ছিল।

পরিস্থিতিটা যদিও ভারী হয়ে উঠেছিল, আইভি সামান্য সান্ত্বনা পেয়েছিল মুক্তেশের ব্যবহারে। মুক্তেশের গাম্ভীর্য এড়িয়ে সে রাহুলের সঙ্গে কথা বলছিল। একটা দুটো কথার উত্তরও দিচ্ছিল ছেলেটা। আইভির হঠাৎই রাহুলকে ভাল লাগছিল মুকুলের বিপরীতে। মনে হচ্ছিল ক'দিনের জন্যে বাবার কাছে আনন্দ করতে এসেছে বেচারা। এরমধ্যে তার উপস্থিতি হয়তো পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু আইভি থাকলেই বা দোষ কী? সে কি তাদের কোনও আনন্দে যোগ দিতে পারে না?

মুক্তেশ আইভিকে বলল, তুমি দোতলার বাঁ দিকের ঘরে শুয়ে পড়। ওটা পরিষ্কার আছে। এমনিতে ওটাতে আমি থাকি, আজ নিচে থাকব। অনেক কাজ আছে।

আইভির অস্বস্তি হচ্ছিল মুক্তেশের ঘরে থাকতে। ভরতপুরে তারা বড় সাধারণ ছিল। শহুরে হিসাবনিকাশ, কিংবা শহুরে রুচি কিছু মানার সেভাবে প্রয়োজন হত না। কলকাতায় সবই অন্যরকম। আইভি মুক্তেশের কথার কোনও প্রতিবাদ করল না। মুক্তেশ যা বলেছে তার আর নড়চড়ও হবে না।

আইভি দোতলায় উঠল। মুক্তেশের বাড়ি অনেক বড়। কিন্তু অধিকাংশ অংশই ভাড়া দেওয়া, নিচের দুটো আর ওপরের দুটো ঘর ছাড়া। দোতলার ঘরে বড় পুরনো পালঙ্ক, পুরনো দিনের আয়না। কারুকার্য করা আলমারি। আইভি বিছানায় শুলো। হঠাৎ মনে হল বারান্দায় কে যেন রয়েছে। বেরিয়ে এসে দেখল রাহুল। আইভি খুশি হল। নিজের ঘরে ডাকল। এল না রাহুল। শুধু বলল, এটার আমার মা থাকত।

ভেতরে একটা ধাক্কা খেল আইভি। রাহুলের যা বয়েস, অনায়াসে সে তার ছোট ভাই হতে পারত। তবু কে জানে কেন তার মনে হল এ তার সন্তানও হতে পারে। এর আগে কখনও মাতৃস্নেহ সে অনুভব করেনি। আর তারও তো মা নেই। মা না থাকলে জীবন যে কী উৎকেন্দ্রিক হয়ে যায় তা কি আইভির অজানা?

আইভি জিজ্ঞেস করল: তোমার কি মাকে খুব মনে পড়ে। খুব দ্রুত ঘাড় নাড়ল রাহুল, না না একটুও না।

—আমারও মা নেই। খুব ছোটবেলা মা মারা গেছেন। আইভি বলল। রাহুল চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আইভির ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে একটু আদর করার। কিন্তু বড় হয়ে গেছে রাহুল। অন্তত চেহারায় সে বেশ বড়সড়। আইভি আলতো করে তার গালে হাত দিল। মুখটা সরিয়েও নিল না সে। কিন্তু হঠাৎই আইভির চোখে চোখ রেখে সে স্বাভাবিক গলাতেই বলল আপনি কি বাবাকে বিয়ে করবেন?

গালে যেন কষে একটা থাপ্পড় খেল আইভি। এইটুকু ছেলে বলে কী? এ তো একেবারে কেউটের বাচ্চা। এত সাহস কোথকে সে পায়!

—হঠাৎ তুমি একথা বলছ?

—এমনি, সত্যি কিনা বলুন না। রাহুলের গলায় জেদ প্রকাশ পেল।

—না, আইভির গলা প্রায় চিরে যায়। সে রাহুলের মুখের ওপর দরজটা বন্ধ করতে চায়। ওইটুকু ছেলের সঙ্গে অসভ্যতা করা যায় না বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। চেয়ারে বসে মাথাটা টিপে ধরে। আইভি বুঝতে পারে মুক্তেশের বাড়িতে থাকাটা তার পক্ষে কত কদর্য হয়েছে। মুক্তেশের দুটি ছেলেই কী সাংঘাতিক। কিন্তু ওইটুকু ছেলের মনে এই পাপ কে ঢোকাল? মুক্তেশ কি এরকম কিছু ভাবতে তাদের সাহায্য করেছে? তাহলে কি তার আর ভরতপুর যাওয়া উচিত হবে? ভাগ্যে মুক্তেশের সঙ্গে এ নিয়ে কোনও কথা হয়নি। মুক্তেশ যদি যোগাযোগ করতে দেরি করে সে অবশ্যই তার প্রাপ্য টাকা নিয়ে চলে যাবে। বাতাসপুরেই কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবে যতদিন না কিছু পাওয়া যায়। কলকাতায় কত নার্সিংহোম, সে কি কিছুই পাবে না নাকি?

দরজায় খুট খুট শব্দ হচ্ছে। বিরক্ত করছে বড় ছেলেটা। এইটুকু ছেলে। অথচ কী নোংরা। হাজার হোক মুক্তেশকে সে দোষ দেবে না। লোকটাকে মাসের পর মাস, দিনের পর দিন দেখেছে। ভরতপুরে আর যে কোনও পুরুষের সঙ্গে ওইভাবে থাকতে পারবে কি আইভি? দরজায় আবার শব্দ। একটু জোরে। মুক্তেশ নয়তো? মুক্তেশকে কি রাহুলের কথা বলা দরকার? তাকে একথা বলা তো একাণ্ডই দরকার, যে তার ছেলের মনে বিষ ঢুকেছে। ছেলেদের সমালোচনায় মুক্তেশ রাগ করুক আর যাই করুক আইভিকে একথা বলতেই হবে।

শব্দটা বাড়ছে। আইভি দরজা খুলল। রাহুল কী ব্যাপার?

—কথাটা কি বাবা জানতে পারবে?

—পারাই তো উচিত

—আমি ওটা ইচ্ছে করে বলিনি। মুকুল আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল। রাহুলের মুখ কুঁকড়ে গেল।

—ঠিক আছে, নিচে যাও। ডিস্টার্ব কোরো না অহেতুক।

—আর একটা কথা। অনেকদিন আগে একবার বাবা ভরতপুর নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে কোনও টয়লেট ছিল না। মাঠে যেতে হত। রাহুলের ঠোঁটে ফিচলে হাসি। এখনও কি ওইরকম যেতে হয়? রাহুলের দাঁত বের হয়ে গেছে।

আইভির ইচ্ছে হচ্ছিল কান ধরে মলে দেয়। মনে হচ্ছিল বলে যে হোস্টেলে কি এসবই শেখো। কিন্তু আইভির অন্যত্র চোখ গেল। আধো অন্ধকারে দেয়ালে এক পা ভাঁজ করে মুকুল দাঁড়িয়ে আছে। এবার আইভি সত্যিই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল।

সেই বিশাল শয্যায় নিজেকে মানাতে লাগল আইভি। কাল মুক্তেশকে সবকথাই সে বলবে। আর ভরতপুরও সে যাবে। এদের সে সমীহ করতে চেয়েছিল, ছোট বলে আদর করতে চেয়েছিল। আইভির এটাই শিক্ষা হল যে সে ভালবাসতে চাইলেই অন্যজন যে চাইবে তার মানে নেই। কাজেই তার এগোতে যাওয়া বৃথা। হয়তো তার কোনও ভালবাসার সামর্থই নেই, তাই এতটুকু ছেলে থেকে আরম্ভ করে অঞ্জন অবধি কেউ ধরা দেয় না। ইরার কী ছিল তার তুলনায় রূপ ছাড়া— অথচ তাকেই অঞ্জনের শ্রেয় বলে মনে হল। তাহলে সম্পর্কের সব অর্থ মিথ্যে? তাহলে কি কিছুই গড়ে ওঠে না? অঞ্জন যখন তার কোনও আবেগের মূল্য রাখেনি তখন এই বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে সে কোনও সংবেদন আশা করেছিল? এতো নিতান্ত ছেলেমানুষ। কেউ শিখিয়েছে, বলেছে। যদি না শেখাতও, একথা মনে হওয়াও তো অস্বাভাবিক নয়। বাবাকেই বা তারা চেনে কতটুকু? চিরকাল হস্টেলে মানুষ। বাবার ওপর ভরসা রাখা তাদের পক্ষে কঠিন। তবু ওদের জন্য ওদের অক্ষমতা প্রমাণের জন্য ভরতপুর যাবেই আইভি। মুকুল চাইছে না যে সে ভরতপুর যাক— এটা স্পষ্ট। হয়তো ভাবছে তাতেই সম্পর্কটা দানা বাঁধবে। যদি ও ভেবে থাকে তো ভাবুক। আইভি মুকুলের মতো একটা অসভ্য ছেলের ইচ্ছার কাছে নত হবে না। যতদিন না মুক্তেশ ভরতপুর যায়, ততদিন সে ওদের চোখের সামনে এ বাড়িতে থাকবে। একমাত্র মুক্তেশ চাইলেই সে বাইরে যাবে। নতুবা নয়।

সারারাত ছেঁড়া ঘুমের পর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আইভি একতলার বারান্দায় বসে ছিল। মুক্তেশ চা নিয়ে তার সামনে বসল। আইভির ভেতরে গতরাতের কথাগুলো গজগজ করছিল। কিন্তু মুক্তেশকে বলতেও ইচ্ছে করছিল না। সকালের সবটুকু সুর কেটে যাবে বলে। মুকুল রাহুল এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। আইভি মুক্তেশকে দেখে হাসল। সুপ্রভাত বলার মতো মুখ করে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুক্তেশ বলছিল, আজকের দিনটা তোমার জন্য দেব। তোমাকে একটা ভাল ইনস্টিটিউটে না ঢোকালে আমার শান্তি হবে না।

আইভি মিটি মিটি হাসছিল।

মুক্তেশ বলছিল, আজ অনেকগুলো ফোন করতে হবে। তাছাড়া ভরতপুরের জন্যও তো কাউকে জোগাড় করতে হবে। কোনও গ্রামের মেয়ে হলে ভাল হয়। তার থাকার সম্ভবত অত অসুবিধে হবে না।

—আমারও অসুবিধে হয়নি। একদিন বলে দেখছিলাম আপনি কী বলেন। বলা মাত্র কাজ হয় কিনা।

—এ রকম পরীক্ষা করলে খুব মুশকিল। সবসময় পাশ তো নাও করতে পারি।

—আমার মতো মেয়ের কাছে তো আপনি ফুলমার্কস পেয়ে যান।

—সে আর পেয়ে কী হবে? ফুলমার্কস পেয়ে তো তোমাকে রাখতে পারলাম না। মুক্তেশ আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল— অবশ্য ওই জায়গায় থাকা যে কোনও মোটামুটি সচ্ছল লোকের পক্ষেই মুশকিল। আমাদের আরামটা অভ্যাস হয়ে গেছে কিনা।

—আপনি রয়েছেন তবে কী করে?

—বাপের দায় বলে। মুক্তেশ আগের মতো রহস্য করে কথা ওড়ায়। নিজের প্রশংসা কখনওই শুনবে না।

—ওরকম বলবেন না। সত্যি আমাকে বলুন না ডাক্তার, আপনি কোন শক্তিতে সব ছেড়ে ভরতপুর নিয়ে পড়ে আছেন, কী পান ওখানে?

—এক একজন এক একরকম। এছাড়া আর কী।

তোমার তো ভাল লাগল না। যদি ভাল লাগত, ভালোবেসে ওখানে থেকে যেতে তাহলে কখনও হয়তো তোমাকে বলতাম। হয়তো বুঝতে তখন।

—আমি ভরতপুরে যেতে চাই।

—তার মানে?

—আমি মনস্থির করেছি আমি আপনার কাছেই কাজ করব। আইভির গলায় আকুলতা ছিল।

ডাক্তার ওর দুই হাত ধরে ফেলেছিল উত্তেজনায়। তুমি সত্যি বলছ। আইভি জানিয়েছিল তার আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। সে চিরদিনই ওখানে থাকতে চায়।

আইভির চোখে জল আসছিল। নিজেকে প্রাণপণে শক্ত করছিল। ডাক্তার বলছিল, তুমি জান না তুমি আমাকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছ। ডাক্তারের চোখ চকচক করে উঠেছিল। সে বলেই যাচ্ছিল— ভরতপুরকে বাঁচিয়ে দিলে। ওই বোকা অশিক্ষিত সাঁওতালগুলো হয়তো কোনওদিন বুঝবে তাদের জন্য তুমি কী মূল্য দিয়েছ। এসব স্বগতোক্তি করেই মুক্তেশ যেন সচেতন হয়েছিল। বলেছিল, আজ ফিস্ট হবে। ভাল দিন। সকলেই রয়েছে। সকালবেলায় মনটাই ভাল হয়ে গেল।

আইভি বাধা দেবার চেষ্টা করল। মুকুল রাহুল এটাকে ভাল করে নেবে না জানা কথা। কিন্তু মুক্তেশ কিছুতেই শুনল না। দু'জন বন্ধুকে ফোন করে নেমন্তন্নও করে ফেলল। মুক্তেশ যখন মেতে ওঠে তখন কিছুতেই তাকে থামান যায় না। তবে আইভিও নিজেকে খুশি রাখতে চেষ্টা করছিল। মুকুলের সামনে সে নিজেকে যথাসম্ভব ভাল আছে দেখাচ্ছিল। হাজার হোক মুক্তেশের সে প্রিয়পাত্রী। মুকুলের অপছন্দে কীই বা তার এসে যায়।

আইভির জামাকাপড় কিনতে হত। মুক্তেশের কাছে টাকা চাইলে মুক্তেশ তাকে পোষাক কিনতে বারণ করে। তারপর দোতলায় নিয়ে গিয়ে আলমারির চাবি খোলে। থরে থরে সাজান শাড়ি। মুক্তেশ বলে যতগুলো খুশি নাও। সবতো পচছে। আমার স্ত্রীর এত শাড়ি। প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারি না। একদিন নিশ্চয় আমি ভরতপুরে এগুলো বিলিয়ে দিতে পারব পচে যাবার আগে।

—কী যে বলেন

—ওরা শাড়ি পরতে পায় না, এখানে এত সব পড়ে থাকবে।

—তবু তো স্মৃতি। স্মৃতিই তো সব।

—মৃতই তবে সব, জীবিতরা কিছু নয়? আইভি চুপ করে গেল। মুক্তেশ আলমারি খুলে দিয়ে চলে গেল।

শাড়িগুলোয় হাত দিতে দিতে অদ্ভুত অনুভূতি হল আইভির। সেইসব মোলায়েম স্পর্শে তার গায়ে কাঁটা দিল। একটা শাড়ি টেনে বের করতেই শাড়ির ভেতরে থাকা ব্লাউজ অন্তর্বাস মাটিতে পড়ে গেল। আইভি দু'পা পিছিয়ে এল। ওগুলো আলমারিতে তুলতে তুলতে রাহুলের কথাগুলো মনে পড়ল। নিতান্ত অসভ্যর কি কথাটা? তার দিদিও এই প্রস্তাবটা করেছিল। তারপর নিজেকেই সে এর অবাস্তবতা বোঝাতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সে যখন মুক্তেশের স্ত্রীর শাড়ি ব্লাউজ পরে বের হয়ে এল, তখন সে অন্য মানুষ।

পিকনিক হচ্ছে বাড়ির ছাদে। মুক্তেশের দুই বন্ধু এসেছে। তাদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছে ও। মুক্তেশ তাকে ডাকল। একঝলক লক্ষ্যও করল তাকে। আইভির সামান্য লজ্জা করছিল। তবু সে বসল। ওদের একজন তাকে প্রথম নিয়ে এসেছিল মুক্তেশের কাছে। কিছুক্ষণ বসে রইল আইভি। ওরা ওদের মতো কথায় মত্ত। পুরনো দিনের গল্পের মধ্যে ডুবে গেছে ওরা। আইভিও খানিক শুনল মুক্তেশদের ইস্কুলের গল্প, মেডিক্যাল কলেজের গল্প। মুক্তেশ ওর বিদেশের জীবনের নানা কথা বলছিল। ওরা মুক্তেশের বিয়েরও গল্প করছিল। এই প্রথম আইভি জানতে পারল মুক্তেশের বউয়ের নাম পরমা। ওরা সব পরমার সম্পর্কে নানা মজার কথা বলছিল। মুক্তেশও ওদের সঙ্গে খুব হাসছিল। আইভি ভাবছিল পরমা কেমন দেখতে। ঘরে তার একটা ছবি নেই কেন? মুক্তেশ নিজের বাড়ির লোকেদের সম্পর্কে এত নীরবই বা কেন? স্ত্রীর কথা তেমন করে কখনও বলেনি ও। আইভি শুধু তার শরীরের পাকে পাকে জড়ান শাড়িটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল। মুক্তেশের কি তাকে দেখে তার স্ত্রীজ কথা একবারও মনে পড়ছে না?

আইভি উঠে গিয়ে কার্নিশের কাছে দাঁড়াল। পুরনো আমলের বড় বাড়ি। বাড়িটা শহরের মাঝখানে নয় বলে কয়েকটা গাছপালা চোখে পড়ছে। অধিকাংশ নারকেল গাছ। একঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে। বসন্ত আসব আসব করছে। হাওয়ায় শীতের প্রকট কমে গেছে। ভরতপুরে হয়তো ঠাণ্ডা আছে, কলকাতায় বেশ গরম। রোদও বেশ জোর দেখাচ্ছে। আইভি রোদের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরল। গুটিয়ে গেলে তার চলবে কেন? সে যেন আস্তে আস্তে জোর পাচ্ছে, পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ছায়া ছেড়ে, মুক্তেশদের আড্ডা ছেড়ে ছাদের অপর প্রান্তে তীব্র রোদের মধ্যে দাঁড়াল।

পিছন থেকে মুকুল বলল, আপনি এখানে? বুড়োদের আড্ডার মধ্যে আর ভাল লাগল না?

আইভি মুকুলের ঔদ্ধত্য মাপছিল। এত রাগ কীসের মুকুলের? একে সহ্য করা কঠিন। তবু গতরাত্রের মতো তার আর রাগ হচ্ছিল না। তাছাড়া আইভি আর কিছু মনেও করবে না। নিজেকে তার বেশ বড় বড় লাগছিল। মুক্তেশ যে তাকে গুরুত্ব দেবে এতটা, এটা ধারণা ছিল না আইভির। এই কাজে যদি তার এত মূল্য, তবে এটার মধ্যেই নিজেকে দেবে সে।

—সত্যি আপনি যে কীভাবে বুড়োদের মাঝখানে থাকতে পারেন? মুকুল তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলছিল।

একটা হাল্কা হাসি মুখে ছড়িয়ে রেখেছিল আইভি। কথা বলছিল না। একথার কোনও উত্তর হয় না। শুধু ভাবছিল মুকুল ঠিকঠাক থাকলে, মানুষের মতো মানুষ হলে তার বন্ধু হতে পারত। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা কার্নিস ধরে। দুজনেই তাদের চোখ ভাসিয়ে দিতে চাইছে দূরে অথচ পরস্পরের প্রতিটি আচরণই লক্ষ্য করছিল তারা।

—আপনার তো নার্সিং-এ ডিগ্রি আছে। কলকাতায় তো এখন চেষ্টা করলে ভাল চাকরিই পেতে পারেন। আমিও চেষ্টা করতে পারি। আমারও কিছু কানেকসনস আছে।

—তার আর দরকার নেই। আমি ভরতপুর যাচ্ছি।

—রিয়েলি, সোজাসুজি তাকাল মুকুল। যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না।

—ভীষণ ভাললেগে গেছে জায়গাটা, ভীষণ। আইভি একটু কায়দা করতে চাইল।

—তা না হয় হল। একধরনের ন্যাচারাল বিউটি আছে বৈকি। কিন্তু আপনার একা লাগে না? ওখানে তো কথা বলার মতো কেউ নেই।

—কেন মুক্তেশ আছে। বলে ফেলে আইভির নিজের কানেই কথাটা কট্ করে লাগল। মুক্তেশকে তো কখনওই সে নাম ধরে ডাকে না। ডাকার প্রশ্নও নেই। ওখানকার সবাইকার মত সেও ডাক্তার বলে। আইভি লক্ষ্য করল মুকুলের মুখের সব উজ্জ্বলতা নিভে গেছে। সব চালাকি চলে গিয়ে কালো হয়ে গেছে। নিজের অস্বস্তি ছিল, তবু মজা পেল আইভি। মুকুলকে কষ্ট দিয়ে মজা পাচ্ছিল সে। তারপর আবার বলছিল, মুক্তেশকে তোমার মানুষ বলে মনে হয় না? আমার তো বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে।

মুকুল আইভির থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছিল। দূর থেকেই সে বলল, কারুর কারুর এমনি হয়। স্ট্রেঞ্জ!

—এতে অবাক হবার কী আছে? আইভি খোঁচাতে চাইল।

—আচ্ছা,আপনি কি কোনও ইয়ার ছেলের কাছে ধাক্কা খেয়েছিলেন?

আইভি চমকে গেছে। নিজের ভেতরে প্রশ্নটা ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কেন? এ কথা কেন?

—তাহলেই এরকম হয়। সমবয়সী ছেলেদের তখন ঘৃণা করতে থাকে। মনে করে ওরাই দেবতা।

আইভি একমুহূর্ত মুকুলকে দেখল। সবল দীর্ঘ দেহ। ইয়াংই বটে। মুক্তেশের মতোই গায়ের রঙ মুকুলের। মুক্তেশ কি এইরকম দেখতে ছিল অল্প বয়সে?

—তুমি কি সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়বে নাকি?

—না না, হাসল মুকুল। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। সচরাচর এমনটাই হয়। আবার নাও হতে পারে। আপনার ক্ষেত্রে কোনও নিয়মই খাটছে না। আপনি অদ্ভুত মেয়ে।

শেষ বাক্যটা আইভির কানেই কেমন যেন শোনাল। মনে হল সে যে মেয়ে—এ কথা যেন অনেক দিন শোনেনি সে। মুকুলকে তার এখন আগের তুলনায় সহজ লাগছিল। তবু সে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকছিল আর ভাবছিল মুকুলের কোনও খারাপ কথাকেই সে পাত্তা দেবে না।

এরপর রাহুল ব্যাডমিন্টন খেলতে চাইলে মুক্তেশ, মুক্তেশের বন্ধুরা হই হই করে খানিক খেলতে লাগল। আইভিকেও ওরা ডাকছিল। কিছুক্ষণ খেলেছিল। কিন্তু খেলার তেমন অভ্যাস না থাকায় অধিকাংশ সময়ই কক্ র‍্যাকেটে লাগছিল না। সে সরে দাঁড়িয়েছিল। মুকুল দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। ওকে আর আগের মতো অ্যাগ্রেসিভ লাগছিল না। আইভি আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়েছিল। তারপর মুক্তেশদের তিন বন্ধুর উদ্দামতা দেখিয়ে বলেছিল, ওদের এখনও তোমার বুড়ো লাগছে? স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ শব্দটা শুনিয়ে সে মুকুলকে যেন ব্যঙ্গ করতে চাইছিল।

মুকুল কিছু বলেনি। মুকুল ওদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল যেন মনে হচ্ছিল ওরা বাইরের লোক। ওরা বুঝি তাকে খেলায় নেবে না। মুকুলের হার স্পষ্টত দেখতে পেয়ে আইভির ভেতরে একধরনের উল্লাস বোধ হচ্ছিল। সে মুকুলকে আরও ঘাঁটাতে চাইছিল। বলেছিল, তোমার মায়ের শাড়ি পরেছি দেখেছ। আমি পরতে চাইনি। উনিই জোর করলেন।

—ভাল তো। ভাল লাগছে আপনাকে। মিনমিন করে বলল মুকুল। আমার অবশ্য এই শাড়ি পরা মাকে মনে নেই। মুকুল যখন শাড়ি সমেত আইভিকে দেখছিল তখন ওর চোখগুলোকে করুণ লাগছিল। তা যেন ব্যথায়

টনটন করছিল। আইভির অবশ্য ওর প্রতি এককণা সহানুভূতি ছিল না।

পিকনিক শেষ হবার পর মুকুল হস্টেল চলে গিয়েছিল। যাবার আগে আইভির সঙ্গে খানিক কথা বলেছিল।

বলেছিল মুক্তেশের সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক ঝামেলা চলছে তার। সে বিদেশে পড়তে যেতে চায়। মুক্তেশ এমনই যে ছেলের স্টেটুকু ভাল হোক তাও চায় না। বলে, যা পড়েছিস তাতে ঢের হবে। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা ওটুকু পেলেই বেঁচে যায়। কিন্তু মুকুল আরও পড়তে চায়। দরকার হলে বাবার কোনও টাকাই সে নেবে না।

আইভি অবাক হয়ে বলেছিল : এসব আমাকে কেন বলছ?

—আপনাকে বলা এ কারণেই যে মুক্তেশ বোস সম্পর্কে আপনার সব জানা দরকার। আপনার তো দেবতা।

—মানে, তুমি কী বলতে চাইছ?

—বলতে চাইছি, উনি অসম্ভব স্বার্থপর। উনি নিজে বাপের টাকায় বিদেশ গিয়েছিলেন অথচ আমাকে বাধা দিচ্ছেন। এটা কোন ধরনের মরালিটি? আপনি কি জানেন আমার ঠাকুরদা আমাদের জন্যও টাকা রেখে গেছেন। উনি সব ভরতপুরে ঢালছেন। এসব কি মুক্তেশ বোসের নিজস্ব অর্জন? উনি কত দিন এখানে প্র্যাকটিস করেছেন? কত টাকা জমিয়েছেন? যখন সব লোকে সার্জেন বলে ওনাকে চিনছে, সব লোক ওনার নাম করছে তখন উনি ভরতপুর নিয়ে মাতলেন। আপনি তো এই লাইনের লোক। আপনি বলুন তো ওই গ্রামে উনি কী সার্জারি করবেন? ভাল একটা অপারেশন থিয়েটার ছাড়া ওনার মতো একজন ডাক্তার বাঁচে কী করে?

অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁফাচ্ছিল মুকুল। চোখমুখে রক্তের আভা লেগেছিল। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল আইভি।

মুকুলের উত্তেজনা তখনও শেষ হয়নি। দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, আপনি এখন বুঝছেন না, এই ভদ্রলোক কী সাঙ্ঘাতিক স্বার্থপর। নিজের ভাললাগা, নিজের পছন্দ ছাড়া কিছুই বুঝবেন না। সবাইকে ওঁর ইচ্ছার কাছেই বলি দিতে হবে। হয়তো ওনার ইচ্ছা উনি প্রফেট হবেন। মুকুল কাঁধ ঝাঁকাল।

—মুকুল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? আইভি গম্ভীর গলায় বলেছিল। মুক্তেশের নামে এরকম শুনতে খারাপ লাগছিল।

—হয়তো তাই হবে। গলা নামিয়ে ছিলেন মুকুল। উনি চান আমি ভরতপুরে গিয়ে থাকি। ওদের ডাক্তার হয়ে জীবন কাটাই। আচ্ছা আপনিও তো তাই চান? সে আইভির দিকে তাকাল।

—আমার চাওয়ায় কী যায় আসে।

—বলুন না, সত্যি করে বলুন না আপনি কী চান, সত্যি বলুন। মুকুলের মধ্যে ব্যগ্রতা ছিল।

—সত্যি বললে বলব, আমি একেবারে চাই না তুমি ওখানে যাও। ওখানকার উপযুক্তই তুমি নও।

মুকুল আর দাঁড়ায়নি।

ভরতপুরে ফেরার ট্রেনটা ছিল সন্ধ্যেবেলায়। মৃদু জ্যোৎস্না ছিল সেদিন। সন্ধ্যে থেকেই চাঁদ তাদের সঙ্গে দৌড়চ্ছিল। রাতের ট্রেন বলে লোকজনও তেমন নেই। ফাঁকা ফাঁকা। দখিনা হাওয়ার মতো হাওয়া দিচ্ছে। যদিও আইভি সারা শরীর একটা পাতলা চাদরে মুড়ে রেখেছিল।

মুক্তেশ নানাভাবে তার খুশি বোঝাচ্ছিল। পিকনিকের আনন্দ, বন্ধুদের সঙ্গে মজা করা, সব বৃত্তান্তই যেন রোমন্থন করছিল। আইভিকে সঙ্গে নিয়ে সে চলেছে—এটাও যেন তার যুদ্ধজয়। সে কাজেরও ফিরিস্তি দিচ্ছিল। ওখানে গিয়ে কী কী কাজ করতে হবে।

আইভি ভাবছিল মুকুলের কথা। মুক্তেশ নাকি স্বার্থপর লোক। কিন্তু কে স্বার্থপর নয়? অঞ্জন নয়? সুরভি নয়? তাদের তুলনায় মুক্তেশ দেবতা নয়তো কী? সে কি নিজের জন্য কিছু করছে? তাছাড়া আইভিকে এটুকু মূল্যই বা কে দিয়েছে?

বিপরীত দিকে মুক্তেশ বসে আছে। আইভির সিটে পা তুলে দিয়েছে সে। তার স্পর্শ পাচ্ছে। রাহুলের কথা মনে হল। সুরভির কথাও। এবারের ভরতপুর যাওয়া অন্যরকম। চাকরি করতে নয়। চিরকালের মতো। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার মতো ফিরে কোনওদিন আর আসা যাবে না। তোমাকে ভাল লাগাতেই হবে। একা লাগছে বললেও তো চলবে না।

মুক্তেশ বলছে, আজ জার্নিটা দারুণ, না। তুমি ভাগ্যে এলে তাই এভাবে দেখছি। অন্যদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোই। খুব ভাল লাগছে আজ। মনে হচ্ছে রাতের এই সৌন্দর্য যেন কখনও দেখিনি। তুমি গান জান আইভি? গাইবে একটা।

—গান আর গাইতে পারি না ডাক্তার।

—পারবে, গাও না।

আইভির স্বর ফুটছিল না। উল্টে তার গলায় জমাট বাঁধছিল কান্না। কিন্তু সে তো কাঁদবে না। সে আর কোনওদিন কাঁদবে না। কার কাছে কাঁদবে? কার জন্য কাঁদবে? কেবল বলল, পারব না ডাক্তার।

মুক্তেশ বলল, রবি ঠাকুরের একটা গান আমার খুব প্রিয়। অন্ধকারের গান, জ্যোৎস্নার গান। আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। শুনেছ তুমি?

আইভি কোনওমতে 'হ্যাঁ' বলল।

—আসলে আমার মনে হয় গানটা বুঝি শুধু জ্যোৎস্নার নয়। প্রকৃতির নয়। আরও অন্য অনেক কিছু মানে আছে তার। আমার তো মনে হয় এ আমার নিজের গান।

আইভি বাবার কথা ভাবছিল। স্থবির মূক বাবাকে তালা দিয়ে চলে এসেছে। বাবা কি বুঝতে পেরেছেন সে চলে যাবে? যাবার আগে কত কী বলতে চেষ্টা করছিলেন, কতরকম শব্দ করছিলেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি। বাবা কি খুব দ্রুত মারা যাবেন? বাবাকে কি সে শেষ দেখা দেখল? বাবার কাছে গান শিখেছিল আইভি। এই গানও বাবা শিখিয়েছিলেন। তার সঙ্গে গল্পও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে কলেরায়। সেই সময় ট্রেনে যেতে যেতে দেখেছিলেন জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ প্রান্তর। জগতে সব কিছু পূর্ণ। কোথাও কোনও কাজ থেমে নেই। তখনই নাকি তার এই গান মনে জাগছিল। এ কথা মুক্তেশকে বলতেও তার এখন ইচ্ছে হচ্ছে না। গান তার শরীরে জেগে উঠছে, কিন্তু গলা দিয়ে বের হচ্ছে না।

মুক্তেশ ধীরে ধীরে আবৃত্তির মতো করে গানের কথাগুলো বলে চলছে।

আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।

আইভির মনে পড়ছিল সুরভিকে। ওইটুকু ঘর কী সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে তার দিদি। নতুন সংসারে ভাগের স্বামী পেয়ে কত খুশি তার দিদি। ভাবছিল অঞ্জন নিশ্চয় এখন ইরার পাশে সুখে ঘুমোচ্ছে। সন্তানের পিতা হিসাবে সে হয়তো এখন খুব স্নেহশীল। দায়িত্ববান। সকলেই ওরা পরিতৃপ্ত নিশ্চয়।

মুক্তেশ আবার গানটা বলে চলেছে। নিজেকে যেন শোনাচ্ছে। স্বগতোক্তির মতো করে বলে যাচ্ছে। জাগছে তো আইভি। কাজেকর্মে নিজেকে না দিলে তার আর বেঁচে থাকার রসদটুকু মিলবে না। কিন্তু কে তার জন্য আসবে? তাকে সেভাবে গ্রহণ করতে কে আসবে? তাকে মনে করার মতো কে আছে? কারুর জন্য তার অপেক্ষা নেই। সব শূন্য। মাঠের মত ধূ ধূ করছে। ঠিকই করেছে সুরভির কাছ থেকে চলে এসে। অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি তাও ভালই হয়েছে। ওরা তো সুখি। ওদের সুখের পাশে নিজের দুঃখের ছবি নিয়ে সে দাঁড়াবে না। সেও মনে মনে বলছিল

যাব না গো যাব না যে, রইনু পড়ে ঘরের মাঝে—
এই নিরালায় রব আপন কোণে।

অঞ্জনকে বাসে তুলে দিয়ে ধীর পায়ে আইভি হসপিটালের দিকে আসছিল। আলোয় আলোময় হয়ে আছে বিল্ডিংগুলো। এত সব লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে কেন? কোন প্রয়োজনে লাগে? মিটিং-এ বারবার খরচ কমানোর কথা হয়। এই কি খরচ কমার লক্ষণ? মুক্তেশ অনেক ফান্ডের ব্যবস্থা করেছিল। নিউজিল্যান্ড থেকে টাকা আসত। সরকারি সাহায্যও পেত। বাইরের টাকা বন্ধ হয়ে যদিও যায়নি। সরকারি টাকা গেছে। কোপদৃষ্টিতে পড়েছে এই ভরতপুর। একবার স্থানীয় এম. পি.'র সঙ্গে ঝামেলা লেগেছিল। মুক্তেশ সব দিক সামলাতে পারত। ওকে মানুষ শ্রদ্ধাও করত। মুক্তেশের সঙ্গে তাদের তুলনাও চলে না। মুক্তেশ বিল্ডিং তৈরির ওপর নজর দিত না, বাইরের কোনও রঙচঙের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তার সময়ে অধিকাংশ ঘরের মাথা ছিল টালির। আইভির হাতে ক্ষমতা এলে সে সেই বিল্ডিং তৈরি শুরু করে। একবার টালি পড়ে একজন পেশেন্টের মাথা ফেটে গিয়েছিল। সেই থেকেই আইভি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এভাবে আর নয়। তবে সে যেটুকু করেছিল সবই প্রয়োজনে। আর মুকুল এই আদিবাসী গ্রামের হসপিটালকে একেবারে বম্বে দিল্লির স্টাইলে বানিয়ে দিল। যা সঞ্চয় ছিল, তিল তিল করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ নেওয়া যত টাকা ছিল, মুক্তেশেরও যা ছিল সব খরচ করে দিল মুকুল। বাইরের পেশেন্টদের কাছে বেশি টাকা আদায় করে ম্যানেজ করতে চাইল মুকুল। বলল ওরা সব বড়লোক। দেবে না কেন? কিন্তু তার ফলে বদনামও হল। মুকুলের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আইভির বড় গায়ে লাগে। কী করে সে ভরতপুরকে তার নিজের থেকে আলাদা করবে। প্রায় জন্মমুহূর্ত থেকেই যে সে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মুক্তেশ বলত, আইভি, একে তুমি

নিজের সন্তান ভাব। নইলে কিছুতেই ভাল লাগাতে পারবে না। কিছুতেই এর জন্য সর্বস্ব দিতে পারবে না।

—আমাকে কি সর্বস্ব দিতেই হবে ডাক্তার?

—তুমি না দিলে কে দেবে? ওরা যে সব চাকরি করতে এসেছে।

—আপনি তো আজকাল প্রায়ই থাকেন না, আমার আর ভাল লাগে না।

—আমি থাকি না তো কী হল। এত জন থাকে। তুমি জান না—আমার কি কম কাজ! তাছাড়া এই হসপিটাল তো তোমার। তুমি তো আর আগের মতো শুধু নার্স নেই, তুমি এখন সমিতির কত বড় পোস্টে আছ। তোমার ভাল লাগে না, এ কথা বলে চলবে কী করে। তোমাকে এখানকার মানুষ কত ভালবাসে। আমি আর ক'দিন বাঁচব বল! তারপর তুমিই তো আমার উত্তরাধিকারী।

আইভি যে সব কথা বলতে পারে না। ভরতপুরের সবধরনের কাজের সঙ্গে তাকে পাকে পাকে জড়িয়েছে মুক্তেশ। সারাক্ষণ তাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও মুক্তেশ দিয়েছে। কিন্তু তারপর? কাজের পর তো মানুষের কোনও নিজস্ব জীবন থাকে। তার তো কিছু নেই। ভরতপুরে অনেক ডাক্তার এসেছে, কর্মী এসেছে। অনেকের সঙ্গেই পরিবার আছে। তারা নিজেরাই হই চই করে সময় কাটায়। আইভির সঙ্গে তারা ভাল ব্যবহার করে, তারা ওকে সবাই সম্মান করে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। সবাই জানে সে মুক্তেশের ডান হাত। সবাইকার সন্দেহ সে মুক্তেশের প্রেমিকা।

অথচ আইভি কোনওদিন কোনওভাবে মুক্তেশকে বোঝাতে পারেনি যে সে না থাকলে তার কাজ করার আগ্রহ কমে যায়। মাঝে মাঝে নিজেকে যন্ত্রের মতো লাগত। মুক্তেশের ঘর থেকে তখন স্কচ চুরি করে খেত। এই বিলাসিতা ছিল মুক্তেশের। তারও স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তেশের ঘরের চাবি থাকত তারই হাতে। মুক্তেশ নিশ্চয় ধরতে পারত। তবু কখনও কিছু বলেনি। হয়তো এইটুকু সুযোগ সে দিত। এটা তো নিজের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। মুক্তেশ আর সে একসঙ্গে বসে কখনও পান করেনি। মৃত্যু অবধি আইভি এটা মেনেছিল।

তখন মাঝে মাঝেই সপ্তাহখানেক থাকত না মুক্তেশ। ভরতপুরে এসে দু'দিন থেকে সব দেখেটেখে চলে যেত। কত রকমের যোগাযোগ তৈরি করতে হত তখন। আইভির ঘাড়ে সব দায়িত্ব। স্কুল, ট্রেনিং সেন্টার চালানো, এমনকি মুক্তেশ ডেয়ারির কথাও ভেবেছিল। আইভি তাও গড়ে তুলেছিল। সব দেখতে হত একা। হিসাব করা, লোক খাটানো, কোলিয়ারিতে দুধ পাঠানো—এসবের সঙ্গে হসপিটালের কিছু কিছু। অবশ্য তখন হসপিটালের দায়িত্ব অন্য জনকে দিয়েছিল মুক্তেশ। এক একদিন নাওয়াখাওয়ার সময় পেত না। তার ওপর গ্রামের মানুষজন একটা কথা বোঝে না। তারা সাহায্য পেলে আরও অধীর হয়, বড় অবুঝ তারা। পাঁচরকম তাদের আবদার, মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত আইভি। তবু সে এমনই সব দিক ভাল করে চালিয়েছিল যে মুক্তেশ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খাবার পর তাদের বসার অভ্যাসটা ছিলই। মুক্তেশ অবশ্য গ্লাস নিয়ে বসত। আইভিকে মুক্তেশ সেদিন একটা উপহার দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, বল তুমি কী চাও।

—উপহারের লোভে তো কাজ করি না। আমি কিছু চাই না।

অভিমান ঘন হয়ে উঠেছিল আইভির ঠোঁটে। মুক্তেশ দিন দিন বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। তার কোনও খেয়ালই রাখে না সে। যে লোকটা সাঁওতালদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলে, অন্য কর্মীদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করে, সেও মাঝে মাঝে আইভিকে বেপাত্তা করে। খাবার পর তারা সামান্য আলোচনা করত কাজকর্ম সম্পর্কে, চারপাশ সম্পর্কে। ভরতপুর আসার প্রথম দিনটি থেকেই তা নির্দিষ্ট। তবে পরে পরে এমনও হয়েছে তারা দুজনে কেবল বসে থেকেছে। আইভি একটা ম্যাগাজিন নিয়েছে, মুক্তেশেরও হাতে কোনও জার্নাল। নেহাত বসার জন্য বসা। গ্লাস শেষ হয়ে গেলেই 'গুড নাইট' বলত মুক্তেশ। কয়েকদিন সে যায়ওনি। মুক্তেশও ডাকেনি। কাজ থাকলে মুক্তেশ ডাকে। নানাভাবে তাকে বোঝায়। আইভিও সে সময় কাজেই ঝাঁপিয়েছিল। মাঝে মাঝে তার মনে হত মুক্তেশকে অতিক্রম করে যাবে সে। মুক্তেশ এখানকার মানুষজনের জন্য যত না করেছে তার থেকে বেশি কিছু করবে সে। রাগে রাগেই সে প্রাণপাত করে পরিশ্রম করত।

তারপর কখনও হয়তো মুক্তেশ তার কাজ দেখে অবাক হয়ে যেত। কখনও প্রশ্ন করত, তোমার কি শরীর খারাপ? একবার চেক আপ করিয়ে নিও। রোগা লাগছে খুব।

—আমার শরীর চিরকালই খুব ভাল ডাক্তার। অসভ্য রকমের ভাল—আইভি হাসতে চেষ্টা করত।

—খুব খাটছ তুমি। ডেয়ারির কথাটা আমি কেবল ভেবেছিলাম। তুমি যেভাবে সেটা গড়ে তুললে। আবার ওদের বেশ লাভও থাকছে দেখছি।

—আমরাও একটা পার্সেন্টেজ রাখছি। হসপিটালে আর দুধ কিনতে হচ্ছে না।

—আমি এতটা আশা করিনি। তুমি মিরাকল ঘটিয়েছ। আসলে তুমি কিছু করলে আমার এত গর্ব হয়। তুমি আমার আবিষ্কার।

আইভি উত্তর দিত না। এর কীইবা উত্তর হয়। তবু মুক্তেশের প্রশংসা তার কাছে খুব মূল্যবান ছিল। ওইটুকু প্রশংসায় সে অন্তত একমাস কি পনেরো দিন ভাল থাকত। কাজ করার উৎসাহ পেত। তখন মনে হত আর কী চাই। আর কী পাবার আছে তার।

মুক্তেশ বলত শরীরের দিকে যত্ন নাও। তোমার শরীর ভেঙে গেলে আমার কী হবে? ভরতপুর নিয়ে আমার এত স্বপ্ন।

—আমি যে ভরতপুরেই মরতে চাই ডাক্তার। আর কোথাও তো জায়গা হল না।

—আমার সামনে মৃত্যুর কথা বোলো না। আমার তো মানুষকে বাঁচানই কাজ। আমি যে ডাক্তার।

আইভি মুক্তেশের কথায় সব ভুলে যেত। সমস্ত কষ্ট উধাও হয়ে যেত। মুক্তেশের দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করত—এ লোকটির কাছে তার জন্য কতটা জায়গা? বুঝতে পারত না। তবু মনে হত সে তো অনেক পেয়েছে। আর কত পাবে?

ভরতপুরের উঁচুনিচু জমি, অগুন্তি পলাশগাছ, বাঁধ, সাঁওতাল পল্লী আর এই হসপিটাল, মুক্তেশের স্মৃতি সব ছেড়ে তবে চলে যাবে আইভি? এতদিন পর তবে কলকাতাতেই ফিরবে? আইভি ভাবল মানুষ তো অবসর নেয়। তার অবসর একটু না হয় তাড়াতাড়িই এসেছে। সে তো সবই ছেড়ে দিয়েছে একে একে। গ্রামের ওয়েলফেয়ারের দায়িত্ব ছেড়েছে। মুকুল আসার পর খবর নেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ ভরতপুরের পতন সে সহ্য করতে পারবে না। মুকুলকে তো সে কিছুই বলবে না। কাজেই খবর নিয়ে মন খারাপ করে তার কীইবা লাভ আছে? হসপিটালের সাধারণ কাজে সে যুক্ত। সমিতির জেনারেল সেক্রেটারির পোস্টও মুকুলকে ছেড়ে দিয়েছে সে। সকলের অনুরোধে প্রেসিডেন্ট হয়ে আছে। তাও এবার ছেড়ে দেবে। যেতে তো হবে। আস্তে আস্তে মায়াও তো তাকে কাটাতে হবে।

হসপিটালে ঢুকতেই লছমি ধরল—এই শরীরে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ম্যাডাম? ডাক্তার বোসকে বলেছ বুধনের কথা।

—তোর মাথা থেকে এখনও ও ভূত নামেমি।

—না, ম্যাডাম, আমি যে বুধনকে বলেছি ওর হয়ে যাবে।

—কেন বললি, আমি কি তোকে বলেছিলাম?

—ম্যাডাম, তুমিও তাহলে ওকে কাজ দিতে চাও না। মেল ওয়ার্ডে তো লোক দরকার। আগে তিনজন ছিল। এখন একজন মাত্র আছে।

আইভি লছমিকে এড়াতে চাইল। লছমিও ম্যাডামের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে। আইভি খুব বিব্রত বোধ করছিল। লছমি খুব অল্প বয়স থেকে হসপিটালে কাজ করছে। তার ব্যক্তিগত কাজও বহু করেছে। কখনও কিছু চায়নি সে। লছমির জন্য এটুকু করতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু এটুকু করার অর্থ মুকুলের কাছে হাত পাতা। বিশেষত হসপিটাল ও সমিতির সর্বত্র লোকনিয়োগের ব্যাপারটা এখন ওই দ্যাখে। খুব খারাপ লাগছিল আইভির। মুকুল আর একজনও লোক বাড়াতে চায় না। এইটুকু অধিকার তার থাকবে না! তবে সে এখানে কেন থাকবে? আইভির মনে হল লছমির ব্যাপারটা যদি সে কিছু না করে তাহলে ওদের সকলের চোখেই সে খুব ছোট হয়ে যাবে। অথচ দিনের পর দিন কত পরিশ্রমে সে এই জায়গা তৈরি করেছে। মুক্তেশ যদি ভিত গড়ে থাকে তো সে অন্তত দেয়ালগুলো তুলেছে।

আইভি ভাবতে লাগল মুকুলকে কীভাবেই বা বলা যায়? সরাসরি বললে নাকচ করে দেবে মুকুল—সেটাতে বড় অসম্মান হবে। অন্য কাউকে দিয়ে বলান যায়। কিংবা সামনের মিটিং-এ লছমির নাম না করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সাধারণ আলোচনা করা যায়। তারপর কাউকে দিয়ে প্রস্তাব করান যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে গৌতমী ছাড়া আইভি কারুর ওপরই ভরসা করতে পারে না। আইভি ভাবল কলকাতা যাবার আগে বুধনকে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেই হবে।

নিজের ঘরে এল আইভি। লছমি রাতের খাবার রেখে গেছে। আজ স্পেশাল মেনু। ছানার ডালনা। রোগীদের জন্যও তাই হয়েছে নাকি? সাধারণত ক্যান্টিনের খাবারই তারা খায়। সকলের জন্য একই। এরকম মেনু বড় একটা হয় না। আইভি এই খাবার খেতে ভালবাসে। হঠাৎ মনে হল অনিতার জন্যই এটা স্পেশাল নির্দেশ দিয়ে বানিয়েছে মুকুল।

আইভি জানে একটু পরেই মুকুল আসবে। আজ তার একটুও ভাল লাগছে না কারুর সঙ্গে কথা বলতে। অঞ্জনকে দেখেই কি সে এত অন্যমনস্ক

হয়ে গেল? অতীতটাকে নিয়ে একটু বেশি নাড়াচাড়া করে ফেলল। অঞ্জনকে দেখার পর থেকে শুধু অঞ্জনকে নিয়ে নয়, মুক্তেশকেও বড় মনে পড়ছে। অঞ্জনের স্মৃতি একসময় তার বুকের ভিতর এমনই কামড় দিয়েছিল যে সেখান থেকে বের হয়ে আসার কোনও উপায়ই ছিল না—যদি না মুক্তেশ থাকত। অন্য লোকেরা তাকে যা ভাবত তবে কি সত্যিই তাই ছিল আইভি? মুকুল রাহুলরাও যা ভাবত। মুক্তেশের রক্ষিতা।

একবার বিদেশ থেকে মুকুল এসেছে। তখনও কোনও ওর বাচ্চাই হয়নি। মুকুলের যেমন স্বভাব আইভির পিছনে টিকটিক করে লেগে থাকা, তেমনই করছিল ও। আইভির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। মুক্তেশের সঙ্গে আলাদা কথা বলার সময়ই পেত না। খুব খারাপ কাটত তখন আইভির। কেবলই দিন গুনত মুকুল কখন যাবে।

মুকুল বলেছিল, আপনাকে কী বলে ডাকব বুঝতে পারি না। আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক হওয়া উচিত বলুন তো।

—কী আবার সম্পর্ক? আমি ভরতপুরে কাজ করি ব্যস।

—শুধু এটুকু হলে নাম ধরে ডাকতাম। কিন্তু আমাদের আর কি কোনওরকম সম্পর্ক নেই, ভেবে দেখুন তো।

আইভি সব বুঝতে পারছিল। বড় বিপর্যস্ত লাগে এসব সামনাসামনি শুনলে। ভাবত সত্যি যদি কোনও সম্পর্ক থাকত মুক্তেশের সঙ্গে, তাহলে কি ভরতপুরে মুকুলের আসাটা বন্ধ করতে পারত। আইভি দাঁত চিপে জবাব দিত—না আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।

—সত্যি বলছেন? তবে আপনাকে কী বলে ডাকব?

—ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবে।

মুক্তেশকে এরপর পুরো ঘটনাটাই জানিয়েছিল আইভি। তার একটুও লজ্জা করেনি। রাগে সে জ্বলছিল। ডাক্তার মুকুলের হয়েই অনুতাপ প্রকাশ করেছিল। তারপর থেকে মুক্তেশও কোনওদিন আর তার নাম ধরে ডাকেনি। অন্যদের মতো ম্যাডাম বলত। মুকুলকেও তাই বলতে বলেছিল মুক্তেশ। আইভির সামনে ডেকে বলেছিল একে ম্যাডাম বলে ডাকবে। ম্যাডাম মানে জান তো মিস্টার অ্যামেরিকান; না বলে দিতে হবে? মুক্তেশ হো হো করে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল। তারপর আইভির দিকে চেয়ে বলেছিল, ছোঁড়ার বিয়ে দিতে হবে।

মুকুল এমন ভাবেই কথাগুলো শুনছিল যেন মনে হচ্ছিল তার গায়ে কিছুই লাগেনি। শেষ কথাটার শুধু উত্তর দিয়েছিল: আমেরিকান ছেলেদের বাপেরা ওই চিন্তা করে না।

মুক্তেশও **মজা পাচ্ছিল।** বাঃ বাঃ দারুণ। আমি তো বেঁচে গেলাম। কী বল ম্যাডাম?

মুকুল আরও বলেছিল আমেরিকান ছেলেদের বাপেরাও বউ মরে গেলে ফের বিয়ে করতে এত ভয় পায় না।

আইভি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মুক্তেশ হাসতে গিয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়েছিল। ওরা কেউ কিছু বলার আগেই আইভি ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছিল। মুকুল কী বলতে চায়, কীই বা করতে চায়? আইভি প্রাণপণে নিজের সুস্থতাকে বজায় রাখে। শান্ত হতে চায়। মুক্তেশকে সে বুঝতে পারে। কিন্তু মুকুল, তার থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে এত দুর্বোধ্য হয়ে যায়। মুকুল আসলে কী চায়? সে কি সত্যিই চায় মুক্তেশ তাকে বিয়ে করুক।

থরথর করে কাঁপতে থাকে আইভি। মুকুলের কাছে কি এতই স্পষ্ট হয়ে গেছে তার চাহিদা? কিন্তু কোন ঘটনায় তা হল? মুকুল কেন, প্রায় কোনও লোকের সামনেই মুক্তেশের সঙ্গে দরকারি কথা ছাড়া সে বলে না। রাত্রে আধঘণ্টা খানেক তারা বসে। তাও মাঠের মাঝখানে চেয়ার পেতে, সকলের থেকে সামান্য তফাতে। তবুও তো চারিদিকে লোক ঘোরে। আর শীতকালে কেবল মুক্তেশের ঘরে না হয় তার ঘরে। দরজা তো থাকে খোলা।

কিন্তু মুক্তেশও কি তাকে চায়? কখনও কদাচিৎ আইভি যার আভাস পায়। কিন্তু সে সবও কি দৈববলে মুকুল জেনে ফেলেছে? অসহায় বোধ হয়, আবার ভেতরে ভেতরে একধরনের উল্লাসও হতে থাকে। মুক্তেশ কি এ ঘটনায় সচেতন হবে? এই ধাক্কা কি তাকে নিজেকে চিনতে সাহায্য করবে? না, আইভি অতটা চায় না মুক্তেশ তাকে বিয়ে করুক। কিন্তু বিয়ে ছাড়াও তো অন্য কিছু চায়। মুক্তেশ ছাড়া তার যে আর কেউ নেই এ সত্য গভীর ভাবে কবে বুঝবে সে—আইভি ভাবত।

মুকুল চলে যাবার পর মুক্তেশের যে কোনও বদল হয়নি এমন নয়। হয়েছিল, তবে অনুরকম। আইভির কাছে সে আরও একটু বেশি সময় দিত। কিন্তু কথা প্রায় বলতই না। আইভি সে সময় বড় বাচাল হয়ে উঠেছিল। অনর্গল বকত মুক্তেশকে কথা কওয়ানোর জন্য। বেশিরভাগ সময়ই সে অসমর্থ হত। তারপর ঘরে এসে লজ্জা পেত খুব। ভয়ও পেত। হয়তো নিজের মনের ভেতর লুকোন যা কিছু ছিল সব প্রকাশ পেয়ে গেল। মুক্তেশ নিরেট পাথরের দেয়াল হয়ে গেছে। মুকুলের ওপর সেই সময় খুব রাগ হত তার। মুকুল উল্টোপাল্টা কথা বলে মুক্তেশকে সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে। বড় চালাক ও। বড় কায়দা জানে। দেশ-বিদেশ ঘুরে এসবই শিখেছে। মুক্তেশ এই ঘটনার পর অনেক দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিল। একটানা দু মাস।

ভালই হয়েছিল। নিজেকে যেন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিল আইভি। মুক্তেশকে ছাড়িয়ে যাবার পরীক্ষা। ভরতপুরে মুক্তেশের প্রতিস্পর্ধী করে নিজেকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল তার। এছাড়া কীই বা থাকতে পারে মুক্তেশকে যন্ত্রণা দেবার উপায়। সে কি জানে না যে ভরতপুরের লোকেদের প্রশস্তি মুক্তেশকে কতটা গর্বিত করে। এতদিন ধরে মুক্তেশের পাশে থাকতে থাকতে ওর পরিচয় যে ভালই পেয়েছে সে। অন্তত আইভি জানে কীসে ও সুখ পায়, কীসেই বা দুঃখ পায়। কোথায় কোনখানে ফুঁ দিলে ওর গোপন বেলুন ফুলে ওঠে। ভরতপুরের সবাই, এমনকি সমিতির সব কর্মচারীরা তাকে দেবতা বানাতে চাইলে কী হবে, মুক্তেশ তার কাছে যে ভয়ানক ভাবে মানুষ—একান্তই মানুষ।

দু মাস পর মুক্তেশ ফিরে এলে আইভি একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করেনি এতদিন দেরি হল কেন? নিজেকে বড়ই নির্লিপ্ত দেখাচ্ছিল আইভি। এমনকি নিজস্ব রুটিনেও কোন ফারাক রাখেনি। খাবার পর মুক্তেশের সামনে বসেছিল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, এই আপনার ভরতপুর প্রীতি? এরাই নাকি আপনার ঈশ্বর? আইভি প্রশ্ন করেনি। কেননা জানত মুক্তেশের বাঁধা উত্তর আছে।

মুক্তেশ বলেছিল, রাহুল আসতে দিল না।

রাহুলের সম্পর্কেও উৎসাহ দেখায়নি আইভি। মুকুল যেমন দেশে ফিরলেই ভরতপুরে আসে, রাহুল তাও আসে না। দিল্লিতে থাকে। মুক্তেশের সঙ্গে কোনও সন্তানের প্রীতিই তেমন আহামরি নয়। কতদিন ও দিল্লিতে ছিল? সত্যিই কি ছিল? আইভির কষ্ট হত যখন ভাবত মুক্তেশ তার কাছে সব কিছু লুকোচ্ছে। মুক্তেশের প্রতি কোনও অনুযোগ রাখতে না চাইলেও কখন যে তা ঝাঁপিয়ে পড়ে! আইভিকে খানখান করে ভেঙে দেয়।

শুধু তার প্রতিও নয়। ভরতপুরের প্রতি অগ্রাহ্যের মনোভাব দেখালেও বড় কষ্ট হয়। সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে গিয়ে, ওদের সঙ্গে মিশে, ওদের প্রতিদিনের সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে আইভি একেবারে এতদিনে ওদের একজন হয়ে উঠেছে। ওদের তরফ থেকে মুক্তেশকে তার জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে, কেন মুক্তেশ ওদের জন্য আরও সময় দিচ্ছে না? আইভি ওদের জন্য যতই করুক, মুক্তেশের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, আইভির পক্ষে তো তা নয়। আইভি অবশ্য এসব অভিযোগ করত না। সে কেবল কাজের কথা বলত। অজস্র পরিকল্পনা করেছিল আইভি। তার ভালমন্দ, সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলত। মুক্তেশ কেবল তখন ফান্ড সংগ্রহেই ব্যস্ত। ভরতপুরের অন্যান্য কাজকর্ম যেন অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। সে সব কিছু যেন আইভিরই একমাত্র দেখার দায়িত্ব।

একবার ভরতপুরের চারদিক দেখেশুনে বড় আনন্দ পেয়েছিল মুক্তেশ। সাঁওতালরা আইভির নাম করেছিল খুব। ওদের বাড়ির বাচ্চাদের অধিকাংশকে স্কুলে ঢোকাতে পেরেছিল আইভি। মুক্তেশ কেবল ইস্কুলই বানিয়েছিল। দু-একজন ব্যতিরেকে সেই ইস্কুলে পড়ার জন্য কাউকেই রাজি করাতে পারেনি। আইভিকে অবশ্য তার জন্য খাবার ঘুষ দিতে হয়েছে। মুক্তেশকে কখনওই জানতে দেয়নি তার মাইনের একটা অংশ খরচ করে সে ইস্কুলে খাবারের ঘাটতি মিটিয়েছিল। খাবার আর কী? নুনসহ মাড়ভাত, সামান্য তরকারি—শনি মেথেনকে দিয়ে রাঁধিয়ে সে খাওয়াত। শুধু ভরতপুর নয়, দূর দূর থেকে প্রায় মাইলখানেক হেঁটে বাচ্চারা পড়তে আসত। অনেক দিনই খাওয়ার সময় গিয়ে আইভি দাঁড়াত। কারণ বড়রাও ঘিরে থাকত বাচ্চাদের। তার সবসময় ভয় হত বাচ্চাদের খাবার যদি বড়গুলো খেয়ে ফেলে। আর বাচ্চাদের দিয়েও তো কুলোন যেত না। সারাদিনের খাবার তারা ইস্কুল থেকে উসুল করতে চাইত। আইভির এসব দেখে চোখে জল আসত। ভাবত মুক্তেশকে একবার এই দৃশ্য দেখান দরকার। কিন্তু বলত না। মুক্তেশ যতদিন না নিজের থেকে তার ইস্কুল দেখতে গেছে একবারও বলেনি সে। ইস্কুল নিয়ে বিশেষ তথ্যও দেয়নি।

জমি নেই, জমিতে ফসল নেই। এদিকে সেচের কোনও সুবিধা পাওয়া যায় না। কাছাকাছি নদী নেই। সরকারের কোনও দৃষ্টি নেই, এমনকি পূর্বতন কোনও জমিদার বা ধনী ব্যক্তি পুণ্যার্থেও এদের জন্য কোনও পুকুর খুঁড়ে দেননি। আসলে এরকম অনুর্বর জায়গায়, পাথুরে জমিতে কোনও বড়মানুষ থাকতে যাবে? ভাগ্যে তাও মাটির তলায় কয়লা পাওয়া গেছে। কোলিয়ারি হয়েছে। গুটিকয়েক লোক কয়লা কাটার সুযোগ পেয়েছে। তারা অবশ্য আর

গাঁয়ে ফেরে না। সপরিবারে ওখানে থাকে। কখনও অসুখবিসুখ করলে হসপিটালে আসে। কেননা কোলিয়ারির হাসপাতালে বাবুদের জন্য যত সুবিধা, ওদের জন্য তত নয়।

বাচ্চাদের খেতে দেওয়া আর বড়দের না দেওয়ার মধ্যে যে লড়াই তাদের চালাতে হত তাতে আইভি বুঝেছিল এখানে সেমিনার টেমিনার করে কোনও লাভ হবে না। চারটে পুকুর খুঁড়েছিল। বর্ষায় যে সামান্য বৃষ্টি পড়ে তাকেও তো ধরে রাখতে হবে। বাঁধের সংস্কার করেছিল। গাছ লাগিয়েছিল। ঘাস পর্যন্ত আইভিদের লাগাতে হয়েছিল। তারপর তো ডেয়ারি। মানুষ যেখানে খেতে পায় না সেখানে গরু কী খাবে?

আর সব কাজ শেষে মুক্তেশ এসব যখন দেখেছিল, বুঝেছিল হতবাক হয়ে গিয়েছিল। পুরস্কার দিতে চেয়েছিল। সেইদিনের কথা আইভি কখনও ভোলেনি।

আইভির প্রতি দয়া করে ভরতপুরে সেবার বর্ষা বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। বৃষ্টি পড়ছিল প্রায়ই। ওদের লাগান গাছগুলোর সবুজ কচি পাতা আনন্দে লাফাচ্ছিল। প্রত্যেকের বাড়িতেই নানারকম গাছ লাগান হয়েছিল। মাঠেঘাটেও অনেক। সে এক যজ্ঞ চলছিল তখন। পুকুরের ধারে ধারে মাঠময় ঘাসের দিকেই আইভির লক্ষ্য। কতটা বাড়ল ওরা। প্রতিটি ঘাসের কণার দিকে তার নজর। শুকিয়ে যাবে না তো। সমিতির জমিতে চাষও শুরু হয়েছে। ওরা দলবেঁধে ধান রুইবে। জলের মাছের মতো খলবল করছে লোকগুলো। বৃষ্টির মধ্যে ওদের সঙ্গে হসপিটালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল আইভি। বৃষ্টির দানা যত জোর হয় ওদের কলস্বর তত বাড়ে। নারীপুরুষ মুখে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে সেই বারিপাত। প্রকৃতির অঢেল দয়ায় ওরা শিহরিত হচ্ছে। ওরা ধানের কথা বলছে, স্বপ্নের কথা চিৎকার করে বলছে। ওদের মুখচোখ আইভি লক্ষ্য করে। উত্তেজনা আর আনন্দ শীর্ষস্থানে গেলে ওরা বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে মাঠে যায়। কত দিনের অনাস্বাদিত বৃষ্টি, কত দিনের আকাঙ্ক্ষিত জল। আইভি ওদেরকে দেখে হাঁ হয়ে যায়। কলকাতায় বর্ষায় কত কষ্ট। লোকের কী বিরক্তি। ওখানে বর্ষা শহরকে আরও মলিন করে। বিপরীতে ভরতপুরে উত্তেজনার তুঙ্গ স্পর্শ করে। কারণ এই বর্ষা তাদের পেটে দানা জোগাবে। আইভিরও তখন ভরতপুরের মানুষ হতে ইচ্ছে করে। তারও মনে হয় ছুটে কাদার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। ধীর লয়ের সাঁওতালি গানের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে জ্যামিতিক ডিজাইন ফুটিয়ে তোলে।

আইভি ওদের মতো পারে না। তবু গামবুট পরে আর ছাতা নিয়ে জমির কিনারায় এসে দাঁড়ায়। ওদের মেয়েরা পুরুষেরা হাসিঠাট্টা করে তাকে নিয়ে। নিজেদের মধ্যেও ওরা খুব হাসে। হাসতে হাসতে কাজ করে। জল কাদার পিছলে কোনও পুরুষ কোনও মেয়েকে ঠেলে দেয়। সে পড়ে গিয়ে হিহি হাসে। সকলেই হাসতে থাকে জোরে। বর্ষা ওদের ভেতরে বাইরে ঝমঝম করে বাজে।

ছাতা নিয়েও বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে আইভি। এদের দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে ওরা। এত গল্পের মাঝেও কী করে যে করে। যখন আইভির খেয়াল হয় তখন তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সে কোনওমতে হসপিটালে ফিরতে থাকে। শাড়ি পায়ে লটকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না। সমস্ত ভিজে শাড়ি শরীরে জড়িয়ে সে কোনওমতে কোয়ার্টারে ফেরে। আর সামনেই মুক্তেশকে দেখে। মুক্তেশের মুখও বেশ খুশি খুশি। মুক্তেশ তাকে দেখে হাসতে চায়। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে কাপড় বদলায়। তারপর বের হয়ে এসে বারান্দায় যখন সে চুল মুছতে থাকে তখন মুক্তেশ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে—কবে থেকে সাঁওতাল হয়ে গেলে বলত?

মুক্তেশের এধরনের কথায় আগে হলেও তার ভেতরে একধরনের বৃষ্টি পড়ত। আজ নিজেকে উন্মুক্ত করতে গিয়েও করল না। চোখ ভরে আছে সাঁওতালদের মিলনদৃশ্যে। মাটির মতো, প্রকৃতির মতো সরল ওদের ভালবাসা। এত জটিলতা শহরের মানুষদের থাকে কেন? সভ্য মানুষের প্রেমও এত বানিয়ে তোলা কেন? এত অপরিচ্ছন্ন কেন? যা স্বাভাবিক, সভ্যতার নাম দিয়ে তাকে এত ঢেকেঢুকে রাখা কেন?

আইভি নিজের কাজ করছে। মুক্তেশ যেন তার পিছন পিছন ঘুরছে। মুক্তেশ বলছে, আমার অপরাধ কী বলত, আমি কেন তোমার মতো হতে পারলাম না? আইভি মুক্তেশের দিকে তাকাচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যবহার করছে আজ। আবার কি মুক্তেশ বেশ কিছুদিনের জন্য ভরতপুর ছেড়ে চলে যাবে, তার জন্যই কি এই কথার আয়োজন?

শনি মেঝেন বিকেলের রান্নার জন্য উনুন ধরিয়েছে। খুব ধোঁয়া হচ্ছে। বর্ষা বলে না কি ধোঁয়া বাইরেও বেশি বের হচ্ছে না। চোখ জ্বালা করছে তার। বাইরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে আইভির প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতর এসে বসেছে মুক্তেশ। কতদিন সে পাশে থেকেও আইভির ঘরে আসে না। আজকাল মুক্তেশের ঘরেই তাকে যেতে হয়। আইভি কতবার ভেবেছে ডাক্তারদের কোয়ার্টারের ওদিকে চলে যাবে। আবার ভেবেছে তাতে মুক্তেশের কীইবা এসে যায়। শুধু লোকের কৌতূহল বাড়ে।

মুক্তেশ ফের প্রশ্নটা করল। আইভি উত্যক্ত বোধ করল, বলল সাঁওতাল হতে চাইলে তো হবেন। ভরতপুরে থাকেনই বা কদিন? আপনি খাতায়কলমে ছাড়া এখানকার কোনও সুবিধা অসুবিধার কথা জানেন? অবশ্য আপনি আমাদের বস্, আপনাকে এ কথা বলা আমার শোভা পায় না।

মুক্তেশ আইভির কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে তাকিয়েছিল তার দিকে। কেননা আইভির মুখে সরাসরি, বিশেষত তার ডেডিকেশন নিয়ে এমন অভিযোগ সে আগে শোনেনি। সেই একবার অভিযোগ করে আইভি বাতাসপুর চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে আসা অবধি কোনওদিন এতটুকু অসুবিধার কথাও সে জানায়নি। এখনও সে সেকথা বলছে না, তবে যে ইঙ্গিত তুলছে তা ভয়ঙ্কর।

আইভিরও কথাগুলো বলে ফেলে খারাপ লাগছিল। কিন্তু কথাগুলো এত সত্য যে মুক্তেশকে না জানালেই নয়। এমনকি হসপিটালের অবস্থাও দেখাশোনা না করলে খারাপ হতে বাধ্য। মুক্তেশ যে ছাড় দিয়েছে তা হয়তো শেষপর্যন্ত ভালতে রূপান্তরিত হবে না। মুক্তেশের এত কম থাকা নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেও কথা উঠছে। মুক্তেশের নামে বাজে কথা শুনতে যে বড় কষ্ট হয় আইভির। তাছাড়া এমনটা করবেই বা কেন?

মুক্তেশ বলছে, আমি মেনে নিচ্ছি তোমার অভিযোগ। কিন্তু তুমিও কি বুঝবে না টাকাটার কত প্রয়োজন? আমাকে আর কিছুদিন সময় দাও, তখন হয়তো এখানে থাকব, এমন ছড়ি ঘোরাব তখন তোমরা কেউই পছন্দ করবে না। আমাকে যে এখন দিল্লিতে গিয়ে পড়ে থাকতে হবে। বাইরের দেশ থেকে গরিবদেশে কত টাকা আসে জান? সেসব না উদ্ধার করতে পারলে ভরতপুর বাড়বে কী করে?

আইভি মনে মনে বলত, আর বাড়ার দরকার নেই। কেবল মুক্তেশ ভরতপুরে থাকুক। ভরতপুরে কাজ করুক। চারপাঁচটা গ্রামের বাইরে সাহায্য যাবার প্রয়োজনটা কী?

মুক্তেশ বলত, প্রয়োজন আছে। বলত, আমি যদি পারি তো চারপাশের গ্রাম কেন, আরও দূর দূর পর্যন্ত আমার কাজ ছড়িয়ে দেব। এ আমার কর্তব্য, দায়িত্ব।

মুক্তেশ যুক্তি দিয়ে আইভিকে সেদিন বুঝিয়েছিল সবকথা ঠিকই। কিন্তু তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মোমবাতির আলোয় মুক্তেশের বিষণ্ণতা টের পাচ্ছিল আইভি। সেও বেচারা কী করবে? মুক্তেশ ছাড়া নিজের সামান্য কথাও উপড়ে করে দেবার কেউ নেই। অন্যান্য কর্মীরাও তাকে মালকিন ভাবে।

মুক্তেশ বলেছিল, আমার জন্য তো ভরতপুরের অভাব বোধ করার কথা নয়। তুমি তো আছ।

—আপনি না থাকলে আমাকে দিয়ে সবকাজ হয় না। বিশেষত ডাক্তাররা আমাকে মানবে কেন?

—মানতে তো দেখেছি। মুক্তেশের দৃষ্টির সামনে থেকে চোখ সরিয়ে নেয় আইভি।

—আমাকে এভাবে মিছিমিছি সান্ত্বনা দেবেন না। আমার এরকম কথা শুনতে একেবারে ভাল লাগে না।

—আজ তোমাকে সব সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। মুক্তেশ যেন ভেতর থেকে কথা বলছে।

আইভির ভেতরটা উত্তেজনায় ফেটে যাচ্ছে। কী বলবে মুক্তেশ? কী কথা বলার জন্য এত ভণিতা? কিন্তু এতদিন সে বলেনি কেন? এতদিন তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মানেটা কী? তীব্র অভিমানে তার গলায় যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। সে মুক্তেশকে বলে, কোন্ সত্যিকথা বলবেন আপনি, আমি শুনব না। মুক্তেশ কী বলবে, তারই এখন সহস্র কথার টানে মুক্তেশকে ধরাশায়ী করে দিতে ইচ্ছে করে। অজস্র কথা অজস্র দিন ধরে তার জমেছে। একদিনও মুক্তেশ শুনতে চায়নি। আজ সে সত্যিকথা বলতে চায়?

মুক্তেশ বলতে চায় এতদিন আইভি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে ওঠেনি। আজ সে বুঝেছে যে কত পরিণতি এসেছে তার মধ্যে।

—কী কথা বলবেন আমাকে?

—আমার পরিবারের কথা।

আইভি দমে যায়। ভেতরের প্রবল রক্তচাপ তাকে ঠেলা মারছে। সে সবকিছু দমিয়ে রাখে।

—আপনার পরিবারের কথা আমি শুনব কেন? আপনার স্ত্রী, আপনার জীবনের কথা শুনে আমার কী হবে বলতে পারেন? আমি তো শুধু ভরতপুর নিয়েই আছি। এটা নিয়েই থাকতে হবে। আপনার নিজের কথা আমার জন্য

কিছু থাকলে তা বলুন। আইভি বলতে বলতে কাঁপছিল।

এরমধ্যে শনি মেঝেন এসে দুকাপ চা রেখে গিয়েছিল।

আইভি এরপর নিজেকে শান্ত করতে করতে বলেছিল, ভরতপুর সম্পর্কে আপনার কিছু কথা থাকলে বলুন।

—সেটাই তো বলতে চাইছি, তুমি এত রেগে আছ।

আইভি চুপ করে গিয়েছিল। আলোর বৃত্ত থেকে নিজের চেয়ার অন্ধকারে একেকোণে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু তার শাড়িতে আলো পড়েছিল। তার ভিজে ভিজে সরু দুটো পায়ের পাতা আলোয় ভাসছিল। বাকি অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে নিয়েছিল।

মুক্তেশ নিজের কথা বলতে শুরু করেছিল। কীভাবে সে এ পথে এল। কেন এল। তার বাবার কথা। ছেলেবেলাকার কষ্টের কথা। বাবার রক্ষিতার কথা। আইভির মন ছিল না। তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরছিল যা মুক্তেশ দেখতে পাচ্ছিল না। আসলে আইভি বড় আশা করে ফেলেছিল, দুহাত পেতে ভিখারির মতো চেয়েছিল। মালিক তাকে ভিক্ষেও দিল না, তার পাওয়াও কিছু হল না, মানও গেল। ভিক্ষের বাটি দেখে ফেলল মুক্তেশ। আইভির মনে হচ্ছে তার অধিক ভিখারি বোধহয় কেউ নেই। তারপর কখন সে মুক্তেশের কথার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

সেদিন কী মনে করে সব কথার শেষে ভরতপুরে তার কাজের পুরস্কার হিসাবে নিজের হাতের আংটি দিতে চেয়েছিল মুক্তেশ। আইভি নেয়নি, কিছুতেই নেয়নি। না, না, ও আমি কিছুতেই নিতে পারব না। ছিটকে চলে গিয়েছিল। কেন নেবে আইভি? এটা যে শুধু ধাতু, আর যে এর কোনও মূল্য নেই, তা যে আইভির কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মুক্তেশ হয়তো এই না নেওয়াতে আহত হয়েছিল। বলেছিল তোমাকে আর কী দেব?

আইভি এসব মূল্যহীন কথা শুনতে চায়নি। সে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

সেদিন রাত ছিল নিদ্রাহীন। মুক্তেশ যখন যা দিয়েছে, সবটুকু নিঃশেষে নিয়েছে সে। আজ সে ফেরাতে গেল কেন? আইভি ভাবল তার এত প্রেমের প্রয়োজন হয় কেন? অঞ্জন যখন চলে গিয়েছিল তখন তো ভেবেছিল তার কূপ শুকিয়ে গেছে। ভরতপুরে এসেই তা আবার কানায় কানায় ভরে গেল কেন? তবে কি তার চাহিদা খুব বেশি? খুব? এ স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক? সারা রাত ধরে ভেবেও এ দ্বন্দ্ব মেটেনি। সে বারবার মুক্তেশের ঘরের সামনে গেছে। যদি মুক্তেশের সঙ্গে দেখা হয় সে চেয়ে নেবে। সারাজীবনের জন্য তার কিছু পাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু যতবার ওঠে, জানলা দিয়ে দ্যাখে মুক্তেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অন্যদিন এতক্ষণ ঘুমোয় না সে। সবকথা বলে সে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ও সব দিতে পারে, কিছু নিতে পারে না। বাকি রাতটুকু সে মুক্তেশের দরজায় বসে কাটিয়ে দেয়।

পরের দিন থেকে মুক্তেশ আবার অন্যরকম। গতরাতের আবেগের বিন্দুবিসর্গ নেই। আইভিও অন্যরকম।

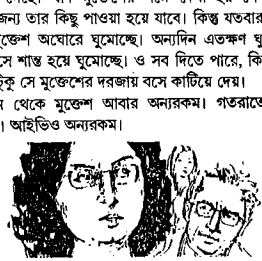

আইভি বুধনের চাকরির জন্য গৌতমীর কোয়ার্টারে গিয়েছিল। গৌতমী আইভিকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। আইভি সাততাড়াতাড়ি বলেছিল! আমাকে বসতে বলবে না।

খাটের ওপর একগাদা খবরের কাগজ সরিয়ে গৌতমী তাকে বসতে দিয়েছিল। আইভি লক্ষ্য করছিল সমস্ত কাগজগুলো থেকেই চাকরি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো কাটা। তাহলে কি চাকরি খুঁজছে গৌতমী? তার মতো সেও এখান থেকে চলে যেতে চায়।

অপ্রস্তুত গৌতমী আইভির সামনে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত কী বলবে বুঝতে না পেরেই বলেছিল, আপনাকে কি ডক্টর বোস পাঠিয়েছেন?

হেসে ফেলেছিল আইভি। গৌতমীর মতো মেয়ের কাছে এতটা নির্বুদ্ধিতা আশা করেনি সে। বলেছিল, তোমার বুঝি এই ধারণা, আমি মুকুলের কথায় চলি?

গৌতমী ওর লম্বা বেণী সামনের দিকে এনেছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গায়ের রঙ বেশ কালো ওর। তবু ওর একধরনের দৃপ্ত ভাব আছে চেহারায়। লম্বাও খুব। আইভি বুঝতে পারছিল ওর অনেকদিনের জমা অভিযোগ আছে। যদি ও প্রকাশ করতে পারে তো ভাল হয়, আইভিও নিজেকে খুলতে পারে।

অথচ গৌতমী কিছুই বলছিল না। ও ড্রইংরুম লাগোয়া কিচেনে আইভির জন্য চা তৈরি করতে যাচ্ছিল। একটা চাপা অভিমান গৌতমীকে যেন ধাক্কা দিচ্ছিল। আইভিও নিজেকে সবসময় প্রকাশ করতে পারে না। কাজেই গৌতমীর এই অবস্থা সে অনুভব করতে পারে। সে গৌতমীর কাঁধে হাত রাখে। তুমি কি অন্য জায়গায় যেতে চাইছ?

চা ঢালতে কিছুক্ষণ সময় নেয় সে। তারপর বলে, এখানে সম্মান নিয়ে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

—আমাকে একটু বোঝাবে, মুকুল তোমার সঙ্গে কখনও কী খারাপ ব্যবহার করেছে।

—আপনাকে তো বিশেষ বোঝাবার কথা নয়। আপনাদের অন্য সম্পর্ক আছে, আর আমি তো নিছক এমপ্লয়ী। আপনার তাই বুঝতে অসুবিধাই হবে। থাক না। দরকার কী এসব আলোচনার!

আইভির খারাপ লাগছিল। এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। এখানে সমানাধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয় বৈকি। কিন্তু আইভি চিরকাল অন্য স্টেটাস উপভোগ করে এসেছে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যভাবে কথা বলার চেষ্টা কেউ যে করেনি—তা নয়। তবু এভাবে নয়। হয়তো গৌতমীকে সে গুরুত্ব দিয়েছে, অভিমান বা অধিকার বোধ তাই আইভির প্রতি একটু বেশি! আইভি গৌতমীর কথা শুনতে চাইছিল। ওর ক্ষোভ সব না মিটলে কথা শুরু করা যাবে না। আইভি অপেক্ষা করছিল। গৌতমী প্রায় কিছুই বলছিল না। ওর চোখদুটো টলটল করছিল, মুখটাও থমথমে লাগছিল।

আইভি বলল তোমার কী ধারণা—মুকুলের সব কাজ আমি অনুমোদন করি? অনিতার ব্যাপারটাতে আমার প্রতিবাদ তো আমি জানিয়েছি। তুমি শোননি কিছু?

—দেখুন ম্যাডাম, আফটার অল ডক্টর বোস আমাকে অনেক সময় অনেক অপমান করেছেন। আমি গ্রামে কাজ করি এটা ওনার পছন্দ নয়। আমি যদি আলাদাভাবে কিছু করি তাতে ওনার বাধা দেবার কারণ কী? ভরতপুরের গ্রামগুলোকি কি ওনার পৈতৃক সম্পত্তি? অবশ্য ভরতপুর সমিতির অধীন যখন, তখন নিশ্চয় ওনার একার মতে কিছু হবার নয়। অথচ উনি এমন ভাব করেন যে সবকিছু একান্ত ওনার নিজস্ব।

—আসলে গৌতমী গ্রামে কাজ ব্যক্তিগত ভাবে করা ভাল নয় এমন নয়। তবে আমাদের একটা নীতি আছে, আমরা সমিতির হয়ে কাজ করি। নইলে এমন কিছু সমস্যা তৈরি হয় যা সবসময় একা সমাধান করাও যায় না। অনেকসময় সমিতির ক্ষতিও হয়। নইলে এ কাজ খারাপ কী? মুকুল তোমাকে বোঝাতে পারেনি। নিশ্চয় ক্রমাগত ওর বিরোধিতাই তোমাকে এভাবে কাজ করতে বাধ্য করেছে। আর আমি জানি গ্রামের ওয়েলফেয়ারের কাজে ওর মন নেই।

—আসলে আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল ভরতপুরকে নিয়ে। আপনি তো জানেন এই কারণে আমি এখানে থেকেও গিয়েছিলাম। সাউথে আমার ভাল অফার ছিল, তাছাড়া—ম্যাডাম আমার বাবাও চাইছিলেন না আমি আর এখানে থাকি।

—কেন চাইছিলেন না?

গৌতমী বেনীর প্রান্ত আঙুলে জড়াতে জড়াতে ইতস্তত করতে করতে বলল, আসলে বাবা চাইছিলেন আমি বিয়ে করি। আমার এক ক্লাসমেট আমার বাবাকে প্রস্তাবও দেয়। আমাকেও চিঠি লেখে। বাবা খুব চাইছিলেন এটা আমি মেনে নিই।

—কিছু মনে কোর না জিজ্ঞাসা করছি বলে, এখন কি তুমি ওই কারণেই চলে যেতে চাও। ভরতপুরের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ নেই? থাকুক আর না থাকুক বিয়ে কর তুমি। একথাটা যদি তুমি আমাকে আগে জানাতে তাহলে আমিও তোমাকে বিয়ে করতেই বলতাম। এটা খুবই পজিটিভ স্টেপ। আমার মনে হয় মুকুলও এক্ষেত্রে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। এই একটা ব্যাপারে আমাদের সবাইকার একমত হবে। আইভি হাসতে লাগল।

হাসছিল না গৌতমী। বলছিল, ডক্টর বোস খুশি হবেন জানি। কারণ আমি চলে যাব। বিয়ে হলে ভরতপুরে থাকব না, এ ওনার পক্ষে সুসংবাদ বৈকি। জানেন তো একজন মহিলার সামনে অন্য মহিলার প্রতি আগ্রহ দেখানটা সবসময়ই অসুবিধাজনক। আপনার মুকুলের সেইখানেই আপত্তি। আমি চলে গেলে আর কমলাদি ছাড়া একজনও লেডি ডক্টর থাকবেন না। বিশেষত গাইনি। আর কমলাদির তো চোখকান নেই।

—গৌতমী, তুমি যা বলছ ভেবে বলছ তো। মুকুলকে আমি খুব বেশি লক্ষ্য করিনি ঠিকই, তবে যদি তা হয় তবে তো ভরতপুরের সমূহ বিপদ। প্রতিষ্ঠান উঠে গেল আর কি!

—অনিতার কেসটা দেখলেন না!

—বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। বিশেষত ও বিবাহিতা। বেশিদিন বিয়েও হয়নি। অনিতার পক্ষ থেকে এ ঘটনা হওয়া সোজা নয়।

—ওর বিবাহিত জীবন সুখের নয়।

—তোমায় কে বলল?

—ডক্টর বোসই বলেছেন।

আইভি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। চারদিকে বড় গুমোট বোধ করল। মুকুলের হসপিটালে আসা দেখতে দেখতে বছর দুয়েক হয়ে গেল। আইভির লক্ষ্য কি এতই কমে গেছে! নাকি মুকুলের এইদিক সম্পর্কে সে সচেতন নয়? অনিতার ঘরে পা টিপে টিপে মুকুলের গোলাপফুল রেখে আসার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আবার মনে হল তার ঘরেও তো সে ফুল রেখেছে। এটা কি মুকুলের স্বাভাবিক ব্যবহার? নাকি অনিতার ব্যাপারটা চাপা দিতেই এ কাজ করল?

গৌতমীর সঙ্গে এই আলোচনা বেশিক্ষণ চালাতে চাইল না আইভি। বিশেষত অঞ্জনের মেয়ে আর মুকুলকে নিয়ে এসব কথা বলা শোভনও নয় তার পক্ষে। আইভি উঠল। এ পরিস্থিতিতে বৃধনের চাকরির কথা তোলাটাও সম্ভব নয়। গৌতমীর কোনওদিকেই মন নেই। আইভি বলল, তোমার জীবন সুখের হোক। বিয়েটা কবে হচ্ছে জানিও।

—আপাতত যাবার কথাই ভাবছি ম্যাডাম। অন্যত্র চাকরির চেষ্টাও করছি। তাকে তো একবার না বলেছিলাম, এখন দেখি কী হয়?

—তিনি যখন নিজেই চেয়েছেন তখন অপেক্ষা করবেন নিশ্চয়।

গৌতমী বিষাদের হাসি হাসল। আইভির মনে পড়ল এই গৌতমী একসময় মুকুলের গায়ে লেগে থাকত, যতদিন না ও এখানে কাজে এসেছে। আইভির কেমন একটা ধারণা হত মুকুল হয়তো ওকে পছন্দ করে। জেনি তখনও ওকে ছেড়ে চলে যায়নি। মুকুল বলত ও দেশে তার একেবারে ভাল লাগছে না।

আইভিকে এগিয়ে দিতে এল গৌতমী। এই মেয়েটির প্রতি নিজের অজান্তেই কেমন মায়া তৈরি হয়েছিল। যা কিছু হোক গৌতমী গেলে তার ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তবে সেও তো চলে যাচ্ছে।

—তুমিও যাবে, আমিও যাব জান।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—কলকাতায় চলে যাব, ভরতপুরে তো অনেকদিন হল। তবে গিয়ে অবশ্য তোমার মতো বিয়ে করতে পারব না। আমার তো সে বয়স নেই। আর লোকও নেই। আইভি খুব হাসতে লাগল। আর সেই মুহূর্তেই দূরে অঞ্জনকে দেখল। তার হাসি থেমে গেল। গৌতমীকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে যেতে চাইল সে।

প্রত্যাশামতোই কিছুক্ষণ পরে এল অঞ্জন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করে। এই অল্পসময়ে নিজের ঘর সাজিয়ে নিয়েছে আইভি। নিজেও সামান্য প্রসাধন করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জাই করছিল। তার থেকে সামান্য ছোট মুকুল। মুকুলের যদি মেয়েদের প্রতি এত আগ্রহ এত আকর্ষণ বেঁচে থাকতে পারে তো তারই বা পুরুষের প্রতি থাকবে না কেন?

অঞ্জন এলে অবশ্য সে গম্ভীরই ছিল। অঞ্জন জানাচ্ছিল সে তার প্রোমোটারবন্ধুকে ফোন করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্ল্যাটের সংবাদ সে পেয়ে যাবে। ওয়ান-রুমেই চলবে কিনা আইভির, নানারকমের সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করছিল তারা। কবে নাগাদ যেতে চায় আইভি তাও জানতে চাইছিল।

আইভি বলেছিল একটা ফ্ল্যাট পেলেই সে চলে যাবে। এখানে তার ভাল লাগছে না।

অঞ্জন অবাক হয়েছিল। সেকী বলছ! তুমি এখানকার সব। সেদিন ডক্টর বোসও আমাকে বলছিলেন তুমি এখানকার জন্য কত কী করেছ।

—তবু মাঝেমাঝে ভাল লাগে না। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কে থাকতে চেয়েছে। তুমি তো আজ দেখছ, আগে ভরতপুরের যা অবস্থা ছিল। সেই থেকে তো আছি। বড় ক্লান্ত লাগে।

অঞ্জন চুপ করে ছিল। আইভি বুঝতে পারছিল অঞ্জন তার ভেতর প্রবেশ করতে চাইছে। বুঝতে চাইছে মানসিক অবস্থা। এক দিন নিজেকেও বড় খুঁড়েছে আইভি। জীবনের কত ছোটখাট ঘটনা তার মনে পড়ে গেছে। আইভি বলল, তোমাকে দেখে আমার বাতাসপুরের কথা মনে পড়ে যায়। ছোটবেলাকার কথা। খুব মনখারাপ হয়ে যায় জান। আইভির গলায় আবেগ আসে।

অঞ্জন চেয়ারে বসেই দুটো হাত প্রসারিত করল। আড়মোড়া ভাঙল। বুকটা ওর সামান্য ফুলে উঠল। আইভির সেই রাতের কথা মনে পড়ল। কলকাতার হোটেল। কালিঘাটে বিয়ের পর দুই রাত দুই দিন পুরো সে এই লোকটির সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে ছিল। সেই প্রথম সেই শেষ তার পুরুষসঙ্গ। আইভি নিঃশ্বাস ফেলল না। বুকের মধ্যে পেটের মধ্যে গলার মধ্যে সে অন্যরকমের অনুভূতি পেল। অঞ্জনের দিকে চাপা দৃষ্টিতে তাকাল সে। না, অঞ্জনেরও তেমন পরিবর্তন হয়নি। সুপুরুষ আছে এখনও সে। মুক্তেশের সঙ্গে থাকতে থাকতেই সে যেন আরও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অঞ্জন বলল, বাতাসপুর এখন অনেক বদলে গেছে।

—বদলাক। স্মৃতিতে আমার সেইরকমই আছে। অবশ্য আমার স্মৃতিতো! আইভি হাসার চেষ্টা করল। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। তবু অন্তর্গত বেদনা তাকে ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছিল।

অঞ্জন বলল, সেদিন বাতাসপুরে সকলের সহানুভূতি তোমার দিকে ছিল। আমার কষ্ট কেউ বোঝেনি। অবশ্য যে লোক ফের বিয়ে করে তার আবার কষ্ট কী? আজ যেমন চাকরি করি সেদিন যদি তাই করতাম।

—তাহলে কি অন্যরকম কিছু হোত? ইরা কি আসত না? শেষের প্রশ্নটা তুলতেই বড় কষ্ট হচ্ছিল।

—এসব আলোচনায় কী হবে বল? তবু তোমার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতেই হবে।

—থাক অঞ্জন, জবাবদিহিতে আমার প্রয়োজন নেই। তোমাকে এসব জিজ্ঞেস করতে যাওয়াই ভুল। আইভি পাশে বসা অঞ্জনের হাতের পিঠে হাত ছুঁইয়েছিল। আর সেইমুহূর্তে অঘটন ঘটে যায়। অঞ্জন দৃঢ়ভাবে তার হাত ধরে তাকে নিজের দিকে নিয়ে আসে। আইভি মুখ ঘোরাতেই বহু পুরনো একটা মুখ তার ওপর চেপে বসে। বাধা দেওয়া যায় না। অঞ্জনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে ভেতরের রক্তের দাপট টের পায় আইভি। নদী তবে এখনও উতল আছে? পরস্পরের ঘন নিঃশ্বাস শুনতে শুনতে তারা দুজনে স্থির বসে থাকে। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলে না। ব্যাপারটা মানিয়ে নিতে যেন দুজনকারই সময় লাগে। আইভির ইচ্ছে হচ্ছিল অঞ্জনের পাশ থেকে সরে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসে। কিন্তু এইমুহূর্তে অঞ্জনের সামনাসামনি, মুখোমুখি হওয়া কঠিন।

শেষপর্যন্ত অঞ্জন কথা শুরু করে। আর এমনিভাবেই সে কথা বলে যেন কিছুই হয়নি। আইভির কথা বলার সামর্থ্য ছিল না। অঞ্জন একতরফাই স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছিল। ঠিক স্মৃতিচারণও নয়। আরেক পিঠের ইতিহাস বলছিল সে, যা আইভির অজানা। যা অঞ্জনেরও, এবং যে ঘটনা আইভির জীবনকে বদলে দিয়েছিল।

—তখন যদি চাকরি করতাম—আমার এই পরিণতি হত না। বাবার ব্যবসা দেখি। বাবার ব্যবসা, পারিবারিক ব্যবসা যে নিজের নয় তাতো বুঝিনি। আসলে বুঝিনি ওরা আমার মূল্য এত কম দেয়। চিরকাল ওদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে এসেছি। তুমিও নামী মেয়ে। তখন গানের ফাংশন করছ। আমার বাবা মা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেবল জাত আলাদা। আমি জানতাম ওরা মেনে নেবেন না। কিন্তু তোমাকে তো বলেছিলাম, আমার ধারণা ছিল বিয়ে করলে বউকে কি ফেলতে পারবে? তোমার বয়েসের কথাও আমার মাথায় ছিল না। এত কম বয়সে বিয়ে হওয়া সম্ভব কী সম্ভব নয় সেসব তো বুঝিনি তখন। এত ইমম্যাচিওর ছিলাম, আজ ভাবতেই কেমন লাগছে। এখন বুঝতে পারি ওভাবে পালিয়ে যাওয়াটা উচিত হয়নি। সারাটা জীবন নষ্ট হল। যদি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতাম। এমনকি তখন যদি তুমি সাবালিকা হতে—

—তুমি অনিতার তো তাই করলে। এত ছোট বয়সে বিয়ে। ফের করলে তো একই কাজ।

অঞ্জন যেন অবাক হল। এই প্রশ্নটা সে আশা করেনি। আইভির দিকে তাকাল। আসলে ভাল পাত্র পেয়ে গেলাম। কোলিয়ারির ইঞ্জিনিয়ার। একটাই ছেলে। ওর বাবাও বড় ব্যবসায়ী। সাথে বিজনেসটাও আছে। মেয়েটা তো খুব আদুরে। একটু স্বচ্ছন্দে থাকবে তাই চেয়েছিলাম। ওরাই স্যাতাড়াতাড়ি চাইলেন। শরীরের কথা ভাবলে এত তাড়াতাড়ি হয়তো ভুলই হয়েছে। এখানে আমাদের স্বার্থ কাজ করেছে। আর কি?

আইভির ঠোঁট বেঁকে গেল। স্বার্থই তো সব অঞ্জন। তোমাদের মেয়েকে ভালভাবে তাড়াতাড়ি পার করবার জন্য মেয়েটাকেই যে উৎসর্গ করলে। ও কি ভাল আছে? এটুকু বয়েসে প্রেগন্যান্সি। এটা কি ঠিক? মেয়েটার কথা ভাবলে না?

—ও কি বলেছে ও অসুখী? কিছু বলেছে তোমাদের?

—না সেরকম কিছু নয়। মুকুল কী একটা যেন বলছিল।

—আসলে আমরা তো মেয়েদের খুব স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। এরা একটু রক্ষণশীল। তাই হয়তো অসুবিধা হচ্ছে। নইলে খারাপ কী? যতবার এসেছি, দেখেছি বেশ সেজেগুজে আছে। ও তো ওসব খুব পছন্দ করত। কত জামাকাপড় কিনত। কত টাকা যে ওড়াত। তাই পয়সাওলা ঘরেই দিলাম। ওদেরও খুব পছন্দ ছিল। অনিতা তো দেখতে ভালই।

— তবু কেন জানি মুকুল বলছে ওর মানসিক সমস্যা আছে। তুমি বলছ নেই।

—তাই তো জানি। কখনও তো কিছু বলেনি। অঞ্জনকে একটু চিন্তিত দেখাল। তারপরই ও যেন সব ঝেড়ে ফেলল। না, তেমন হলে ওর মা অন্তত জানত।

—ইরা তোমাকে ভালবাসত এটা জানলে আমি তোমার সঙ্গে যেতাম না। অবশ্য এত ছোট ছিলাম তখন। আইভি যেন অন্নবয়সের ওপরেই সব দোষ চাপাতে লাগল। বয়সটাই তো অবুঝের। তখন নিজের মধ্যে যেন নিজেই ছিলাম না। জীবনটাকে নষ্ট করে ফেললাম।

—তুমি কী আর নষ্ট করলে। আমি ভেতরে ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গেলাম। কে বলল ইরা আমাকে ভালবাসত! সে যদি তাই বাসত তাহলে তো হয়েই যেত। অঞ্জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—মানে? আইভি ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—মানে এটা তো অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। যখন ওই ঘটনা ঘটল, তুমি তো জান না তোমাকে হোটেলে রেখে আমি বাবা-মার সঙ্গে কথা বলতে এলাম। বাড়িতে তখন তুলকালাম কাণ্ড। মা না খেয়ে আছে দু-দিন— যে ক'দিন আমরা চলে গেছি। আর বাবা কুয়োয় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, কাকারা ধরে আছে। সে কী অবস্থা। তার ওপর ব্লেড দিয়ে বাবা গা চিরছেন। বাড়িময় কান্নাকাটি। আমি ফিরতে পারলাম না। ওরা তো বিয়েটিয়ে সবকিছু উড়িয়ে দিলেন। তোমার বাড়িতেও খবর দেওয়া হল। আমি বংশের বড় ছেলে। আমি যদি বেজাত বিয়ে করি তাহলে আর রক্ষে নেই। তা আমি বাবাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতেই যা করার করলাম। সবার মুখে তখন হাসি। কিন্তু আমি দিনরাত ঘরে পড়ে আছি। ব্যবসাও দেখি না, বাইরে বের হতেও মন চায় না। মা তো তাই দেখেও কাঁদেন। তখন আমার বোন ইরার কথা মাকে বলেছিল। মা সান্ত্বনা পুরস্কার দিতে চাইলেন আর কি। ইরাকে আমার দেখতে সুন্দর লাগত কখনও বলেছিলাম বোধহয়— তাই গছিয়ে দেওয়া হল।

—তুমি তো বিয়ে করলে।

—বাধ্য হলাম। বাবা-মাকে কষ্ট দিতে চাইলাম না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো স্বার্থপর হতে পারলাম কই। আমার জীবনটা তাই গেল। তাদের তো ছাড়তে পারি না।

—তাই তো। কিন্তু সে তো আমার বিনিময়ে। আমাকে ছাড়া তো সোজা। আইভি উঠল। অঞ্জনের পাশ থেকে উঠে দূরে বসল।

—তুমি যা বলছ তা ঠিকই। কিন্তু আমার কী সামর্থ ছিল বল। বাবা না মেনে নিলে তখন তো না খেতে পেয়ে মরতাম।

—পরে তো চাকরি করলে, তখন তাহলে করলে না কেন?

—পরে তো বাধ্য হলাম। ব্যবসা গেল কাকাদের সঙ্গে ভাগাভাগি হবার পর। আমার বড় মামা তখন এখানে ঢুকিয়ে দিলেন। সে অবশ্য ক্ল্যারিক্যাল পোস্টে। তারপর অবশ্য পড়ে উঠে, ডিগ্রি বাড়িয়ে এতদূর এলাম। কিন্তু ভুল তো ভুলই আই। আমি জীবনের কী পেলাম বল? তুমি তো সংসার করলে না। কিন্তু অপছন্দের মানুষকে টেনে নিয়ে যাওয়া যে কত কষ্টকর তাও বুঝলে না তুমি হয়তো মানবে না আমি তোমাকে হারিয়ে একদিনের জন্যও সুখি হইনি।

আইভি বলছিল, থাক। এই বয়সে এসে এসব কথা বলার তো সত্যিই কোনও অর্থ হয় না। আইভি কথাগুলো ধীরে ধীরে বলছিল। সামান্য লজ্জার আভাস ছিল সেই মুখে। তবু অঞ্জনের কথাগুলো সে বিশ্বাস করেছে এই ধরনের ভাব করছিল সে। বলছিল, আর কিছু নয়। অন্নবয়সে কতরকমের ভুলই তো আমরা করি। তারপর তার জন্য শেষকালে আফসোস করে মরি।

—তবু তো আমার সান্ত্বনা তুমি কলকাতা যাচ্ছ। তোমাকে হয়তো প্রায়ই কাছে পাব। অঞ্জন বলছিল।

কাছে পাব-শব্দটা কানে লাগল আইভির। এতদিন একা একা থাকার অভ্যাস আইভির। সেখানে অন্যজন হাত এগিয়ে আনছে এটা তার পক্ষে অস্বস্তিজনকই। অঞ্জন বড় দ্রুত এগিয়ে আসতে চাইছে। আইভি কথা পাল্টানোর জন্যই টেবিলের ওপর থেকে সমিতির স্যুভেনিরটা নেয়। অঞ্জনকে দেখাতে থাকে।

প্রথমেই মুক্তেশের ছবি। ওর টাক মাথা। আয়ত চোখ। ফর্সা ব্যক্তিত্বপূর্ণ মুখচ্ছবিতে অঞ্জন খানিকক্ষণ আটকে যায়।

আইভি মুক্তেশের পরিচয় দিতে থাকে। কথায় উচ্ছ্বাস এসে গিয়েছিল। এই বিষয়ে আইভি সবসময়েই বড় মুখর থাকে। যেন মনে হয় এইটাই ওর বিষয়। অবশ্য স্যুভেনিরে মুক্তেশকে নিয়ে লিখেছেও সে।

অঞ্জন দেখতে থাকে। তারপর একসময় সেটা বন্ধ করে বলে, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব আইভি, কিছু যদি না মনে কর—

আইভি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

অঞ্জন সংকোচ নিয়েই বলে, অনিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তোমাকে জানে দেখলাম। তো তারাই বলছিল মুক্তেশ বোসের সঙ্গে তোমার গোপন বিয়ে হয়েছিল।

আইভি এই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। এ অঞ্চলে তাদের সম্পর্কের কথা সুবিদিত। কিন্তু তা বলে গোপন বিয়ে? এতদূর? আইভি এই বদনামে এত অভ্যস্ত ছিল যে তার নতুন করে গায়ে লাগার কথা ছিল না। তবু অঞ্জনের মুখে এ কথাটা শোনা গায়ে জ্বালা ধরায় বৈকি।

—তোমার কি মনে হয় এটা সত্যি? আইভি পাল্টা প্রশ্ন করে।

—এটা তো আমার বলার কথা নয়।

—কেন নয়? আমার বিয়ে করা, ঘরসংসার করা, স্বামী পাওয়া এটা কি স্বাভাবিক নয়। তুমি তো ভাল বুঝবে।

আইভির আক্রমণের উত্তরে অঞ্জন কথা বলতে পারে না।

অঞ্জনের মুখ কালো লাগে। আইভি উৎফুল্ল হয় তা দেখে। অঞ্জনকে সে শোনায়— শোন আমি মুক্তেশকে ভালবাসতাম।

অঞ্জন সম্ভবত একথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কোনওমতে বলে, এতদিন এতবড় কথাটা আমাকে জানাওনি যে। তুমিও তো বিয়ে করেছ!

আইভি অঞ্জনের অবস্থা দেখে হাসতে থাকে । হাসতে হাসতেই সে দরজা খোলে। অনিতার কাছে অঞ্জনের সঙ্গে যাবার প্রস্তুতি নেয়।

অঞ্জন ফের বলে, ডক্টর বোসও তো সেকথা বললেন না। তোমরা সকলে মিলেই আমাকে বোকা বানালে। অঞ্জনকে অসহায় লাগছিল। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অঞ্জনের পিঠে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলা দিল আইভি। দরজায় তালা আটকাতে আটকাতে বলল: মিস্টার সোম, ও সান্ত্বনা পুরস্কার আমাকে কেউ দেয়নি।

একটা দমকা বাতাস লেগে যেন অঞ্জনের মুখের মেঘ কেটে যাচ্ছিল। ওর চোখমুখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ও বলছিল, আমি তো এটাই ভেবেছিলাম। ওদেরকেও তাই বলেছি। মাঝখান থেকে তুমি এমন করলে যে আমি একেবারে কুপোকাত হয়ে গেলাম। অঞ্জন শব্দ করে হাসছিল। ওরা এভাবেই সিঁড়িতে নামছিল। হঠাৎ মুকুল আইভিকে ডেকে নিয়ে যায়।

—অনিতাকে রিলিজ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আজ। তারপর আবার আসবে। আমি বলেছি ডেট এর সপ্তাহখানেক আগে এলেই হবে। আর অন্য কোনও অসুবিধা থাকলে তো আসতেই হবে। তাহলে ওর বাবাকে বলে দিই। আজই অ্যামবুলেন্স রেডি করে দিচ্ছি।

আইভি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনিতাকে এত তাড়াতাড়ি সত্যিই ছেড়ে দেবে মুকুল এটা সে কল্পনাও করেনি। অনিতাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা আইভি আগে যে বলেনি এমন নয়। তবু এ মুহূর্তে ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগল।

মুকুল আবারও জিজ্ঞেস করল— তোমার মত আছে তো? তুমি কেস রিপোর্টটা পুরো দেখতে পার।

—আমি দেখতে চাই না। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। তুমি তো ওর ডাক্তার।

—তাহলে তুমিই মিস্টার সোমকে কথাটা বলে দাও। আধঘণ্টা পর আমি যাব।

মুকুলের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে দেখল অঞ্জন নেই। মেয়ের কাছে চলে গেছে সে। বেলা বারোটাতে দুপুরের-রোদ আছড়ে পড়ছিল। চতুর্দিক যেন খাঁ খাঁ করছে। অনিতা চলে গেলে অঞ্জনও আর আসবে না। এটাই তো চেয়েছিল সে। মুকুলকেও সেকথাই তো জানিয়েছিল। তবে কীভাবে যে কী হয়ে গেল। আইভির নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল। সে তার ঠোঁটে জিভ ছোঁয়াল। আজ অঞ্জন এমন ব্যবহার করল কেন? ও কি জানত আজ শেষদিন!

অনিতার কেবিনের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল আইভি। ভেতরে বাবা আর মেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। আজ অঞ্জন খুবই উচ্ছ্বসিত। ওর কথাবার্তা থেকেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আইভি এদের কীভাবে কথাটা জানাবে? ভেতরটা হু হু করছে আইভির। একদিন আগেও তো অঞ্জন সম্পর্কে তার এরকম কিছু মনে হয়নি।

দরজা ঠেলে ঢুকল আইভি। মেয়েটা হাসছে। ওর কপালে হাত রাখল। অঞ্জনের দিকে একবার তাকাল সে। বড় আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে সে। ভেতরটায় অস্থিরতা অনুভব করল সে। অনিতার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে সে বলতে লাগল: তুমি আমাদের হসপিটালটাতো ঘুরে দেখনি। কত সুন্দর চারপাশ। আমরা কত গাছ লাগিয়েছি।

বাচ্চা মেয়ের গলায় অনিতা বলল, আমার আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। কবে যে স্বাভাবিক হব। চলে ফিরে বেড়াব।

—আর তো বেশিদিন নয়। এরপরে এলে তোমাকে নিয়ে আমি ভরতপুরের সব দেখিয়ে আনব।

অঞ্জন মেয়ের সামনেই বলে ফেলল, অনিতার থেকেও তখন তুমি কত ছোট ছিলে, যখন তোমার সঙ্গে ফাংশনে যেতাম। তুমি, সুরভি, তোমার বাবা আর আমি। তোমার মনে পড়ে?

আইভির ভেতরে যেন জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়েছিল। আর বসে থাকা যায় না। সে বাইরে এসে মুকুলের চেম্বারের দিকে গেল। বলল মুকুল, তুমি ওই কেবিনে গিয়ে কথা বল। রিলিজ দিয়ে দাও।

—তুমি বলছ?

—আমার বলা কি শোভা পায়? অনিতা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে। আমি বললে হয়তো ভাববে আমার সিদ্ধান্ত এটা।

—মিস্টার সোমকে জানিয়েছ নিশ্চয়।

—একসঙ্গেই বলবে না হয়।

—তোমার কি মনখারাপ হচ্ছে ম্যাডাম? তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম অনিতাকে রেখেদি। উনিও থেকে যাবেন।

—কী যাতা কথা বল তুমি!

—তোমার মুখটা আয়নায় দ্যাখ, বাথরুমে যাও। দেখ কী হয়েছে। আমি যাতা বলছি, তাই না—

আইভি নিজের অজান্তেই মুখে হাত দিল। মুকুল কি কিছু বুঝতে পেরেছে? তার হাতে নিজের গরম নিঃশ্বাস ছাড়া কিছুই লাগল না। খানিক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে।

—বেচারা, মুকুল তার দিকে তাকিয়ে বলল।

আইভি ছুটে বাথরুমে ঢুকল। আয়নার নিজেকে তন্নতন্ন করে দেখল। কোথাও কোনও চিহ্ন আছে নাকি? তারপর ভয়ঙ্কর লজ্জা আর কষ্ট তাকে আচ্ছন্ন করল। তার চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এল।

দরজার ওপার থেকে মুকুল বলছে: মন ঠিক কর। কী করবে, রেখে দেবে একমাস? তোমার হসপিটালে তাহলে মোটা টাকা আসবে। আমার আপত্তি নেই। দ্যাখ।

আইভি নিজেকে সামলে বের হয়ে এল। হাসতে পারবে না জেনেই ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ন্যাকামো কোর না মুকুল। তুমি বাচ্চা নও। এসব কথাবার্তা তোমাকে মানায় না।

মুকুল হাসছিল। এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সেই বাচ্চা মেয়ে। বলছিল, ঠিক আছে আমি আজ রিলিজ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর তুমি কিছু বলতে পারবে না। কিছু না।

হাসতে হাসতে আইভিকে একা রেখে মুকুল ওদের কেবিনে চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর ক্যান্টিনের সামনে অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুপুরের খাবার পাওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে সে খোঁজ নিচ্ছিল। আইভিকে দেখে সে প্রায় ছুটে আসে। বলে কোথায় ছিলে তুমি? কতক্ষণ ধরে তোমার খোঁজ করছি? তুমি কি জান অনিতাকে আজ ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ওকে আমাকেই নিয়ে যেতে হবে।

—কখন যাচ্ছ তোমরা? নিস্পৃহ গলায় আইভি জিজ্ঞেস করে।

—বিকেলে তিনটে নাগাদ বের হব বলেছি। আমি তো আগে খাবার অর্ডার দিইনি। তাই গেস্টমিল হয়নি। সব গোছাতে তো সময় লাগল। আজ দেখছি খাবার জুটবে না।

আইভি হাসল। বলল, আমার সঙ্গে খাবে চল।

আইভি ক্যান্টিনেই অঞ্জনকে নিয়ে বসল। ক্যান্টিনে অনেকেই খাচ্ছে দুপুরবেলার মিল। অনেকেই তাদের দিকে তাকাচ্ছে। আইভি শুধু অঞ্জনের দিকে মন দেবার চেষ্টা করছে। কারুর দিকে যাতে চোখ না যায়।

খাবার এল। আইভি আরেকটা প্লেট নিল। দুভাগে ভাগ করল সব একে একে।

অঞ্জন বলল: তুমি জানতে আজ অনিতাকে ছুটি দেবে।

—জানতাম তবে বেশিক্ষণ আগে তো নয়।

—আমি ভাবতে পারিনি। এত তাড়াতাড়ি সব ফুরিয়ে যাবে।

—কীসের কথা বলছ?

—তোমাকে ফিরে পাবার কথা।

আইভির খাওয়া থেমে যায়। থালার মধ্যে আঁকিবুকি কাটতে থাকে সে। বলে, এভাবে নাই বা বললে।

—আবার অবশ্য আসছি আমি। তাছাড়া তুমিও তো চলে যাচ্ছ কলকাতায়। হয়তো শেষ জীবনটা ভাল কাটবে। হয়তো মরার আগে তোমাকে দেখতে পাব। ক'বছর বাঁচব আর।

—মৃত্যুর কথা আমাদের ভাবতে নেই। মুক্তেশ বলতেন। আইভি বলতে গিয়েও থেমে গেল। কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারল না। মুক্তেশের কথা বার বার তার মনে পড়ে কেন? মুক্তেশের কথা তুলে অঞ্জনকে ম্লান করে দিতে শেষ সময়ে ইচ্ছে হল না। বদলে হাঁটু দিয়ে তার পা স্পর্শ করল।

মার্চের দুই তারিখে মুক্তেশের জন্মদিন। এই দিনটায় সমিতির পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠান করা হয়। সেমিনার হয়। ছোটখাট গ্রাম্যমেলার আয়োজন করা হয়। সাঁওতালরা দলবেঁধে নাচে, গান গায়। রোগীরা সেদিন ভালমন্দ খাবার পায়। হসপিটালও নতুন করে সাজে। আনাচে কানাচে পরিষ্কার করে ঝকঝকে তকতকে করা হয়। সেমিনারে প্রতিটি কর্মীরই বলার সুযোগ থাকে। এ যেন মুক্তেশের আদর্শকে ঝালিয়ে নেওয়া। মনে পড়িয়ে দেওয়া।

প্রতিবারই আইভি সভাপতির ভাষণ দেয়। ভাষণ মানে মুক্তেশের জীবন সম্পর্কে বলা। কীভাবে, কোন পরিস্থিতিতে কত কষ্ট করে মুক্তেশ এই হসপিটাল গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিবার প্রায় একই কথা বলতে হয়। আসলে আইভি ছাড়া আর কেউ কি মুক্তেশের কথা সেভাবে জানে? জানলেও আইভিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এবার আইভি জেদ ধরেছে সে বলবে না। মুকুল থাকতে এ কাজ সে করবে না। এতদিন করেছে, মুকুলকে সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু আর নয়। তাকে তো ছুটি নিতেই হবে। একেবারে চলে যাবার আগে সবকিছু গুটিয়ে ফেলা জরুরি।

এমনিতেই তার আর কিছুতেই কাজকর্মে মন বসছে না। অঞ্জন চলে যাবার পর নির্বিষ্ট মনটা কেমন করে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুতেই তা বশে থাকছে না। তারপর কয়েকদিন অন্তর অন্তর অঞ্জন রাত্রে ফোন করে। মুক্তেশের ছবি হাতে ধরে বসে থাকলেও তার মন স্থির থাকে না। চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষতে থাকে। অঞ্জন একটা দমকা হাওয়ার মতো এসে তার সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। নইলে বহুদিন আগেকার স্মৃতিও তাকে এমন করে কামড় দেয়।

মুক্তেশকে সে চেয়েছিল। অঞ্জনকে আইভি মিথ্যে বলেনি, মুক্তেশকে সে ভালবাসত। হয়তো সেই ভালবাসা ছিল অঞ্জনের জন্যই। অঞ্জনের অভাবে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেই মুক্তেশকে ধরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সে। মুক্তেশ তাকে কাজে ঠেলে দিয়েছিল। বোকার মতো আইভি ভাবত এই বুঝি ভালবাসা। ভাবত মুক্তেশের মতো মানুষ যা চায় তা সে দেবে না কেন? দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মুক্তেশের সামান্য হাসিমুখ দেখে সে সব ভুলে যেত। সেই মুখ মনে ধরে রেখে সে একের পর এক মাস বছর কাটিয়ে যেত। মুক্তেশের এতটুকু বিরূপতা তার সহ্য হত না। অঞ্জনকে ফের না দেখলে, অঞ্জনের সঙ্গে এভাবে না মিশলে আইভি বুঝতেই পারত না সে কত তুচ্ছতাকে বুকে তুলে নিয়েছে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে। আজকাল প্রতি রাতে তাই অঞ্জনের কণ্ঠস্বরের জন্য অপেক্ষা করে। অঞ্জন আবার মুকুলকেও ফোন করে। মেয়ের ডাক্তার বলে তোয়াজ করে। আইভিকে অঞ্জন জানিয়েছে ওয়ানরুম ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে ওদের বাড়ির কাছাকাছি। আইভির অবশ্য পছন্দ নয়। অঞ্জনের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন দেখা হবে— তাও সইবে সে। তবু ওর বাড়ির কাছাকাছি কিছুতে নয়। ওর কোনও আত্মীয়, ওর বউ, ওর মেয়েদের কাছাকাছি সে থাকবে না।

যদি অঞ্জন ওদের পাড়ায় না থাকত, তাহলে কি আইভির সঙ্গে তার সম্পর্ক হত? অঞ্জনরাই সেবার ফাংশন করিয়েছিল সরস্বতী পুজোয়। বারবার বাবাকে রাজি করাতে তাদের বাড়ি এসেছিল। সেই তো প্রথম আইভিলতার আত্মপ্রকাশ। ভয়ে ভয়ে, অসম্ভব ঠোঁটকাঁপা নিয়ে সে গেয়েছিল। পাড়ার লোকে খুব হাততালি দিয়েছিল। বাবা বাড়িতে এসে রাগারাগি করেছিল— এটা কি গান হল? তুমি তো এত খারাপ গাও না? পরে অঞ্জনকে জিজ্ঞেস করেছিল কেন আইভিকে সে ডেকেছিল? অঞ্জন নাকি বহুদিন তাকে লক্ষ্য করেছে। তাদের জানলায়, ইস্কুল যাবার পথে, বাগানের মধ্যে যেখানে তার বাবা তাদের গান শেখাতেন। বাবাও অবশ্য অঞ্জনকে খুব ভালবাসতেন। অঞ্জনের জন্যই যে তাদের দুই বোনের নাম ছড়িয়েছিল। এখানে ওখানে গান গাইতে নিয়ে যেত। সামান্য টাকাপয়সাও তখন কেউ কেউ দিত। রিক্সাকরে যাওয়া আসা, মিষ্টি খাওয়া আর বাবার আড্ডায় মিশে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে অঞ্জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলা।

সেইদিন অঞ্জনের সঙ্গে চলে যাওয়া তার ভুলই হয়েছিল। অথচ আইভি

কী করবে? এ প্রস্তাব তো আইভি দেয়নি। আইভিকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিল অঞ্জন। বাবাকে দিদিকে কথাটা সে বলেনি এমনও নয়। বাবাও অরাজি ছিলেন না। সে বোধহয় অঞ্জনকে ভালবাসার দরুন। বাবা বলেছিলেন— অঞ্জন তোকে বিয়ে করলে তোর গানটা বাঁচবে। এর থেকে তোর ভাল আর কীসেই বা হবে? এই প্রশ্রয় পেয়েই কি সে কোনও ভাবনাচিন্তা না করে অঞ্জনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল? তার মা বেঁচে থাকলে কি সাবধান করতেন না?

অঞ্জন সবসময় তার বাবা মা'র প্রশংসা করত। সমস্ত পরিবারের জন্য তার বাবার, তার মায়ের কত ত্যাগ সেসব গল্প আইভির মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনদের বাড়ি সে মাঝেমাঝে যেত না— এমনও নয়। তার মা খুব খাওয়াত আইভিকে। ওকে গান গাইতে হত। খুব প্রশংসা পেত ওদের বাড়িতে। তখন অবশ্য অঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কেউ জানত না। অঞ্জন কিছুতেই বাড়িতে বলতে চাইত না। আইভি যেমন করে অঞ্জনের কথা তার বাবাকে বলেছে, দিদিকে বলেছে সেভাবে তার কথা বাবা-মাকে বলে না কেন ও? বললে নিশ্চয় ওর বাড়িতে তার আরও আদরযত্ন হত। ও তো এ বাড়িতেই থাকবে, এ বাড়ির মানুষদের নিজের করে নেবে, আর ওরা যখন তাকে এত ভালইবাসেন তবে অঞ্জনের এত দ্বিধা কেন? আইভির তখন এত এত চুলের গোছ! অঞ্জনের মা সেই চুল দেখে আফসোস করতেন তার মেয়ের এমনটা হল না বলে। সেই মা তাকে মেনে নেবেন না একি হতে পারে। অঞ্জন চুপ করে থাকত। আইভি কিছুই বুঝত না। কেবল ভাবত সে ভীতু। তার প্রেমিক বড় ভীতু। ভীতু বলেই যেন খুশি ছিল সে। ডাকাবুকো তার একেবারে পছন্দ নয়। শান্তশিষ্ট ছেলেরাই ভাল।

অঞ্জন বলেছিল একবারে সে বলবে। তাদের বাড়ির লোকে কেউই চায় না অসবর্ণ বিয়ে। সে যে জাতই হোক! আইভি ভয় পেত। বলত, এমন কাজ কী করে করব? ওরা তারপরে বলবেন না যে, তোকে আমরা এত ভালবাসি, তুই আমাদের কাছেও লুকোলি! অঞ্জন তবু রাজি হয়নি। আইভিকে এ কথাটা নিজের বাড়িতেও জানাতে দেয়নি।

আইভি রাত থাকতে উঠে সেদিন তৈরি হয়েছিল। সামান্য দুটো জামাকাপড় ব্যাগে গুঁজে ঘুমন্ত বাবা আর দিদিকে ফেলে সে অঞ্জনের সঙ্গে বাতাসপুর ছেড়েছিল। ট্রেনের শব্দের সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল। ভোরের ট্রেনে কামরাগুলো প্রায় ফাঁকাই ছিল। তারা দু'জন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল। আইভি যেন অঞ্জনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনের হাত শক্ত করে ধরেছিল। অঞ্জন শুধু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলে যাচ্ছিল। কালিঘাটে বিয়ে করবে তারা। সেখানে ওর কয়েকজন বন্ধু থাকবে। তারপর ওরা হোটেলে যাবে। তারপর হোটেলে আইভিকে রেখে সে বাড়ি ফিরবে। বাড়ি থেকে সবাই মিলে গাড়ি করে এসে তাকে নিয়ে যাবে। আইভির বাবা ও দিদিকেও তখন সঙ্গে নিয়ে আসবে। আর তার পরের থেকে তো স্বপ্নের দিন, স্বপ্নের রাত শুরু হবে।

একটি মাত্র স্বপ্নের রাত কাটিয়ে বাড়ির লোকের অনুমোদন ভিক্ষে করতে অঞ্জন বাতাসপুর ফিরে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। কালিঘাটে বিয়ে করার ইচ্ছে আইভির ছিল না। কোন মেয়েরই বা থাকে? ছোটবেলা থেকে বিবাহ অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে গয়নাগাটি বেনারসী পরে রানি সাজার যে গোপন ইচ্ছে মেয়েদের মধ্যে জন্মে যায়— আইভি তো তার থেকে অন্যরকম কিছু ছিল না। অঞ্জন অবশ্য বলত বাড়ি ফিরে ফের অনুষ্ঠান হবে। বাবা কি এমনি ছেড়ে দেবে? বাড়ির সবচেয়ে বড় ছেলে না সে!

আইভির মনে এতটুকু দ্বিধা ছিল না যে সে ফিরবে না। অঞ্জনের মা বছরে একদিন কালিঘাটে পুজো দিতে আসে। কালীর ফটো ওদের শোবার ঘরে টাঙান থাকে। কালিঘাটে বিয়ে কি তারা অগ্রাহ্য করতে পারবে? তারা অবশ্য রেজিস্ট্রি করার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু তার যে তখন বয়েস হয়নি।

অঞ্জন আর ফেরেনি। তাদের বাড়ির লোক তাকে আর আইভির কাছে ফিরতে দেয়নি। কালিঘাটের বিয়েকে তারা মানেনি। রেজিস্ট্রি হলে নাকি মানত।

আইভিকে তার বাবা সান্ত্বনা দিতে দিতে বলতেন: ওদের কথা ভাববে না তুমি। ওরা কখনওই তোমাকে নিত না। আমারই ভাগ্য খারাপ মা। তুমি তো বাচ্চা মেয়ে, লোক চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। আর আমি যে একটা বুড়ো লোক, তাতেও কি ওকে চিনতে পেরেছি? বাইরে আর ভেতরে যে সবাই একরকম হয় না। এত কাপুরুষ ছেলে অঞ্জন? তার একসময় চোখের জল মুছে বাবা বলতেন: তা একরকম ভালই হয়েছে জানিস আই। ওই ছেলের হাতে পড়লে তোর সারাজীবন নষ্ট হয়ে যেত। সুখের থেকে স্বস্তি ভাল।

অঞ্জনের সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বলছে আইভির সহ্য হত না। অনেকদিন পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে। কলকাতায় বাবার বন্ধুর বাড়িতে প্রতিটি মুহূর্তে সে অঞ্জনের পায়ের আওয়াজের জন্য উৎকর্ণ থাকত। সেদিন পারেনি। অন্যদিন তো সে আসবে। ও যে তাকে কথা দিয়েছিল। কী করে সে ভাববে অঞ্জনের সে কেউ নয়? তার বাবা মা'ই সব। আর সে কণামাত্র নয়।

বাবা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখন সে আর অঞ্জনের কথা জিজ্ঞেস করতে পারত না। অথচ বুকের ভেতর থেকে উথলে উঠত হাজারো প্রশ্ন। অঞ্জনের কথা শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠত সে। বাবা একটা শব্দও বলতেন না। অঞ্জনের ঘটনা শুধু তাকে নয়, তার বাবাকেও গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল। নইলে বাবা অত তাড়াতাড়ি বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়লেন কেন?

যেদিন আইভির আঠারো বছর হল সেদিন সে প্রাণভরে শ্বাস নিল। সেইদিন চূড়ান্ত আশা নিয়ে সে কলেজে যায়নি। যদি সে আসে। যদি সে এসে তাকে সত্যিকারের বিয়ে করতে চায়। অঞ্জনকে ওরা হয়তো ঘরে আটকে রেখেছে। একদিন নিশ্চয় ও আসবে। সেই কথা ভেবে-ভেবে ও দিন কাটিয়েছে।

বাতাসপুর সে আর যেতে পারে না। বাবাও চান না যে সে ঘরে ফিরুক। বাবা তাকে আর গান গাইতেও বলে না। এ ঘটনা বড় পীড়া দেয় আইভিকে। তারপর অবশ্য বাবা এমনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে আর বের হতে পারতেন না। কখনও কখনও চিঠি লিখতেন। উপার্জনের কথা লিখতেন, পড়ার কথা লিখতেন, অভিনয়কুশলী মেরুদণ্ডহীন মানুষের কাছে থেকে এড়িয়ে চলার কথা লিখতেন, চূড়ান্ত বিপদেও আশা না হারানোর কথা লিখতেন, কিন্তু গান গাওয়ার কথা লিখতেন না। অঞ্জন শুধু তার কৈশোর আর যৌবনকেই নিয়ে যায়নি। তার গানকেও নিঃশেষ করে দিয়েছিল। বাবাও বলতেন মাঝেমাঝে— তুই যদি গান না গাইতিস, ও তাহলে তোর জীবনে হয়তো আসত না।

আইভি জানত তার বাবা অঞ্জনকে ঘৃণা করেন, তার দিদিও করে। কিন্তু সে কেন করতে পারে না? যতক্ষণ না আইভি শুনেছিল অঞ্জন ইরাকে বিয়ে করছে ততক্ষণ সে আশা ত্যাগ করেছিল? তাহলে অঞ্জন তাকে এতদিন পর নাড়া দল কীভাবে? এটা কি শুধুই অভ্যাসের ফল? আইভি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করেছে, তবু নিজের অজান্তে কীভাবে সে একটু একটু করে তার দিকে এগিয়ে গেছে। আজ হয়তো সে আগের মতো নেই। আগের মতো নিজেকে জানান দেয় না। তবু অঞ্জনের কাছে যথেষ্ট সংযত থাকার চেষ্টা তার সফল হয়নি।

আইভি জানে না ভরতপুর ছেড়ে কলকাতা যাবার পর কী ঘটবে? যদি অঞ্জন তার কাছেই থেকে যেতে চায় সে কি বাধা দেবে? দেওয়াই তো উচিত। সে তো আগের মতো বাচ্চা নেই। তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করা যায় না। সে সবার থেকেই দূরে থাকবে। সপ্তাহে একদিন অফিস ফেরত অঞ্জন আসবে। তাইতে তার সাধ মিটে যাবে। বেশি কিছু তো সে আশা করে না।

আইভি ভাবল মুক্তেশ যদি তাকে সত্যিই বিয়ে করত মুকুলের কথা মতো, কিংবা অঞ্জন যেরকম বলল সেরকম তাহলে কি অঞ্জনের প্রতি এইরকম মনোভাব আইভি নিত? মুক্তেশ তার ইচ্ছাকে কতখানি অপূর্ণ রেখেছে তাও কখনও বোঝেনি আইভি— যতক্ষণ না অঞ্জনকে দেখেছে। আশ্চর্য, অঞ্জনের কোথাও আড়ষ্টতা নেই। ও এমন ব্যবহার করতে শুরু করেছে যেন ও আগের আইভিই আছে। আজকের আইভি যেন হেরে যাচ্ছে সেদিনের কাছে। ভেতর থেকে সেই পুরনো কিশোরী মেয়েটা বের হয়ে আসতে চাইছে। আচ্ছা অঞ্জন যদি ইরাকে ডিভোর্স করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে সে কি মেনে নেবে? আইভি সচেতন হয়ে ওঠে সে কী ভাবছে। নিজেকে সে এইসব চিন্তার বৃত্ত থেকে বের করতে চায়।

সে মুক্তেশের জন্মদিন পালনের কথা ফের ভাবতে থাকে। এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য সে মুকুলের কাছে যায়। গত সপ্তাহটা মুকুল নাইটডিউটি নেবার ফলে রাতে তার কাছে আসেনি। তাছাড়া জ্বর হওয়ার পর বিশ্রাম নেবার অছিলায় এবং অঞ্জন আসার ফলে ঘরের বাইরের দরজা অধিকাংশ সময় সে বন্ধ করে রেখেছে। বিশেষত মুকুল আসুক সে চায়ই নি। আর কোনও ডাক্তার অবশ্য সেভাবে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে তার ঘরে আসে না। দরকার যা কিছু থাকে অফিসে মিটে যায় বলেই।

মুকুল নেই। ওর ঘরে তালা। আইভি এদিক ওদিক দেখল। কোথাও নেই। আইভি ওয়ার্ডগুলোয় চক্কর দিল। কোথায় গেল ছেলেটা। হয়তো গ্রামে গেছে এমনটাই ভাবল আইভি। আর তো মাত্র চারদিন, তারপরেই তো অনুষ্ঠান। ওয়ার্ডবয়দেরকে জিজ্ঞাসা করল। সবাই দেখেছে অথচ ও কোথাও নেই।

নিজের অফিসের দিকে ফিরতে ফিরতে আইভির পা থেমে গেল নয়

নম্বর কেবিনের সামনে এসেই। এই কেবিনে অনিতা থাকত। শেষের দিকে প্রতি বিকেলেই একবার করে অঞ্জনের সঙ্গে অনিতাকে দেখতে আসত। কখনও কখনও সকালবেলাতেও আসত। ঘুমন্ত অনিতার সামনে এক একদিন অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকত। মুখখানা ভাল করে নিরীক্ষণ করত। প্রথমদিকে যাকে মনে হয়েছিল কেবলমাত্র ইঁয়ার ছায়া, পরে পরে তার নাক চিবুক ঠোঁট সবের সঙ্গে অঞ্জনের মিল খুঁজে পেয়েছিল। সেই অঞ্জনের মেয়েকে সে দু'চোখ ভরে দেখেই যেত। তারপর যদি সে জেগে উঠে তাকে দেখে অবাক হয় সেই ভয়ে সরে আসত পায়ে পায়ে। তবু ভোরবেলাতে কী একটা টানে সে এই কেবিনের কাছে চলে আসত।

আইভি কেবিনের পর্দায় হাত দেয়। কে ওখানে? অন্ধকার ঘরে মুকুল একা বসে আছে। চশমাটা ওর একটু নেমে গেছে। আইভির অস্তিত্বটুকু সে টের পায়নি। আইভির মুকুলকে দেখে বিস্ময়বোধ হল। মুকুল কি অনিতার শোকে এমন হল? আশ্চর্য, ওই ছোট মেয়ের প্রতি মুকুলের এত আকর্ষণ? তারপর ও বিবাহিত, মুকুলের কি কাণ্ডজ্ঞানটুকু চলে গেছে? মুকুল তো এমনি ছিল না। অন্তত এ দোষ ওর নেই। গৌতমী বলেছিল বটে, আইভির বিশ্বাস হয়নি।

আইভি ডাকল— মুকুল। মুকুল শুনতে পেল না। নিজের মধ্যে কোনও এক গভীর ভাবনায় সে মত্ত হয়ে আছে। আইভি ফের ডাকল। মুকুল মুখ তুলে চাইল। সে খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইল। কোন ভেতর থেকে ওর দৃষ্টি ফুটে বের হচ্ছে। চশমার পিছনের চোখদুটোতে ওর স্বাভাবিক চঞ্চলতা যেন মরে গেছে।

মুকুল আইভির ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আইভির মনে হল অনিতার কথা একবার বলে। মুকুল সবসময়ই তার সামনে হাসিখুশি থাকার ভান করে, সব কাজ হেসে হেসেই তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। অন্যান্য কর্মচারিদের সাবলীলভাবে আদেশ করে, তাদের সঙ্গে গল্প করে না। কোনও ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলে না। সমিতির অনেক লোকেই ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক তার কাছ ঘেঁষে না। সেই মুকুলকে বড় ম্রিয়মান লাগল। মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে লাগল। মুকুলের ভাগ্য খুবই খারাপ। সে অনিতাকে কোনওমতে পাবে না। অনিতা যে পরিবারের যে ধরনের মেয়ে তাতে কোনওদিন হাজার ভালবাসলেও সে মুকুলের কাছে ধরা দেবে না। মুকুলকে অল্পবয়স থেকে চেনে বলে হয়তো ওর প্রতি একধরনের মমতা হচ্ছিল আইভির। তবু যেভাবে মুকুল কথা বলে সেভাবেই আইভি মজা করে পরিবেশের ঘনত্বকে উড়িয়ে দিচ্ছিল।

—অনিতাকে দেখতে এসেছ বুঝি মুকুল? ও তো চলে গেছে। মুকুল মৃদু হাসার চেষ্টা করে চশমা মুছছিল। কিছু বলতে এসেছ ম্যাডাম? খুব নিচু স্বরে কথা বলছিল মুকুল।

—কেন কথা ছাড়া আসতে নেই? তোমাকে দেখতে এলাম। কী অবস্থা হয়েছে তোমার? অনিতার আসাটা গণ্ডগোল বাধাল।

—তোমার চোখে তাহলে মুকুল বোস ধরা পড়ে? বিষণ্ণ হাসল ও। আজকাল ডাকই না। পার্টনার পেয়ে গেছ তো।

নিজের জালে নিজেই আটকাল আইভি। শুধু বলল, অঞ্জনকে নিয়ে এসব বলো না। ও বিবাহিত, বউ মেয়ে সব আছে। তাছাড়া ও মুক্তেশ বোসও নয়। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। সত্যি মুক্তেশ বোসকে আমারই হিংসে হয়। হাতে পেয়ে তোমা হেন ধন ছুঁয়েও দেখল না। এদিকে অন্য লোক এসে তুলে ফেলল।

— রাগ হয়, বড় রাগ হয়ে বুঝলে।

—কার ওপর, ডাক্তারের ওপর?

—না না, নিজের ওপর।

—তুমি বুঝতে পার তুমি কত অন্যায় করেছ। কত বাজে কথা বলে মুক্তেশকে কষ্ট দিয়েছ। আমার কথা না হয় বাদ দাও।

— আচ্ছা মাড্যাম, তুমি অতীতকে বাদ দিতে পার না? সবসময় পিছনের কথা। একটু বর্তমানে বাঁচই না হয়। আমাকে দ্যাখ তুমি একটু চোখ মেলে দ্যাখ। জেনি তো ছেড়ে চলে গেছে। আমি তো এদেশে প্রথমেই ফিরে আসতাম— তুমি জান। জেনি আমাকে কীভাবে চাইল। জোর করল। বিয়ে করলাম। ভাবলাম ও কত ভালবাসে। ছোটবেলায় মা মরে গেছে। বাবা আমাদের মনের দিকে তাকায়নি। ভরতপুর নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, হোস্টেলে যখন ঘুম জ্বর নিয়ে পড়ে থাকতাম, তখনও বাবা আসত না। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। বাবার কাছে সে খবর পৌঁছাতই না। সেরকম অবস্থায় বড় হয়ে ওদেশে জেনি যখন আমাকে বিয়ের জন্য ডাকল তখন আমার মনে হল আমি যেন বেঁচে গেলাম। কিন্তু তুমি বল সত্যি কি বাঁচলাম? জেনি কি আমাকে ছেড়ে চলে গেল না?

—তোমার ব্যাড লাক মুকুল।

— তাই তো বলছি। আমি একসময় প্রতিমুহূর্তে ভাবতাম আমার ভাগ্য কেন এমন হল? যাকে ধরি সেই ফসকে যায় কেন? তখন বাবার কথা খুব মনে হত। মনে হত একটা কাজকে ধরে আছে বলেই হয়তো মানুষটা ব্যক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে। তুমি তো জান তখনই ভাবলাম ভরতপুর ফিরে যাই। ভাবলাম কাজে মন দিই। সব ভুলে যাব। প্রতিমুহূর্তে ভুলতে চেষ্টা করি।

—ভুলেছ তো অনেকটাই। আইভি আর মুকুল তখন হসপিটাল ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছে। ওরা কথা বলতে বলতে গ্রামের দিকে হাঁটছে। যেখানে খোলা মাঠ, শ্মশান। যার এক কোণে মুক্তেশকে পোড়ান হয়েছে। সেখানটা সামান্য বাঁধান হয়েছে। প্রচুর গাছপালা লাগান হয়েছে। সেইখানটা পরিষ্কার করছে লোকজন। জন্মদিনের দিন সন্ধ্যেতে সমিতির লোকজন, গ্রামের মানুষজন প্রদীপ জ্বালায়। আইভি বলল, বার সাধনক্ষেত্রে তুমি তো আগের চেয়ে ভালই আছ। মুকুল বলল, সেটাই তো মুশকিল। মুক্তেশ বোস সর্বত্র আমাকে হারিয়ে দেয়। এখানে কত পরিশ্রম করছি, কত মন লাগিয়েছি তুমি দেখছ তো। তবু ওর মতো পারছি কই? মাঝেমাঝে মনে হয় হৃদয়ে কেউ পিন ফোটাচ্ছে। মুকুল হাসতে থাকে। আইভি চুপ করে যায়। মুকুলের হাসিটাকে হাসি বলে মনে হচ্ছে না।

আইভি বলল, অনিতা কেন এল বলত? আমারই দোষ বাইরের পেশেন্টদের নিয়ে এলাম। মুক্তেশতো আদিবাসীদের বাইরে যায়নি। অনিতা না এলে এ মনোবিকলন ঘটত না।

মুকুল কথাটা কেটেকেটে ফের উচ্চারণ করে: অনিতা না এলে এ মনোবিকলন ঘটত না। রাইট। ম্যাডাম তুমি এত সত্য কথা বল।

—আমি সত্যি কথাই বলি, তোমাকে আমি মাথা থেকে পা অবধি বুঝতে পারি।

—কচু বোঝ, কাঁচকলা বোঝ। মুকুল বুড়ো আঙুল দেখাল।

ওরা দুজনে শ্মশানের একপাশে একটু ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। কিছু দূরে কয়েকজন আগাছা তুলছে, গোবর লেপছে, বাঁধান জায়গা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। চতুর্দিকে পলাশ গাছে গাছে যেন অগ্নিশিখা। গরমও বেশ অনুভূত হচ্ছে। মনে হচ্ছে কালো কালো লিকলিকে গাছগুলো যেন মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এই জায়গায় এলে মন কেমন যেন থমকে যায়। মুক্তেশকে যখন দাহ করা হয় একা আইভি তখন ঘরে বসেছিল। সকলে এলেও সে আসেনি। আসলে মুক্তেশের মৃত্যুর পর এত লোক, গোটা দুই-তিন গ্রামই যেন ভেঙে পড়েছে, তার ওপর কোলিয়ারির লোকজনও আছে। আইভি এতটুকু একা হবার সময় পায়নি। ওই সময়টুকু সে ভিক্ষা করেছিল। দরজা বন্ধ করে ধূ ধূ মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল সে। মে মাসের প্রখর গ্রীষ্মে তখন সমস্ত প্রকৃতি জুড়েই চিতা জ্বলে উঠেছে।

আইভির সেই দৃশ্যের কথা মনে হল। পাশে দাঁড়িয়ে মুকুল পা ঘষছে। আইভি বলল, এবার জন্মদিনের উৎসবে তোমাকে বক্তব্য রাখতে হবে মুকুল।

—বাবার কথা আমি বলব? আমি বাবার অযোগ্য সন্তান— তুমি জান না? বাবা যদি একথা জানতে পারে তাহলে স্বর্গ থেকে তোমাকে কেমন গালাগাল দেবেন বুঝতে পারছ।

আইভি ওর ফালতু কথায় মন দিল না। বলল, না, এবার তুমি বলবে। অযোগ্য সন্তান ছিলে, এখন আর নেই। ভাব তো তোমার বাবা কত খুশি হতেন যদি তিনি তোমাকে এ অবস্থায় দেখতেন। ভরতপুরের দায়িত্ব তার ছেলে নিয়েছে, এটা তাঁর কাছে সবচেয়ে খুশির ব্যাপার হত।

—কিন্তু কীই বা বলব আমি? বাবার কথা কতটুকু জানি বল? হাসপাতালটা দেখি। ডাক্তার হিসাবে যেটুকু দেখা সম্ভব। টাকা-পয়সা জোগাড় করে কতটা বিনাপয়সায় সেবা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করি। আর কিছুই তো জানি না। তবু এটুকুও পারতাম না তুমি যদি না থাকতে। হয়তো ভরতপুরে থাকতেই পারতাম না।

—মুকুল আমার ওপরে যে ডাক্তার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তাই থাকতে হয়েছিল। তুমি যদি তখন দায়িত্ব নিতে আমি আর থাকতাম না। আর আমি তো চলে যাবই।

—আচ্ছা, তুমি আজকাল এই ধরনের কথা কেন বল বলতে পার? আমি কি সত্যিই তোমার খুব অসুবিধা ঘটাই।

আইভি হাসার চেষ্টা করল।

—ম্যাডাম, তুমি আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দাও। তোমার এখান থেকে যাবার ক্ষমতাই নেই। এই ভরতপুরের প্রত্যেকটা ধূলোও তোমাকে চেনে তোমাকে চায়। তুমি যাবে কোথায়?

—যেখানেই যাই না কেন মুক্তেশের সম্পর্কে কিছু কথা তোমাকে বলে যাব। মুক্তেশের উত্তরাধিকারীর সে কথা শোনা প্রয়োজন।

—সেসব না হয় শুনব। কিন্তু তুমি যাবার কথা বলবে না। তোমার কোনও অসুবিধা থাকলে সেটার আলোচনা হতে পারে। তুমি কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনছ তো কী হয়েছে।

আইভি চমকে উঠল। একথা তোমায় কে বলেছে?

কাল রাতে মিস্টার সোম যে আমাকে ফোনে জানালেন তুমি ফ্ল্যাট কিনছ। অনেকক্ষণ কথা বললেন যে আমার সঙ্গে। সে তুমি কিনতেই পার। মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে থাকতেও পার। কিন্তু এখান থেকে একেবারে চলে যাবার মানে কী?

—কিছুতো একটা মানে আছেই মুকুল। তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে, কিছু আন্দাজ করতে পার না? আইভি-র গলায় শ্লেষ।

হঠাৎ মুকুল রেগে উঠল। আগেকার মূর্তি পেল যেন। বলল, সে তো ভালই বুঝতে পারছি কী জন্য তুমি ভরতপুর ছাড়তে চাইছ। কিন্তু কতকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছ তুমি— মনে নেই? কতকিছুর দায়িত্ব নিয়েছ তুমি, সেসব নিয়ে কি তোমার এতটুকু চিন্তা নেই? আবার তুমি যে মিটিং-এ বড় বড় কথা বলতে।

—তুমি কী বলছ, মাথা ঠিক আছে তো তোমার? আইভি মুকুলের দিকে স্থির তাকায়।

—খুব ঠিক আছে। তোমার মনে রাখা দরকার তুমি এখানকার যেসব পোস্টে আছ তা হুট করে ছাড়া যায় না।

—জানি, কাল তোমার ঘরে রেজিগনেশন রেখে এসেছি, তোমার হয়তো চোখে পড়েনি। তাছাড়া তোমার সম্ভবত মনে নেই জেনারেল বডির মিটিং মাত্র একমাস দেরি। কাজেই বে-আইনি কিছু আমাকে করতে হবে না।

—তুমি কি আর আইন জান না? কিন্তু আমিও দেখে নেব, কীকরে তুমি ছাড় পাও। রাগে মুকুলের চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা সে প্রাণপণ কামড়ে ধরে। তারপর বড় বড় পা ফেলে রোদের ভেতর দিয়ে জোর হেঁটে সে হসপিটালের দিকে চলে গেল।

মেজাজটা আইভিরও বিকল হয়ে গেল। মুকুলের এরকম ব্যবহার তার প্রায় মনেই নেই। বড় অদ্ভুত লাগল। মুকুল অনেক সময়ই বড় কুট, বড় ধূর্তের মতো আচরণ করে। ওর পরিণতির সঙ্গে সেসবও যেন মানিয়ে যায়। এই ব্যবহার বড় অবাক করল। মুকুল আজকাল অন্যরকম আচরণ করছে। অনিতাকে নিয়ে যে রকম বাড়াবাড়ি করল সেটাও যেমন ওর পক্ষে স্বাভাবিক নয়, তেমনই গৌতমীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে ফেলাটাও যেন ওর স্বভাবের পক্ষে মানানসই নয়। আইভি তো চিরকাল ওকে কৌশলী ভাবত। কিন্তু অঞ্জনেরও এটা ঠিক হয়নি। সে মনস্থির করেছে ঠিকই, ফোনে ফ্ল্যাটের যে বিবরণ দিয়েছে, সে বিবরণ শুনেই সে মত দিয়েছে। অঞ্জন নাকি সে ফ্ল্যাট বিশেষ কমদামে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। যেহেতু প্রোমোটার তার বন্ধু। সবই ঠিক। আসলে মুকুলের এভাবে জানাটা ঠিক হয়নি। হয়তো সম্মানে লাগছে। কিন্তু সে যাই হোক, মুকুলের অধীনস্থ সে নয়। মুকুলের ইচ্ছাধীনও সে নয়।

আইভি যখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে উঠছে তখন সিঁড়িতে গৌতমীর মুখোমুখি হল সে।

—আপনারা শ্মশানে গিয়েছিলেন?

—কে বলল তোমায়?

—ছাত থেকে দেখছিলাম। ভালই লাগছিল দেখতে।

—কদিন পরই তো ডাক্তারের জন্মদিন। তদারকি করতে গিয়েছিলাম।

—এসব তো আপনিই করতেন। এবার ডক্টর বোসেরও খুব উৎসাহ দেখছি।

—সেরকম ঠিক নয়। তবে এবার আর আমার দায়িত্ব নয়। এবার ওই প্রধান বক্তা থাকবে। আমি বলেছি।

—উনি রাজি হয়েছেন? আগে তো এসব বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যে উনি থাকতেন না। অবশ্য আপনি বলেই রাজি করাতে পেরেছেন। আমি মেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর গ্রামে যে সেমিনার করেছিলাম তাতে ওনাকে দিয়ে কিছু বলাতে চেয়েছিলাম। পারিনি। অথচ উনি স্পেশালাইজড ডাক্তার।

—জানি না অবশ্য মুকুল শেষ পর্যন্ত ওর বাবার বিষয়ে বলবে কি না। ওকে বোঝা মুশকিল।

গৌতমী ঠোঁট ওল্টাল। ওর ভাবভঙ্গীতে কীরকম একটা অবজ্ঞার ভাব। দেখলেই মনে হয় কোনও মন নেই কাজে। ভেতরের কোনও তীব্র জ্বালা সে যেন ছড়াচ্ছে।

—ম্যাডামের ভক্ত ও খুব। আপনি বলবেন আর ও শুনবে না তাই কখনও হয়? গৌতমী বিদ্রূপ করল যেন।

আইভি গৌতমীর এই ধরনের কথায় খুব বিরক্ত হল। একেই মুকুলের ব্যবহারে সে মনমরা ছিল। তারপর গৌতমী যেন দিন দিন অসভ্য হয়ে উঠছে। আইভি বলল, একটা কাজ করতে পার তো। হসপিটালে, কিংবা সমিতিতে যার যার প্রতি তোমার যা অভিযোগ আছে তা লিখিত জানাবে। তখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নইলে এসব কথার কোনও অর্থ নেই। আইভির গলায় কাঠিন্য এল। সে গৌতমীর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল।

হঠাৎ গৌতমীর চোখে জল জমল। বড় বড় ফোঁটায় গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। আইভি বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেল। গৌতমীর হয়েছেটা কী? হসপিটালে চারদিকে লোকজন ঘুরছে। এই ভিড়ের মধ্যে সিন ক্রিয়েটের কী মানে আছে? গৌতমীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? গৌতমীর হাত ধরে তাকে নিজের ঘরে কেবিনে মতে নিয়ে আসে আইভি।

ঘরে ঢুকল গৌতমী। আইভি ওকে কিছুতে বসাতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেকেটে, শান্ত হয়ে, রুমালে মুখ মুছে নেমে গিয়েছিল গৌতমী। আইভি গৌতমীর কান্নার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেনি।

রাতে মুকুল এসেছিল। আইভি শান্ত ছিল। তার ব্যবহার এমনই ছিল যেন কিছুই হয়নি। মুকুলের চোখেমুখে অস্বস্তি ছিল। ওরা আগের মতো সামনাসামনি বসল। যথারীতি গ্লাসে গ্লাস ঠেকাল। এত চুপচাপ তারা কখনও বসেনি। মুকুলের একটা উদভ্রান্তের মতো ভাব ছিল। মুকুলকে সে আজ একেবারেই আশা করেনি। অঞ্জনের আসার পর থেকে মাত্র দুবার তারা একত্রে পান করেছে। নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। কিছুদিন ধরে মুকুলের সঙ্গে নিয়মিত কথোপকথনের পর তাদের মধ্যে যে সখ্যের ভাব গড়ে উঠেছিল তা যেন মুকুলই ভেঙে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা মুক্তেশের সম্পর্কে, অঞ্জনের সম্পর্কে আলোচনা করেছে। মুকুল যেমনভাবে খোলাখুলি জেনির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলত, সেভাবে হয়তো আইভি বলতে পারত না। তবু ওর প্রশ্নের উত্তরে, ওর কথার খোলা হাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে নিজের কথা কম বলেনি আইভি। কাজের দিকে, হসপিটাল ও সমিতির বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও অন্যান্য ব্যাপারে তারা বেশ কাছাকাছি এসেছিল। মুকুল যেহেতু হাসিঠাট্টা করতে পারত, নানাভাবে ভোলাতে পারত তাই কোনও বিশেষ ব্যাপারে আইভি ওর মতে মত না দিয়ে থাকতে পারত না। পরে হয়তো খুব রাগ হত। হয়তো অনুশোচনা হত। তবে মুকুল যে তার মতে একেবারেই চলত না এমনও নয়। আইভি মুকুলের হাতে সব ছেড়ে দিলেও কতগুলো ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল। কারণ মুকুলের থেকে সেগুলো হয়তো সে ভালই পারত। তবু মুকুলের হাতে সব দিতে চেয়েছে। দিয়েওছে।

মুক্তেশ জানত না মুকুল ফিরবে। মুক্তেশ জানত আইভিই তার উত্তরাধিকারী। মুক্তেশ একে একে তার জীবনের কথা তাকে জানিয়েছিল। তার উত্থানের পিছনে একটি সাঁওতাল ছেলের বঞ্চনার গল্প বলেছিল। কোথা থেকে মুক্তেশ খোঁজ পেয়েছিল তারা ভরতপুরের এদিককার লোক। বিদেশ থেকে ফিরে সেই ছেলেটির খোঁজে এসে এই ঠা ঠা মরুভূমির সন্ধান পায়। ছেলেটিকে পায় না, ছেলেটির মাকে পায় না। কিন্তু এই অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টির জায়গাকে আবিষ্কার করে। আইভি বুঝত মুক্তেশ কীভাবে চাইত মুকুল ভরতপুরে এসে থাকুক। হয়তো একারণেই মুকুলকে ডাক্তারি পড়ান। মৃত্যুর আগে মুক্তেশ যখন এইসব কথা বলত, আইভি ভাবত সে প্রাণপণে চেষ্টা করবে মুকুলকে ফিরিয়ে আনতে। কেননা মুকুল বেড়াতে হলেও ভরতপুরে আসত। মাঝে মাঝে তাকে চিঠি লিখত। রাহুল যেন দূরবর্তী হয়ে গিয়েছিল আরও। দিল্লি থেকে সে কখনও ফেরেনি।

মুক্তেশের মৃত্যুর পর আইভি তবু একবারের জন্যও চেষ্টা করেনি মুকুলকে আনার। ভরতপুরের হসপিটাল, সমিতি তখন সমস্তটাই আইভি-র। মুক্তেশের পর সবাই ম্যাডামকে চেনে। প্রথম প্রথম তার অসুবিধা হত, কিন্তু তারপরই তো সে হাল ধরে ফেলল। পরিচালনায় তার সুনামও কিছু কম হয়নি। বেশ কয়েক বছর চালানর পর যখন মুকুল ওদেশের পাট চুকিয়ে এসেছিল, তখন মুকুল যে সবকিছু দেখেশুনে বুঝে নিতে চেয়েছিল এমন নয়। আইভিই সরে দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হয়েছিল আজ নয় কাল এ লড়াই হবেই। মুখোমুখি তারা দুজন লড়াই করবে আর সকলে তা হাঁ করে দেখবে, তার থেকে সরে দাঁড়ানটাই বরঞ্চ সম্মানজনক। মুকুল প্রথমদিকে

চায়নি। মুকুলকে সব দিয়ে সে হাল্কাও হয়নি। প্রতিদিন যন্ত্রণা পেয়েছে। আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেছে। মুকুলও অবশ্য তাকে নতুন নতুন কাজে জড়িয়েছে। নানা নতুনত্ব এনেছে হসপিটালের। আখেরে কতটুকু লাভ হয়েছে আইভি বোঝেনি, তবু এইসব চমক লোকের চোখে পড়ার মতো বৈকি। এসব করার তার সামর্থ ছিল না। প্রয়োজনও বোধ করেনি। চোখের সামনে দেখেছে— যে লোকজন, যে কর্মচারিরা তার অনুগত ছিল তারা মুকুলের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে। লছমির মতো একআধজন তার পক্ষে রয়ে গেছে। তাও হয়তো বুধনের চাকরির জন্য।

আইভি অন্যমনস্ক ছিল বলে লক্ষ্য করেনি মুকুলের পানের মাত্রা আজ বেড়েই চলেছে। চোখ পড়লে বোতলটা টেবিল থেকে নামিয়ে রাখতে গেল সে। মুকুল বাধা দিল। আইভি ধমক দিল সামান্য। তারপর বলল, জান কলকাতা গিয়ে এটা একেবারে ছেড়ে দেব। ভরতপুরে এ ভূত ধরেছে, ভূত নামিয়ে চলে যাব।

—পারবে?

—আমার মনের জোর আছে। কতটুকুই বা খাই। খুব পারব। একবার দৃশ্যটা কল্পনা কর। বসেছি হয়তো গ্লাস নিয়ে। ভুলে হয়তো দরজা ভেজিয়ে রেখেছি। এখানকার স্বভাবটাতো। হঠাৎ অঞ্জন এসে দেখল। ওর তো ভিরমি খাবার অবস্থা হবে। আইভি হাসতে থাকল। মুকুল জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আইভি পরিস্থিতিটাকে সহজ করতে চায়।

—আমার সঙ্গে লড়বে নাকি মুকুল? কী মতিগতি বল দেখি তোমার।

—ক্ষমতা নেই ম্যাডাম। চিরকালই আমি অসহায়। তোমার হাতে অনেক বড় বড় সেনাপতি, আমি তো নিতান্ত তালপাতার সেপাই।

—এভাবে কথা বলছ কেন? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, তোমার, গৌতমীর? তোমাদের কাউকেই আমি আজকাল বুঝে উঠতে পারছি না। আজ আবার গৌতমী এমন ব্যবহার করল।

—ও তো চলে যাচ্ছে। আমিও রেজিগনেশন দিয়ে দিতে বলেছি। কাল পরশুর মধ্যেই নাকি দেবে।

—কই সেরকম তো কিছু বলল না আমায়। ও হয়তো ওই কারণেই কান্নাকাটি করছিল। তোমার সঙ্গে ওর যে কেন বনল না ভগবান জানে। অথচ আগে তোমাদের কত ভার ছিল। আমি তো অন্যরকম কিছু ভাবতাম।

—তুমি কেন, ও সেইরকমই ভাবত।

—ভালই তো হত মুকুল। গৌতমী আর তুমি বিয়ে করলে সমিতির হসপিটালের কত উন্নতি হত। একসঙ্গে থাকাটা জরুরি।

—সে তো তুমি থাকলেও হত। তুমি কি থাকতে চাইছ? সবাই সুবিধাবাদী।

—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে মন চাইছে না। আমি যাব বলে মনস্থির করে ফেলেছি। এরপর তো অন্যকোনও কথা হয় না। সুবিধাবাদী কিনা সে তো ভরতপুরের মানুষই বিচার করবে। এতবছরে এরজন্য নিজেকে তো নিঃশেষ করে দিলাম। এখন তো হসপিটাল বড় হয়ে গেছে। এই তো যাবার সময়।

—তুমি চলে গেলে হসপিটালের কত অসুবিধা হতে পারে বোঝ না? বাবার কাছ থেকে তো আমি দায়িত্ব নিইনি, তুমিই নিয়েছিলে। তাহলে এখানকার দায়িত্ব তোমারই। তুমি যদি চাও সব পোস্ট ছেড়ে দেব আমি।

—ছেলেমানুষি করছ। গৌতমী বলল তুমি নাকি আমার ভক্ত। তা শুনে ভাবলাম ব্যঙ্গ করছ, এখন দেখছি সত্যি সত্যিই তাই। মুকুল, এসব তুমি বোলো না। হসপিটালের সব কাজের ভার মুক্তেশের পর তোমার নেবারই কথা ছিল। আমি কেবল চালিয়ে দিচ্ছিলাম। তুমি তো সে গল্প জান না। শুনবে তুমি? আইভি প্রশ্রয় দেখায়।

—বলতে পার। তবে গল্পটার মরাল কী হবে বুঝতেই পারছি। যাই হোক, আমিও দায়িত্ব ছেড়ে দেব। আমার কী? আমার আদর্শটাদর্শ কিছু নেই। কোথাও থাকার জায়গা ছিল না, লোক ছিল না তাই এসেছিলাম। আমার চলে যেতে বাধা কী? যেখানে খুশি চলে যাব।

—আমারওতো তাই। তুমি তো সব জান। তবু মুক্তেশের ঘটনাটা শোন। এটা শুনলে অন্যরকম কিছু ভাবতেও তো পার। মুক্তেশের সম্পর্কে তুমি আর আগের মতো কঠোর নও। মন তো গলছে।

—বাবার কথা ছাড়। বাবা তো আর আমাদের মধ্যে আসছে না। তোমার কি মনে হয় না আমাদের দুজনকার অতীতটা একরকম? মনে হয় না এ কারণেই আমরা মিলতে পারি। শুধু এ কারণেই।

আইভির মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মুকুলের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেছে। অন্য দিন তো এতটা খায় না। পুরো বোতল শেষ করেছে। আলফাল বকছে সে। মুকুলকে মাতাল হতে কখনও দেখেনি। আইভি বলল : ঢের হয়েছে, তুমি শুতে যাও মুকুল। আইভি উঠল। মুকুলকে নানাভাবে ওঠানর চেষ্টা করছে। ও উঠছে না। আর যাই হোক মুকুলকে তো টেনে হিঁচড়ে বের করা যায় না। আইভি বিব্রত হয়ে তাকিয়ে ছিল মুকুলের দিকে।

মুকুল সমানে বকেই যাচ্ছিল। আরে মুক্তেশ বোসের কী যাদু ছিল? ও একটা আত্মকেন্দ্রিক লোক। তোমাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে, তোমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে খাটিয়ে নিল। আর তুমি তার নামে এখনও পর্যন্ত বিগলিত হও। প্রেমে মজে গেলে। তোমাকে ও বিয়ে করেছিল? কী দিয়েছিল তোমাকে? কতদিন মাইনে দেয়নি। তুমি মনেও রাখনি। যখন বাইরে থাকত, একের পর এক চিঠি লিখেছ। নিজেকে তো পায়ে নিবেদন করেছিলে! ও তোমায় এতটুকু কিছু দিয়েছিল? সুযোগ নিয়ে খাটিয়ে নিয়েছে।

আইভির সমস্ত শরীর জ্বলছিল। জানলার পাল্লা শক্ত করে ধরে সে দাঁড়িয়েছিল। মুকুল এসব জানল কী করে? কখনও তো আইভি বলেনি। তবে কি মুকুল পুরনো সব কাগজপত্র ঘেঁটেছে। সব হিসেবপত্র? মুক্তেশের টাকা প্রায়ই শেষ হয়ে যেত। অনেকসময়ই তাকে মাইনে দিতে পারত না। সেসব কদিন কমাস হিসাব করেও সে দেখেনি। বস্তুত এই যে ফ্ল্যাটের টাকা সে দিতে পারছে তা একান্তই মুক্তেশের মৃত্যুর পর থেকে জমিয়ে তোলা।

আর চিঠি? দিল্লিতে অনেকদিন থাকাকালীন আইভি যে চিঠি লিখেছিল তা মুকুলের কাছে গেল কেমন করে? ঠিকই কোনও কোনও সময় আইভি নিজেকে স্থির রাখতে পারত না। মুক্তেশের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাইত। মুক্তেশ চিঠির উত্তর দিত না এমন নয়। তবে সে চিঠিতে তার আকুলতার কোনও প্রত্যুত্তর থাকত না।

—মুকুল, তুমি কী বলছ তুমি নিজেই জান না। ঘরে যাও মুকুল। এসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, যখন তুমি সুস্থ থাকবে।

—না, আমি যাব না। আমাকে কোনও কথা বলতে দাও না কেন? শোন, আজ তোমাকে শুনতেই হবে।

আইভির গলার স্বর আর্ত লাগল। সে মুকুলের বাহুতে হাত ঠেকাল। যাও মুকুল, কাল তোমার কথা শুনব। অনেক রাত হয়েছে। আমাকে তো ঘুমোতে হবে।

ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ফেলে দিল মুকুল। যাব না, এইখানে থাকব আমি সারা রাত।

সেই মুহূর্তে আইভির অসহায়তাকে খান খান করে ফোন বাজল। নিশ্চয় অঞ্জনের ফোন। সামান্য সময় নিল মুকুল যদি চলে যায়। মুকুল ঠায় বসে আছে।

ফোন ধরল আইভি। উত্তেজনায় সে প্রায় কাঁপছে। অঞ্জনের ওপাশে আর্দ্র স্বর। অঞ্জন ফ্ল্যাটের কথা বলছে, গল্প করতে চাইছে। আজকাল প্রতিদিন আইভি এটার জন্যই অপেক্ষা করে। মুকুল তারদিকে আরক্ত চোখে স্থির তাকিয়ে আছে। সে কথা বলবে কী, কথা শোনাই মুশকিল। তবু খানিকক্ষণ ফোন ধরে থাকল। তারপর বলল, একটু পরে ফোন করবে, এখন ব্যস্ত আছি। কোরো কিন্তু প্লিজ। আমি জেগে থাকব।

অঞ্জন বোকার মতো জিজ্ঞেস করছে ঘরে কেউ আছে কিনা। আইভি মুকুলের নাম করা মাত্র সে মুকুলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। আইভি সংকটে পড়ল। তবু মুকুলকে দিতে চাইল ও। মুকুল কিছুতেই কথা বলবে না। আইভি বানাতে পারছিল না উত্তর কী দেবে।

এরমধ্যে মুকুল তার হাতের কাঁচের গ্লাসটা জানলা দিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আছড়ে ভাঙার শব্দটা আইভির কানে প্রবল আঘাত আকারে এলে সে ফোনটা নামিয়ে রাখে।

এরপর আইভি কিছুক্ষণ মুকুলের সামনে দাঁড়ায়। নিজের চোখ প্রাণপণে মেলে আছে মুকুল। আইভি ইচ্ছে করলে লোক দিয়ে মুকুলকে ঘরে পাঠাতে পারে। মুকুল বলেই তা সম্ভব নয়। এতে দুপক্ষেরই বদনাম।

মুকুল বলতে থাকে—একটা গান গাও না। হাবিজাবি সকলের কাছে তো গাইতে। গাও না একটা। মিস্টার সোমকে গান শুনিয়ে ভুলিয়ে দিলে। আমিই কিছু জানলাম না। ভেরি ব্যাড লাক।

আইভি এইকথার পর মুকুলকে ড্রইংরুমে বসিয়ে নিজে বেডরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

আইভির নিজের মাথা ঘুরছে। মুকুল হয়তো খানিকপর ঘুমিয়ে পড়বে। তবু যতক্ষণ না ও শান্ত হয় ততক্ষণ ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। বিছানার ওপর বসে চাদরটাকেই সে মুঠো করে ধরল। কিছুই ভাবতে পারছিল না সে। মাথা কাজ করছিল না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আবার ফোন বিকট আওয়াজ করে বেজেছিল। আইভি ভয়ে ভয়ে দরজা ফাঁক করেছিল। না কোনও ভয় নেই। সোফার ওপরে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে মুকুল।

অঞ্জনের ফোন ধরে আইভির গলা ভেঙে এসেছিল। শুধু বলেছিল, যত তাড়াতাড়ি পার ব্যবস্থা কর। আমি এখান থেকে চলে যাব।

এরপর মুকুলের ভারী শরীরটা সোফায় শুইয়ে দিতে দিতে, ওর চশমা খুলে রাখতে রাখতে, কে জানে কোনও অজানা কারণে আইভির চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। মুকুলের কপালে সেই জলের ফোঁটা পড়েছিল। কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে এ সে বুঝতে পারছিল না। মুকুল যা বলছে সে কি মদের ঘোরে, নাকি সত্যি? মুক্তেশকে লেখা চিঠি সে কোথায় পেল? মুক্তেশ কি সত্যিই তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করেছে? যাকে সে এতদিন আঁকড়ে ছিল? তার কি কোথাও আইভির প্রতি এতটুকু ভালবাসা ছিল না? নাকি তা জানাবার উপায় ছিল না। আইভি দ্বিতীয় মতটাকেই বিশ্বাস করেছে। আজ মুকুল বলতে চাইছে সত্যিই যদি মুক্তেশ তাকে ভালবাসত তাহলে বিয়ে করত।

সকালবেলায় যখন আইভি বিছানা ছাড়ল তখনও মুকুল ওঠেনি। মুকুলকে উঠেই যাতে আইভির মুখোমুখি না হতে হয় সেকারণে সে সাততাড়াতাড়ি ড্রেস করে নিজের অফিসে গিয়ে বসেছিল। নিজের ছেঁড়া ছেঁড়া মনটাকে গুছিয়ে এনে সে কাজ করছিল। বাবার আগে সবকিছু কাজ গুছিয়ে আনতে হবে। ভরতপুর তৈরির মোটামুটি একটা ইতিহাস লিখতে হবে তাকে। মুকুল মুক্তেশের কথা শুনতে চাইছে না। তবু ওর ইতিহাসটুকু মুকুলকে জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য। সেটুকুও লিখে ফেলে মুকুলের উদ্দেশ্যে রেখে যাবে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। আচ্ছা ভরতপুরের ইতিহাসেও কি এইকথাটা লেখা চলে। এই ঘটনাটা নিয়ে মুক্তেশের বড় সংকোচ ছিল, দ্বিধা ছিল। আইভিকে সে কেবল এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছিল। সে কথা কি ইতিহাসে লিখে রাখা একান্তই প্রয়োজনীয়? কিন্তু সেটাই তো আসল। মুক্তেশের মনে যে কারণে সাঁওতালদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগে। আইভি বেশ বুঝতে পারে মুকুলও বোধহয় থাকবে না। ও না থাকলে সবকিছু নষ্ট হতে বেশি সময় লাগবে না। আইভির বারবার মনে হয়েছে মুক্তেশের অতীত জানলে মুকুল কাজ করার প্রেরণা পাবে। ভরতপুর ছেড়ে যেতে বিবেকের দংশন বোধ করবে। মুকুলের ইচ্ছা এটা বই করে প্রচার করবে। কিন্তু আইভি সে কারণে এ কাজ করছে না। মুক্তেশের জন্যও নয়। ভরতপুরকে বাঁচানোর জন্যই, মুকুলকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ফেলার জন্যই এই বই। কিন্তু এ ইতিহাস পাপের ইতিহাস, প্রতারণার ইতিহাস। মুক্তেশের বংশকে তা ছোট করবে। তবু আইভি কম্পিউটারে টাইপ করে—

মেদিনীপুর অঞ্চলে অনেক নীলকুঠি ছিল। স্বাধীনতার পরও কোনও কোনও অঞ্চলে সাহেব থেকে গিয়েছিল। তারা যখন দেশে ফিরেছিল তখন তাদের অনুগত কাউকে কাউকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিল। এরকমই এক সাঁওতাল মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে সেই কুঠিতে থাকত। অনেকগুলো ঘর ছিল তাদের। যদিও সেসব ভগ্ন প্রায় ছিল। অনেক জমি ছিল তাদের। সবটাই জঙ্গলাকীর্ণ। সামান্য অংশ পরিষ্কার করে তারা চাষ করছিল। সাহেবদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলে গ্রামের আর সব মানুষ তাদের হেয় করত। তাদের সমাজেও এই দুটি মহিলার কোনও স্থান ছিল না।

মুক্তেশ বোসের বাবা হরেন বোস একদিন এদের সন্ধান পায়। অল্পবয়সী মেয়েটির সে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তার গর্ভে তার একটি সন্তানও হয়। হরেন বোস সব জমিজমা অধিকার করে। জমি তৈরি করে। মামলামকদ্দমা করে এদের নামে বহু জমি সে উদ্ধার করে। তারপর সবই একে একে তারই অধীনস্থ হয়।

হরেন বোসের বাড়িতে স্ত্রী ছিল, শিশুপুত্র মুক্তেশ ছিল। তবু এই সাঁওতাল রক্ষিতার কল্যাণে তার এত বাড়বাড়ন্ত ছিল। তারা অবশ্য কেউ তাদের ঘরে আসতে পারত না। সেই সাঁওতাল ছেলে লেখাপড়াও শেখেনি। ইস্কুলেও ভর্তি হয়নি। ছোটবেলায় মুক্তেশ এসব কথা শোনেনি তা নয়। তবে তখন গ্রামে এই রক্ষিতা রাখা এতই স্বাভাবিক ছিল যে নিন্দার কিছু মনেও হত না। যেটুকু নিন্দাবাদ ছিল সেটুকু সম্পত্তি পাবার দরুন। অন্য কারণে নয়। এমনকি মুক্তেশ কোনও দিন তার মাকেও প্রতিবাদ করতে দেখেনি।

মুক্তেশ ডাক্তারি পড়ার পর গ্রামে ফিরে এলে তার বাবা তাকে বিদেশ পাঠাতে চাইলেন। মুক্তেশই ছিল তার বাবার একমাত্র গর্বের বস্তু। সাঁওতাল মহিলার সম্পত্তি আগ্রাসনের জন্য তার যে বদনাম হয়েছিল সেটুকু কেটে যাবে ছেলে বিলেতফেরত ডাক্তার হলে।

ওই মুহূর্তে মুক্তেশ স্কলারশিপ জোগাড় করতে পারেনি। সেইসব সম্পত্তি বিক্রি করে হরেন বোস ছেলেকে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছিল। মুক্তেশের সেই সময়ও কিছু মনে হয়নি। সবই যেন স্বাভাবিক লেগেছিল। কিন্তু যখন সে ফিরে এল পাশ করে, তখন তার বাবাও মারা গেছেন, মা বিশাল ঘর আগলে বসে আছেন, সেই সময় মুক্তেশ আবিষ্কার করেছিল তারা নেই। তারা অর্থাৎ সেই সাঁওতাল মহিলা আর তার সেই সন্তান, হরেন বোসের অবাঞ্ছিত পুত্র কোথাও নেই। খবর পেয়েছিল তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পুরনো বাড়িগুলোতে তখন ভাড়া বসেছে।

মুক্তেশ হঠাৎ যেন সচেতন হয়েছিল। তার সমস্ত ডিগ্রি ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছিল। সে হঠাৎ উপলব্ধি করেছিল এইসমস্ত টাকাপয়সা পুরোপুরি ছিল ওদের। ওই ছেলেও তো তার মতো হতে পারত! আর সে ওর মতো। গর্ভের বদল কেবল। তাতেই ভাগ্য এত বদলে যায়!

ওদের খুঁজতে বের হয়েছিল মুক্তেশ। বাবা তার জন্য সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কলকাতায় বাড়ি কিনেছিলেন। ডিসপেনসারি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এমনকি অনাগত নাতি নাতনিদের জন্য টাকা রেখে গিয়েছিলেন। মুক্তেশের পাত্রী ঠিক করে গিয়েছিলেন। মুক্তেশ এসব ছেড়ে তাদের খোঁজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিল। বাংলা ছাড়াও বাংলা সংলগ্ন বিহার উড়িষ্যার একটা সাঁওতাল গ্রামও সে বাদ দেয়নি। কিন্তু এ বিশাল পৃথিবীতে তাদের পাবে কোথায়?

ওদের খুঁজতে এসেই ভরতপুরকে পেয়ে গিয়েছিল মুক্তেশ। তার এই গোপন ক্ষতে সে প্রলেপ দিতে চেয়েছিল সাঁওতালদের সেবা করে। সন্তানদের মানুষ করার প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে বাকি সব দিয়েই তৈরি করেছিল এই হাসপাতাল। ওদের উন্নতির জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছিল। মুক্তেশ তাঁর বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল। সমস্ত জীবন দিয়ে প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়েছিল।

এই পর্যন্ত লিখে আইভি থামে। ভাবতে থাকে সে, মুক্তেশের মাহাত্ম্য এই ঘটনায় বাড়বে না কমবে। ভাবে প্রতারণা তো মানুষের জীবনে ঘটতেই পারে। কিন্তু সেই ঘটনা যখন তাকে বা অন্যকে দিলে ফেলে, জীবনকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে শেখায় তখনই তো তাতে মঙ্গল হয়। হরেন বোসের প্রতারণার জবাবে মুক্তেশ জীবনকে বদলে ফেলেছিল। সেখানে তাই মুক্তেশের কোনও পাপ লাগেনি। এটা বরঞ্চ তার সদর্থকতার দিক। মুকুলের এই কথা জানা দরকার। সকলকে জানান দরকার।

আইভি মুকুলকে দেখতে গিয়েছিল। তার ঘর থেকে মুকুল তখন উঠে গেছে। নিজের ঘরে চলে গেছে ও। আইভি ও'র ফাঁকা অফিসে এসে দাঁড়ায়। মুকুল খুবই গোছান। আইভি ওর দেওয়া রেজিগনেশন লেটারটা খুঁজতে থাকে। ওটা এখন না দিয়ে পরে দিলেই ভাল হত। মিছিমিছি এত ঝামেলা হত না। যাবার আগের মুহূর্তে দেওয়াটাই কাজের কাজ হত। তাছাড়া অঞ্জন দেরি হবে বলছে ফ্ল্যাট পেতে। চিঠিটা খুঁজে পায় না আইভি। বদলে গৌতমীর একটা চিঠি খুঁজে পায়। ব্যক্তিগত কিছু নয়। শোকজের জবাব। গৌতমী কি ওষুধপত্র সরিয়েছিল নাকি? আইভি অবাক হয়ে যায়। কিছুদিন সে সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে এত কিছু ঘটে গেছে? কিন্তু মুকুল এ বিষয়ে তাকে কিছু জানায়নি কেন? তবে কি মুকুলই এ ঘটনা ঘটিয়েছে গৌতমীর চলে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করতে?

আইভি গৌতমীর উত্তর পড়তে থাকে। খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে গৌতমী। একে একে মুকুলের সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সে। ওষুধ সে নিয়েছে ঠিকই, তবে হসপিটালের কাজে। সে কোনও গোলমালই করেনি। কোনও শৃঙ্খলার এদিক ওদিক করেনি। তার যথাযথ যুক্তি দিয়েছে।

মুকুলের নিজের অফিসে ঢুকতে ইতস্তত করার কথা ছিল না। তবু সামান্য বিচলিত দেখাচ্ছিল ওকে। আর সেই বিচলন কাটানর জন্য সে আইভির সঙ্গে স্বভাবমত পরিহাস করার চেষ্টা করে। কী জিনিস চুরি করতে এসেছ ম্যাডাম?

আইভি গত রাত্রের ঘটনার জন্য মুকুলকে ক্ষমা করে দেবে ভেবেছিল। তবু এই কথাটাতে সে জ্বলে উঠল। সে গৌতমীর চিঠিটা তুলে ধরে বলে— এ বিষয়টা আমাকে জানাওনি কেন? এত বড় একটা ঘটনা ঘটল তুমি আমাকে সামান্যতম জানালে না? ব্যাপারটা তোমার বানানো নয় তো মুকুল? আইভি অপ্রিয় কথাটা না বলে পারল না।

মুকুল ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ও চান করে এসেছিল। ওর ভিজে চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান ছিল। শ্যাম্পু সাবান আর কাপড়ের মাড়ের গন্ধ ছিল ওর গায়ে। ও আইভির দিকে তাকাচ্ছিল না। ড্রয়ার খুলে কতগুলো কাগজপত্র বের করছিল ও। যেন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি আইভির কাছে প্রমাণ দাখিল করবে। কিন্তু কাগজগুলো খুঁজে পেয়েও সেগুলোতে হাত চাপা দিয়েছিল মুকুল। মুখ না তুলেই বলেছিল : বলে বা দেখিয়ে কী লাভ বল? ঘোর অবিশ্বাস আর ঘেন্না নিয়েই তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। তাই না? আর সত্যি বলতে কী এ কারণেই তোমাকে বলিনি। গৌতমী যে হসপিটালের পক্ষে ক্যানসারাস হয়ে দাঁড়িয়েছে এ কথা তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারতাম না।

আইভি উত্যক্ত বোধ করছিল। টেবিলের ওপরে হাতের কাগজটা

রেখেছিল। বলল, নাটক কোরো না মুকুল। তোমার নিশ্চয় এখন ঘোর কেটে গেছে। নেশার ঘোরে এসব কথা বলছ না তো?

মুকুল টেবিলের ওপর আঙুল দিয়েই আঁকিবুকি কাটছিল। মুখ তুলল এই কথা শুনে। চানটান করে আসার ফলে ওর মুখে এক ধরনের পবিত্রতা ছিল। মুখ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না করে সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল : বেশ না হয় নাটক করলাম। মাতালই হলাম। কিন্তু তুমি তো নেশাগ্রস্ত হওনি। মিস্টার সোম আসার পর সব কাজ থেকে তোমার মন উঠে গেল কেন? কাজকর্ম করলে তো ব্যাপারটা তোমার চোখেই ধরা পড়ত।

মুকুল যেন ঠাস করে চড় মারল আইভিকে। তবু সে হারল না। বলল, আমি তো চলে যাচ্ছি। তুমিই এখানকার সব। এত কথা বল, এত কথা জান, আর এটুকু সংবাদ দিতে পারলে না। এতেই আমি অবাক হয়েছি। আইভি ওর অফিস ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।

মুকুল পিছন থেকে ডাকল। আচ্ছা তুমি কবে যাচ্ছ ম্যাডাম? রাতে ফের ফোন এসেছিল?

আইভি মুহূর্তখানেক দাঁড়াল। ভাবল একবার উত্তর দেয়। তারপর কোনও কথা না বলেই সে বের হয়ে এল।

গৌতমীকে এরপর সে ডেকেছিল। তার আগে নিজেকে শান্ত করতে হয়েছিল আইভিকে। গৌতমীকে সে জেরা করবে ভেবেছিল। অপরাধ বুঝতে পারলে তিরস্কার করবে ভেবেছিল। কাগজপত্র ঘেঁটে সে পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে চাইছিল। গৌতমীর অপরাধের ভাগিদার হওয়াতে স্টোরের এক সাঁওতাল কর্মীওও চাকরি খেয়েছে মুকুল। সে বেচারাও আইভির কাছে এসে কান্নাকাটি করেছে। গতকালই মুকুল এত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারপর রাতে তার কাছে গিয়ে মাতলামি করেছে। তবু এসব ব্যাপার এতটুকুও জানায়নি তাকে। উল্টে আইভিকেই দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছে। সে কিছুদিন যাবৎ কাজকর্ম দেখত না সেই সুযোগেই ও যা খুশি তাই করেছে।

গৌতমী এসেছিল তার কাছে। ও যেন আবার আগের মতো। আইভির সামনে বসে রেজিগনেশন লেটার টাইপ করল, হাসি মুখে তার দিকে চিঠিটা ধরল। আইভি আবেগহীন গলায় একে একে প্রশ্ন করে গেল। অধিকাংশ প্রশ্নই এড়িয়ে গেল গৌতমী। শেষমেষ আইভি যখন ওর চিঠিটা হাতে নিল তখন গৌতমী বলল আর আমাকে দয়া করে হসপিটালের বিষয়ে কিছু বলবেন না। এখন আমি শুধু আপনার পরিচিত। বন্ধুও বলতে পারেন। কয়েকটা কথা বলার অধিকার দিন।

ওর বলার ধরনে আইভি সোজা হয়ে বসেছিল। বলেছিল রেজিগনেশন লেটার নিলাম ঠিকই, কিন্তু গ্রাহ্য হচ্ছে কিনা তার জন্য অন্তত একদিন অপেক্ষা করতে হবে। মুকুল নিশ্চয় সব জানে।

—সব জানেন না। তবে অনেকটাই জানেন। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি তো জানেন আমি ছেড়ে দিতে চাইছি। কালই আমার ট্রেন। ঘরে গিয়ে দেখবেন চলুন সব প্যাক করা হয়ে গেছে। অবশ্য নিজের বলতে কতটুকু আর জিনিস। বাকি সব লছমিদের নিয়ে যেতে বলেছি।

—লছমির সঙ্গে শেষের দিকে তোমার খুব ভাব হয়েছিল তাই না? একসময় আমার কাছে ও সারাদিন থাকত।

—লছমি এবার বিয়ে করতে পারবে। কোলিয়ারির এক কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে বুধনের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

কথাটা আইভিকে আঘাত করল। বুধনের চাকরিটার কথা তার মাথায় ছিল না এমন নয়। তবে নানা কারণে তা করে ওঠা হল না। নিজেরই চলে যাবার দিকে মন। সত্যি হসপিটালের থেকে তার মন যে কোন সময়ে উঠে গেল তা নিজেও ঠিকঠাক ধরতে পারল না। বুধনের জন্য কিছু সে করতে পারল না। হয়তো আইভি কিছু করবে না ভেবেই লছমি গৌতমীকে ধরেছিল। কিন্তু গৌতমী কত দিকে জাল ছড়িয়েছিল?

আইভি বলল, তাহলে বিয়ে সব ঠিক নিশ্চয়। আমাদের জানাবে তো সব খবর।

সে তো ওখানে গিয়ে দেখার। আসলে এত দিন এই জায়গাটা নিয়ে পড়ে থাকলাম। বৃথা মনে হয়নি কখনও। আজ হয়। এসব কাজ এমনই কাজ যে নিজের কথা ভাবতে বড় দেরি করিয়ে দেয়।

আইভি পেপার ওয়েট নিয়ে খেলার ভান করছিল। গৌতমী কি সে কারণে যাচ্ছে? অথচ মুকুলের ওপর যে ওর সাঙ্ঘাতিক রাগ সেরকম কিছু এই মুহূর্তে প্রকাশও করছে না। আইভিকেই বলতে হল : মুকুলের ব্যবহারে তুমি নিশ্চয় অনেক আঘাত পেয়েছ গৌতমী। হসপিটালের পক্ষ থেকে আমি না হয় তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি। আমি তো ব্যাপারটার মীমাংসা করতে পারিনি। তোমার মত কেউ হসপিটাল ছেড়ে চলে যাক এটা আমি কখনও চাইনি। বিশ্বাস কর।

ম্লান হাসি হাসল গৌতমী। বিশ্বাস করছি ম্যাডাম। আমি অনুভব করতাম আমার প্রতি আপনার দৃষ্টি আছে। আমিও আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতাম প্রতিটি কাজের বিষয়ে। আপনিও নিশ্চয় তা মানবেন। কিন্তু আর কাজের কথা কেন? ম্যাডাম, এবার আমার একটা কথার জবাব দেবেন—আপনি এখান থেকে চলে যেতে চাইছেন কেন?

আইভি ভাবল একবার বলে, তুমি যে কারণে চাইছ, আমিও সেই কারণেই চাইছি। তুমি বিয়ে করবে, ঘরসংসার করবে। আমি হয়তো ঠিক সেরকমটা করব না। তবে আমিও তার স্বাদ পাব, গন্ধ পাব। ভাবল বলে, ফের প্রেমে পড়ে গেছি। এই বয়সেও যে আকর্ষণ এত তীব্র হয় আমি জানতাম না। বদলে আইভি মৃদু হাসতে লাগল। আইভি সহজ হচ্ছিল। ওর চোখে রহস্যও খেলা করছিল। বলছিল তোমার মতো একটা শুভ ঘটনা নিশ্চয় আমার ঘটছে না। আসলে একটা চেঞ্জ আমার দরকার। ওখানে তো পুরনো লোকজন, আত্মীয়স্বজন আছে। তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আবার মনে হচ্ছে খুঁজে পাব। মানে চেষ্টা করব। এখানে ভাল লাগছে না। তুমি তো বোঝ সব।

—আপনাকে নয়, আপনার মুকুলকে একটু বুঝি ম্যাডাম।

আইভির ভ্রূ সামান্য কোঁচকাল। গৌতমী এখনও আপনার মুকুল, আপনার মুকুল করে যাচ্ছে। বলল মুকুল শুধু আমার নয়, তোমারও, এই হসপিটালেরও। তবে তোমার সঙ্গে তো খুবই ঘনিষ্ঠতা দেখেছি। তুমি চলে যাচ্ছ বলেই বলছি আমি তো অন্যরকম কিছু ঘটবে আশা করেছিলাম।

মুখটা থমথমে দেখাল গৌতমীর। আইভি ঠিক এমনটাই চেয়েছিল। এভাবেই বিদ্ধ করতে। গৌতমী যেন ভুস করে উঠে আসছিল। জলের শ্যাওলা সরিয়ে সরিয়ে, অবাঞ্ছিত যা কিছু তা দূরে ঠেলে গৌতমী নিজেকে প্রস্তুত করছিল। আইভিকে স্তম্ভিত করে সে বলছিল :

—সেরকমই তো হবার কথা ছিল। আপনি তো দেখেছেন। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করেছি। বারবার চিঠি লিখেছি এখানে চলে আসার জন্য। এখানে দায়িত্ব নেবার জন্য। ওর অনেক কুণ্ঠা ছিল তবু সে সব ভেঙে উনি এসেছিলেন। অন্তত আমাকে তাই বলেছিলেন। গৌতমী থামল। সময় নিল খানিকক্ষণ।

আইভি বলল তারপর?

—তারপর আবার কী? মুখে একটা তেরচা হাসি ঝুলিয়ে রাখল গৌতমী। আইভির চোখে চোখ রেখেই বলল, তারপর একদিন শুনলাম—ও ম্যাডামকে চায়!

আইভি জোর ধাক্কা খেল। তবু নিজেকে স্থির রাখল। গৌতমীর চোখ থেকে চোখ সরিয়েও নিল না। গলাকে নামিয়ে বলল তোমার কি এটাকে অসম্ভব বলে মনে হয় না? এটা একটা সাঙ্ঘাতিক ইয়ার্কি!

—আমিও এমনই ভেবেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখলাম আমি যা ভেবেছি তা ভুল।

—তুমি তো জান, ওর সঙ্গে আমার কত ঝামেলা হয়েছে, কত সংঘাত। তারপরে এটা কী করে সম্ভব? এসব অ্যাবসার্ড তুমিও বিশ্বাস করলে? সামান্য উত্তেজিত লাগল আইভিকে।

—আপনাকে উনি কিছু বলেননি? যদিও খুব এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—মুকুলের সঙ্গে আমার এরকম সম্পর্ক নয়। হবার কথাও নয়। এটুকু তুমি জেনে রাখ গৌতমী। তোমাকে সরিয়ে দেবার জন্যই ও এসব বানিয়েছে।

গৌতমী নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। ওর মুখটায় বিষাদ মাখান ছিল। তবু ও হাসি ফোটাচ্ছিল। আপনাকে যদি ডক্টর বোস কিছু না বলে থাকেন তবে আমিই বলি। এটা আমার বানানো নয়। ওনার কাছ থেকেই শোনা। জানেনই তো উনি কেমন খোলামেলা। আপনাকে নিয়ে, মুক্তেশ বোসকে নিয়ে উনি অনেক গল্পই করেছেন।

আইভি সোজা হয়ে বসল। ভেতরটায় রক্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল সে—

ডক্টর বোস তো আপনার জন্যই ওনাকে মানে মুক্তেশ বোসকে সহ্য করতে পারতেন না। আমাকে বলেছিলেন যে ওনার বাবাও সে কথা জানতেন। সে কারণে ওনার কাছ থেকে আপনাকে সব সময় আড়াল করে রাখতেন। ডক্টর বোসের চিরকালই আপনাকে পছন্দ ছিল।

আইভির চোখমুখ জ্বলছিল। সে বলল, মিথ্যে কথা! ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা! ডাক্তারকেও এর মধ্যে জড়াল—আমি তো ভাবতেই পারছি না। দাঁড়াও আমি মুকুলকে ডাকি। আইভি উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছিল। উঠে দাঁড়িয়েছিল মুকুলকে কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠাবার জন্য।

গৌতমী ওর হাত ধরে ফেলেছিল। ছলছল করে উঠেছিল ওর চোখ। শান্ত হোন ম্যাডাম। আমার অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি চলে

গেলে বলবেন। আমি ওনার সামনাসামনি যেতে চাই না—কেন এটা বুঝছেন না। গৌতমীর গলায় কাতর ভিক্ষা ছিল। আইভি বসে পড়ল।

—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, উনি অস্বীকার করবেন না। এটুকু অন্তত আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু ম্যাডাম, আমার ওপর আপনি রাগ করবেন না। মাঝে মাঝে আপনাকে ভুল বুঝিনি এমন নয়। ভেবেছি আপনি ওকে সরিয়ে নিচ্ছেন। পরে ভেবে দেখেছি এ ঠিক নয়।

আইভি মাথা নিচু করে বসেছিল। এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন ওর কানে কিছুই ঢুকছে না। গৌতমী তবু বলছিল, ম্যাডাম, এটা সত্যি আমি ওনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম। উনি তো ভালবাসার মতোই মানুষ। জেনি ওকে কত কষ্ট দিয়েছে জানেন তো। আপনি আর নাইবা গেলেন। ও একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

আইভি মুখ তুলল। গৌতমী বুঝতে পারল না সত্যি সত্যি আইভির কানে কিছু ঢুকেছে কিনা। আইভির মুখ ফ্যাকাশে লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন এ জগতে নেই। যদিও পেপারওয়েটটা সে ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। ম্যাডামকে চিরকালই ওপরওয়ালা হিসেবেই দেখেছে গৌতমী। যদিও অনেক সময়ই তার প্রতি সে আন্তরিক ছিল। তবু এই আইভিকে তার অন্যরকম লাগল। এই আইভিকে হয়তো মুকুল পেতে পারে! না পেলে গৌতমীর মতোই অবস্থা হবে তার। এরকম কেন হয়? গৌতমীও যে মুকুলের আকর্ষণের কথা শুনে তাজ্জব হয়নি এমন নয়। যখন মুকুলকে তার বিস্ময়ের কথা জানিয়েছিল, অসম্ভবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল মুকুল সামান্য লজ্জিতও হয়েছিল। তবু বলেছিল মানুষের যে কখন কী হয়! মানুষের সব আচরণের সমান ব্যাখ্যা চলে না। আর আমরা কেবল ব্যাখ্যা খুঁজে খুঁজে মরি।

গৌতমী বিদায় নিতে চাইল। আইভি যেন আবার আগেকার চেহারায় ফিরে এল। পোষাকি প্রসন্নতা নিয়ে এল মুখে। ঠিক আছে গৌতমী, মুকুলের সঙ্গে আমি কথা বলব। কিন্তু মনে রেখ মুকুল তোমাকে যে সব কথা বলেছে সে সব কিছুই ভুল হতে পারে।

প্রতিবাদস্বরূপ হাসতে গেল গৌতমী। আইভি গৌতমীর হাসিকে তোয়াক্কাও করল না। বলল, তুমি অনিতার কথাও বলেছিলে মনে আছে। অনিতার সঙ্গে মুকুলের সম্পর্কের গল্প বলেছিলে তুমি। ওটা কিন্তু ঠিক ছিল না। আমি সব দিক দিয়ে খতিয়েই দেখেছি।

গৌতমী কী একটা বলতে গেল। আইভি তাকে বলতে না দিয়েই বলল : তোমার সব কথাই আমি শুনলাম গৌতমী। কিন্তু মনে রেখ আমরা যা কিছু ভাবি তার মধ্যেও অনেক মিথ্যে থাকে, ভুল থাকে। কাজেই মনে হওয়ামাত্র মুখে তা প্রকাশ করে ফেলাটা কোনও কাজের কাজ হতে পারে না। আর তুমি চলে যাচ্ছ। বিয়েও করতে চলেছে। নিশ্চয় তোমার জীবন খুব সুন্দর হয়ে উঠবে। আর আমি যদি তোমার দিদির মতো হই তবে একটা উপদেশও দিই। কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে জড়িয়ে ফেল না। তাতে অনেক বিপদ হয়। সবটাই গণ্ডগোল হয়ে যায়।

গৌতমী চলে গেলেও আইভি বহুক্ষণ চুপ করে বসেছিল। গৌতমীর কাছে সে হার মানেনি। মুকুলের ব্যাপার নিয়ে তেমন রাগারাগিও করেনি। ভালই ট্যাকল করেছে সে। কিন্তু গৌতমীকে দেওয়া উপদেশটা তার নিজের কানেই যে খট করে লাগল। তাহলে সে নিজে কী করেছে এত দিন? নিজের জীবনে এ ঘটনা ঘটিয়েই যে সে বুঝেছে বড় ভুল হয়ে গেছে। জীবনটাকে যদি প্রথম থেকে পাওয়া যেত!

মুকুল আর যাই করুক ; মুকুল তাকে পাখিপড়ার মতো করে বলে বলে কয়েকটি কথা বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে। আইভি কত দিন তার চাহিদাগুলোকে ভুলে ছিল। আজ আইভি যে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে অনুভব করে তার শরীর আছে, মন আছে, এমনকি তার বয়সও ফুরিয়ে যায়নি—সে সবই কি মুকুলের জন্য?

আইভি ভাবে সেও কি মুকুলের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে আমেরিকান বনে গেল?

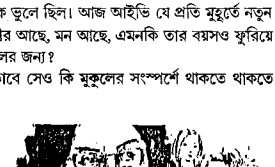

অঞ্জনের ফোন এসেছিল একেবারে মাঝরাতে। অসহায় লাগছিল ওর গলা। অনিতার নাকি বাচ্চা হয়ে গেছে। ওরা কাছের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই হয়েছে বলে অঞ্জন বা ইরা আসতেও পারেনি। ভালয় ভালয় সব চুকেবুকে গেছে এটা আনন্দের। কয়েকদিনের মধ্যে অনিতাকে ওরাই পাঠিয়ে দেবে কলকাতায়। নাতি হয়েছে অঞ্জনের। সমস্তই সুখের কথা। তবু অঞ্জনের গলা এরকম কেন? অঞ্জন বলে, কত আশা করে বসেছিলাম এই দিনগুলোর জন্য। ভরতপুরে তোমার সঙ্গে কয়েকদিন কাটাব—এই ইচ্ছা ছিল। বিধাতাই বোধহয় চাইলেন না।

আইভির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জন চলে যাওয়ার পর থেকে এই দিনটির জন্যই তার অপেক্ষা ছিল। সে মনে মনে এক এক করে দিন গুনত। কিন্তু অনিতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেন এ কাজ করল। এখানে এত যত্ন নিয়েছে মুকুল। হয়তো এখানে আনার সময়ও পায়নি। তবু দূর তো কিছুই নয়।

মুকুলকেও এ সংবাদ দিয়েছিল আইভি। অনিতার যে ভালয় ভালয় সব কিছু হয়ে গেছে এতে খুশি হয়েছিল মুকুল। খুশি হলেও সে আবার অনিতার বয়েস নিয়ে আলোচনা চালিয়েছিল। অঞ্জন কীভাবে এত কম বয়সে তার বিয়ে দিল ইত্যাদি সে বলেই যাচ্ছিল। আইভির এসব শোনার মতো মন ছিল না। মুকুলের কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল। অঞ্জন যাই হোক—ওর সম্পর্কে কোন সমালোচনা শুনতে ভাল লাগে না আইভির।

এত দিন অঞ্জনই ওকে ফোন করত। এবার আইভি শুরু করল। কেবলই তাড়া লাগান ফ্ল্যাটের জন্য। কখনও কখনও ইরাও ধরেছে তার ফোন। ফোনে উচ্ছ্বাসও দেখিয়েছে। বড় অবাক লেগেছে আইভির। একধরনের অপরাধবোধও যে হয়নি এমন নয়। ইরাকে নিশ্চয় সব কথা অঞ্জন বলেনি। ইরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে অনিতার যত্ন নেওয়ার জন্য। এসব ক্ষেত্রে আইভি যেমন মুকুলের কথা বলে, তেমনিই বলেছিল। মুকুলের সম্পর্কে ইরা অনেক কথাই জানে এমনটাই মনে হচ্ছিল। ইরা মুকুলের খুব প্রশংসা করছিল। এমনকি মুকুলকে একবারটি চোখের দেখা দেখার জন্য ভরতপুর পর্যন্ত সে আসতে রাজি এমনটাই জানিয়েছিল। অনিতা তাহলে তার মাকে এতটাই বলেছে। বেচারা! হয়তো সত্যি সত্যিই ওর জীবনে সুখ নেই। মুকুলকে ও হয়তো সত্যিই চায়। মুকুলের আচরণে হয়তো ভুল ইঙ্গিত পৌঁছেছে। যেমনটা ভেবেছিল গৌতমী।

গৌতমী চলে গেছে। ওর যাবার দিন স্টেশন পর্যন্ত গ্রামের প্রচুর লোক গিয়েছিল। গৌতমী এত মানুষকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল! মুকুল ওর এই ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানোকে অপছন্দ করত। তলে তলে হসপিটালের ওষুধ সরিয়ে সে গ্রামে দান-খয়রাত করত। গ্রামের সরল লোক কিছুই বুঝত না। মুকুল গৌতমীর সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল। এত কাণ্ডের পর শেষের দিন গৌতমীর সঙ্গে ভালই জুড়ে গিয়েছিল মুকুল। ঠিক আগের মতো। আইভিকে নিয়ে যাবার জন্যও টানাটানি করছিল। আইভি যায়নি। এসব তার ভাল লাগে না। মুকুল যে ন্যাকামো করতে পারে, আইভি তা পারে না।

ভরতপুরের সব কিছুই তার অসহ্য লাগছিল। কেবল সে অঞ্জনের ফোনের জন্যই বাঁচত। মুকুল আসত, যেত। কোনও অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারত না। মুকুলও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। আইভির কাছে এলে উল্টোপাল্টা কথা বলত না। অঞ্জনের কথা বলত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করত। উত্তর দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত আইভি। মুকুল মুক্তেশের কথাও বলত। কখনও প্রশ্ন থামিয়ে আইভিকেই শুধু দেখে যেত।

ফ্ল্যাট রেডি হবার সময় হয়ে এসেছিল। মুকুল তার যাবার বিরোধিতা খুব একটা না করলেও আইভির রেজিগনেশন নিয়ে মিটিং-এ ফাটিয়ে দিয়েছিল। আইভি প্রায় কোনও কাজই করে না, তবু গৌতমী চলে যাবার পর আইভির অভাব যে হসপিটালের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে তার জন্য মাথা খাটিয়ে বহু যুক্তি খাড়া করেছিল মুকুল। মুকুল এমনই আবেগতাড়িত হয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল, যে অন্য মেম্বাররা সহজেই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। সমস্ত হাওয়াটাই আইভির প্রতিকূলে গিয়েছিল। সেই সময় দমবন্ধ হয়ে আসছিল তার। আইভি নিজেও সব যুক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। অনুরোধ আবেদন নিবেদনের ঠেলায় রেজিগনেশন লেটার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। বদলে সে ছুটি পেয়েছিল। দীর্ঘ দু'মাসের ছুটি। ইচ্ছে হলে সে বাড়াতে পারে। তবু এখান থেকে কখনওই সে মুক্তি পাবে না। আজীবন সদস্য সে। আজীবন তাকে কারাগারে থাকতে হবে।

আইভি অঞ্জনকে সবই জানায়। অঞ্জনের যতটা সান্ত্বনাবাক্য সে শুনবে আশা করেছিল ততটা কিছুই সে বলে না। অঞ্জন অবশ্য একটা পরামর্শ দেয়। বলে, ছুটি নিয়ে তো চলে এস। তারপর নাইবা গেলে। যদি যাও, তো এরপর বেড়াতে যাবে।

কিন্তু আইভির যে আর বেড়াতে আসতেও ইচ্ছে করে না। কোন ফাঁকে যে মন এত বিকল হয়ে গেল। আইভি যাবার আয়োজন করে। ফ্ল্যাটের জন্য কল্পিত আসবাবের কথা ভাবে। অনেকটা টাকাই তার চলে গেল। এই টাকার কথা থেকে থেকে মুকুল বলে। বিরক্ত লাগে শুনতে। মুকুল তবু বলে যায়, ওখানে এখন কাজ পাওয়া আগের মতো সোজা নয়। এখানের চাকরিটা ছেড়ে

না। প্রতি মাসের একটা টাকার জোগান আসছে—এটা তো কম কথা নয়। তাছাড়া এই হসপিটাল তো তোমাকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাপয়সা দেয়নি যে তুমি বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে রেখেছ।

মুকুলের কথা তেমন করে কানেই নিচ্ছিল না আইভি। তার জীবনে বিলাসিতার বালাই নেই। মোটামুটি সবই হিসেবে তার আছে। মুকুলের এইসব কথা তাকে না যেতে দেবার ফন্দি ছাড়া কিছুই নয়। আইভি কিছুতেই কান দেয় না। মুকুলের সঙ্গে কথা বলাও সে বন্ধ করেছে।

যাবার আগের দিন মুকুল এল। সারা সন্ধ্যে মুকুল তার গোছান দেখতে লাগল। এইরকম কাজের সময় আইভির পক্ষে কারুর উপস্থিতিই কাম্য নয়। তবু মুকুল থাকবেই। কী নেবে আর কী নেবে না সেটা ভাবতেই সময় লাগছে। খালি হাতেই যাবে ভেবেছিল আইভি। তবু সামান্য লাগেজ তার হয়েই যাচ্ছে। নিজস্ব কিছু বইপত্র তার না নিলেই নয়। সব গোছাতে গিয়ে পুরনো জিনিসপত্রও বের হয়ে আসছে। পুরনো একটা প্যাকেট ছিঁড়ে হুড়মুড় করে প্রচুর কাগজপত্র, চিঠি, ফটো বের হয়ে পড়ল।

মুকুল তার লম্বা হাত বাড়িয়ে একটা ফটো তুলে নিল। প্রথম দিককার ভরতপুরে গ্রামে কাজ করছে আইভি। ডাক্তারের তোলা ফটো। সেই দ্বিতীয়বার আইভির আসা। মুক্তেশের তখন হঠাৎ ফটোগ্রাফির নেশা চড়েছে। সব দিকের ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ভরতপুরের লোক ধরে ধরে ছবি তুলছে। মুক্তেশ বলত, এসব হচ্ছে দলিল। আমরা যখন থাকব না, ভবিষ্যত প্রজন্ম দেখবে। কিন্তু একটা ছবির আয়ু কত দিন? আইভির কাছে সব আজও স্পষ্ট। তবু এই স্পষ্টতার কোনও মানে পায় না সে। এখানে থাকার জন্য কোনও আকর্ষণ বোধ করে না।

মুকুল আইভির ফটোটাকে দেখেই যাচ্ছে। নানা দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন কিছু আবিষ্কার করতে চাইছে।

আইভির বড়ই অস্বস্তি লাগছে। সে খানিকক্ষণ মুকুলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাত বাড়াল। বলল, দাও ওটা। রাখতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মুকুল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তার হাতে ফটোটা দিল। বলল, এরকম কেন হয় বল দেখি। তোমার কথা যখনই একা একা ভাবি—এই ছবিটাই মনে পড়ে। তোমাকে প্রথম দেখার সময় তুমি যেমন ছিলে।

আইভি উত্তর দিল না। অনেক কাজ সারছিল সে। যাবার জন্য রিজার্ভেশনও তার রেডি। হাওড়া স্টেশনে অঞ্জন তাকে নিতে আসবে।

মুকুল বলছিল—আমি অবাক হয়ে সে সময় তোমাকে দেখতাম। ভাবতাম আমার বয়স যদি আর একটু বেশি হত। তোমার থেকে অন্তত বছর দশেকের বড় তাহলে হয়তো আমার দিকে তাকাতে। তখন এত কষ্ট পাচ্ছিলাম।

মুকুলের প্রলাপ আবার শুরু হয়েছে। আইভি উত্তর দেবে না ভেবেছিল। কিন্তু ওর বলার ধরনে হেসে ফেলল। হাসিমুখ মুকুলের দিকে তুলতেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন বেদনার্ত যন্ত্রণাময় মুখ করে রেখেছে মুকুল। হাতের কাজটাও থেমে গিয়েছিল তার।

আইভির ভেতরে একটা ঘূর্ণি উঠছিল। সে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরের মেঝেতেই একরাশ ধুলোর মধ্যে বসে পড়েছিল। অঞ্জন তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক দিনের অনেক চাপা পড়া আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেবে বলে আইভি তার জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে চলেছে। সে এবার জীবন উপভোগ করবে। হোক না অঞ্জনের বয়স। তবু তাকে পেতে চলেছে, এ উত্তেজনায় সে ঝমঝম করে বাজছে। হয়তো সে কারণেই বিপরীতে কারুর এই অবস্থা দেখলে করুণা বোধ হয়। মিথ্যে নয়, সত্যি সত্যিই মুকুলের প্রতি সহানুভূতিতে সে এই সময় আর্দ্র হয়ে উঠল।

মেঝেতে বসেই আইভি বলল, তুমি খুব একা হয়ে উঠেছ, না? ছেলেরা এভাবে থাকতে পারে না।

ম্লান হাসল মুকুল। শুধু ছেলেরা?

—তোমার বাবা সত্যিই অন্যরকম ছিলেন। কিন্তু জেনি চলে যাবার পর তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল। গৌতমী তোমাকে ভালবাসত। ওকে যেতে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি।

—গৌতমীকে আমি অনুভব করতাম। কিন্তু আমি তো ওকে চাইনি। মুকুল আবেদনভরা চোখ মেলে ধরেছিল।

মুকুলের চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কীই-বা করার আছে আইভির। এইরকম ঘটনার চাপ থেকে মুক্তি পেতে সে চা করতে যায়। যাবার সময় মুকুলের দিকে তার চোখ পড়তেই সে দুঃখপ্রকাশ করে। আর মুকুল যেন এটার অপেক্ষা করছিল। ম্লান মুখেই সে হেসে ওঠে। না, না তোমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই। তুমি তোমার মত চলবে। যাকে ইচ্ছে জীবনে বেছে নেবে। মাঝখান থেকে আমিই কেমন স্যান্ডউইচ হয়ে গেলাম তাই ভাবি।

স্টেশনে তার সঙ্গে কেবল মুকুলই গিয়েছিল।

গৌতমীর মতো মিছিল হয়নি। হবেই বা কেন? সে তো ছেড়েছুড়ে দিয়ে আসছে না। তবে তো এটা শেষই। গাড়ি থেকে হসপিটালটা পিছন ফিরে দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। মুকুলের জন্য পারেনি। হয়তো এটা নিয়েও রসিকতা করতে ও ছাড়বে না। গাড়ির আয়নায় চোখ রেখে দেখেছিল শুধু। অসম্ভব রোদের দাপটে অত বড় নিঃসঙ্গ বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ রোগী একটু বেশিই হয়েছে। মুকুলের হসপিটালে থাকাটা প্রয়োজনও ছিল। তবু সে যাচ্ছে। আইভির বারবার নিষেধ সত্ত্বেও।

সামান্য কথা বলছিল তাদের ড্রাইভার। মুকুল বড় গম্ভীর। আইভি উল্টোপাল্টা বকছিল। ড্রাইভারকে অযথা উপদেশ দিচ্ছিল। ভরতপুরের সীমান্তে মুক্তেশের যে মূর্তিটা সে স্থাপন করিয়েছিল তাতে শুকনো মালা হাওয়ায় দুলছে। একটা কাক তার মাথায় বসে ছিল। গাড়ির শব্দে সে উড়ে গেল। ভেতরটায় ছ্যাঁৎ করে লাগল। মুক্তেশ তাকে দেখছে। সে ভরতপুর ছেড়ে পালাচ্ছে। সে অঞ্জনের জন্য মুক্তেশকে, এই হাসপাতাল, এই ভরতপুর গ্রাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালাচ্ছে। বেঁচে থাকলে মুক্তেশ কী ভাবত? সে কি নানাভাবে তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করত না? মুকুল যাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং বলে। কিন্তু যদি আজ মুক্তেশ বেঁচে থাকত, আর অঞ্জনও তাকে এইভাবে চাইত সে কোন দিকে যেত তাহলে? কার দিকে ঝুঁকত? নিজের মধ্যে ছটফট করে আইভি। উত্তর পায় না।

নিজের মনের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন যাতায়াত করে। বাইরে লু চলছে। শাড়ি দিয়ে মুখটাকে আড়াল করেছে আইভি। নিজের মধ্যে গুটিয়ে বসেছে সে। স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা সে যেন মুক্তেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।

মুকুল যা বলছে সব কি সত্যি ডাক্তার? আপনি আমাকে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন? সত্যি করে বলুন আপনি কি আমাকে একটু ভালবাসেননি? আমি তো ভাবতেই পারি না আপনার মতো মহৎ মানুষের পক্ষে কী করে ফের বিয়ে করা সম্ভব? লোকে আপনাকে যদি এর জন্য নিচু চোখে দেখত, সামান্যতম অমর্যাদা করত আমি সহ্য করতে পারতাম না যে। কিন্তু যদি আপনি পাবলিক ফিগার না হতেন—আমরা কি একসঙ্গে থাকতে পারতাম? আপনি আমাকে কাজ দিয়েছিলেন। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা তো করেছি। আপনি কী বলেন সারা জীবন এখানে থেকে যাই? অঞ্জন ডাকছে ডাক্তার। ভেতরে ভেতরে বড় লোভ জমে উঠেছে যে। রাগ করছেন না তো আপনি? যদি আপনি আমার দিকে একটু হাত বাড়াতেন, একটু, শুধু একটুখানি।

মুকুল তাকে হাত ধরে নামাচ্ছিল। আইভি তখনও মনে মনে বলছিল: আপনার সামান্য স্পর্শ আমাকে যে কত কৃতার্থ করত, আপনি জানতেন না? আপনি কি অঞ্জনের তুলনায় ভীতু ছিলেন, নাকি আমায় একটুও ভালবাসতেন না? হয়তো তাই হবে। মুকুল আপনার সমস্ত সদিচ্ছায় সন্দেহ প্রকাশ করে। আমার আপনার সম্পর্ক নিয়ে ওর অনেক সমালোচনা। কিন্তু ডাক্তার, সবাইকার জীবনে তো কিছু কিছু গোপন দিক থাকে। না হয় সেই গোপন জায়গায় আমাকে গ্রহণ করতেন। হয়তো তাহলে সব কিছু ফেলে এভাবে পালাতাম না। হয়তো ভেতরে ভেতরে এত ক্ষুধা জমত না। এটা কি খুব অসম্ভব ছিল?

স্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে আইভি। তাদের হসপিটালের একটা বড় বিজ্ঞাপন আছে এখানে। আইভির ব্যবস্থা করা। তার অনেকগুলো কাজের মধ্যে এটা একটা। মুকুলও সেটার দিকে চেয়ে ছিল। যেন কখনও দেখেনি—এভাবেই। ভরতপুরের আদিবাসী কল্যাণ হাসপাতাল শুধু যে আদিবাসীদের জন্যই নয় তা বেশ ভালভাবে প্রচার করতে পেরেছিল আইভি। অনেক টাকা সে এভাবে ওঠাবার বন্দোবস্ত করেছিল। কাজে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। মুকুল যে ভিতের ওপর কাজ করল সে ভিতটা তো ওরই বানানো। আইভি বলল, ওরকম আরও বিজ্ঞাপনের দরকার মুকুল।

মুকুল সামান্য উজ্জ্বল হল। কাছে এসে বলল, এখনও তাহলে ভাবছ হসপিটাল নিয়ে।

—ট্রেনে উঠে আর ভাবব না।

—পারবে না। কিছুতেই পারবে না দেখ। আচ্ছা তোমার কেন মনে হয় না এটাই তোমার ঘরবাড়ি?

—তোমার হয়? আইভি মুকুলের দিকে প্রশ্নটা ফিরিয়ে দিল।

—আমি তো অন্য কোথাও যাবার কথা আর ভাবতাম না। বাড়ি আর কী বল? মানুষ তো সম্পর্কের জন্য থাকে। এ জায়গা ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ। যদি একান্তই না থাকতে পারি তাহলে হয়তো চলে যাব। তবে তোমার মতো তো আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না। তাই এখান ছাড়া গতি নেই।

আইভি মৃদু হাসল। প্রায় জনশূন্য স্টেশনে ওরা দুজন। মুকুল খুব কাছে দাঁড়িয়ে। ফিস ফিস করে সে বলল, আবার ফিরে এস ম্যাডাম। ফিরে এস তুমি।

আইভি দু'পা সরে গেল মুকুলের কাছ থেকে। ট্রেন আসবার ঘণ্টা বাজিয়ে গেল কেউ। ধীরে ধীরে আরও কিছু লোক জড় হচ্ছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তারা খুবই পরিচিত। সকলের চোখ তাদের দিকে। মুকুলকে সরে যেতে হল। আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকল তারা।

ট্রেন আসছে। ধুলো উড়ছে খুব। মুকুল বেশ ব্যস্ত হল। সিট খুঁজে বসতেও অসুবিধা হল না। জানলার বাইরে মুকুল। বেদনার্ত ওর মুখ। আইভি কী বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। মুকুল কিছু একটা শোনার জন্য অধীর ছিল।

আইভি বলল, হসপিটালটা দেখ মুকুল। মুক্তেশের স্বপ্ন—কথাটা শেষ করতে পারল না আইভি। ট্রেন ছেড়ে দিল। মুকুল বলল, আমাকে কলকাতায় যেতে বলবে না? একবারকার জন্যও ডাকবে না? ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল মুকুল। হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল জানলা দিয়ে। ছুঁতে হল আইভিকে। হাতটা বের করেও দিতে হল জানলা দিয়ে। মারা পড়বে নাকি মুকুল?

স্পিড তুলেছে ট্রেন। হু হু গরম হাওয়া গা পুড়িয়ে দিচ্ছে। প্রখর রোদ্দুরে দূরের গাছপালা কাঁপছে। মাঠ, পাথুরে জমি, এইরকম কঠিন ভূপ্রকৃতি কয়েক ঘণ্টা পর দূরে সরে যাবে। ধীরে ধীরে সবুজ বাড়বে। জল বাড়বে। সেও ক্রমশ শীতল হবে। একদিন যার অভাবে সে এখানে ছুটে এসেছিল, আজ সে সব কিছু পূর্ণ করে দেবার জন্য ডাকছে। তার গা শিরশির করে উঠল। সেই আকস্মিক চুম্বন মনে পড়ে সে শিহরিত হল। কতক্ষণ আর। বেশিক্ষণ তো নয়। মাত্র সাত ঘণ্টা। সাত ঘণ্টা পর তাকে দেখতে পাবে। শুধু তো দেখতে পাওয়া নয়, তাকে নিঃশেষে পাবে। আইভি অস্থিরবোধ করছিল। সে তার অল্প বয়সের, তার কৈশোরের যৌবনের দিনগুলোর মতো অস্থিরতা অনুভব করছিল। সে বারবার নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করছিল। বারবার ভরতপুরের কথা ভেবে দুঃখ পাবার চেষ্টা করছিল। মুক্তেশের কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে যেন এমন কিছু না করে যা তার স্বভাবের বিপরীত। কিংবা সব কিছুই যেন বয়সোচিত হয়।

অঞ্জনের প্রতিটি আচরণ তার মনে পড়ে। প্রতিটি আচরণের ব্যাখ্যা করতে থাকে সে মনে মনে। বিশেষত তার 'আই' ডাকটা বুকের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। মুক্তেশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে ভেবে মুখটা কীরকম বিষণ্ণ হয়েছিল সেটা মনে পড়লে তীব্র সুখ পায় সে। সত্যি চিরকাল আইভি নিজের দিকটাই ভেবেছে, অঞ্জনের দিকে কোনওদিন মুখ তুলে চায়নি। আইভির অভাবে সে কত কষ্ট পেয়েছে একবারও ভেবে দেখেনি। উল্টে ইরার প্রসঙ্গ তুলে সে খোঁচা দেবার চেষ্টা করেছে। ভেতরে ভেতরে ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠার জন্য বড় লজ্জা লাগে তার। আইভি ভাবে, সে কলকাতায় থাকবে ঠিকই, অঞ্জনকে পেতে চাইবে ঠিকই, কিন্তু পরিবার থেকে ও বিচ্ছিন্ন হোক কখনওই তা চাইবে না। আইভি জানে তাহলে অঞ্জনকেই হয়তো হারাতে হবে। এতদিনের সংসার, তার মেয়েরা, তার সন্তানের জননীর স্থান নিশ্চয় অঞ্জনের কাছে কম নয়। তাছাড়া অভ্যাসেরও মূল্য আছে। অভ্যাসের জন্য মুকুলও কেমন কাছের হয়ে উঠেছিল। আইভি ভাবে, হয়তো একসঙ্গে থাকতে থাকতেই মুকুলের তার প্রতি একজাতীয় মোহ জন্মেছিল। আর সেই মোহটাকেই স্বতসিদ্ধ করতে সে নানারকম যুক্তি জোগাড় করত। নইলে আইভির নিশ্চিত বিশ্বাস এমনটা হবার কোনও কারণ নেই। গৌতমী যথেষ্ট আকর্ষণীয় মেয়ে ছিল। শেষের দিন গৌতমীর সঙ্গে বিদায়ের কারণে বা যে কোনও কারণেই হোক না কেন, যেভাবে সর্বক্ষণ লেগেছিল তা মোটেও ভাল দেখাচ্ছিল না। অনেকবার ভেবেছে মুকুলকে এ নিয়ে কিছু বলবে। ভেবেছে ওকে বলবে, হসপিটালের নানা লোকজনের সামনে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা ভাল দেখাচ্ছে না। শেষের দিন মুকুলকে আগের মতো পেয়ে গৌতমী বেশ উল্লসিত হয়েছিল। তবে সেই উল্লাস কান্নায় পরিণত হতে দেরি হয়নি। ভরতপুর ছা[illegible] ঘণ্টাখানেক আগে মুকুলের অফিসে ওর সামনের চেয়ারে বসে [illegible]কে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে দেখেছে। কোনওরকম লোকলজ্জার [illegible] দু'জনেই মাথায় রাখেনি। গৌতমীকে নানাভাবে অপমান করেছে মুকুল, হয়তো অপমানের সঙ্গত কারণও ছিল। তবু শেষের দিনের এই প্রশ্রয়ের নাটক একেবারেই ভাল লাগেনি আইভির।

মুকুলকে আইভি কিছু বলেনি। বলে লাভ হত না। উল্টে যদি সে বলত, গৌতমীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে বলেই তোমার এসব মনে হচ্ছে। যদি বলত এসব স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে গায়ে লাগত আইভির। আইভি না হয় এ ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে যে গৌতমী মুকুলের প্রেমে পড়ছে। তা প্রেমে পড়লে কি লোকদেখানো এমন ব্যবহার করতে হবে? অঞ্জনের ব্যাপারটা তো কই আইভি চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলেনি। আইভি বেশ বুঝত গৌতমী আর মুকুলের ব্যাপারটা হসপিটালের সকলের কাছে মুখরোচক হয়ে উঠেছিল, যদিও তারা আইভির কাছে কিছু প্রকাশ করেনি। তবু আইভি বুঝত। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে হসপিটালের আবহাওয়া সে আন্দাজ করত।

তবু প্রেম বোধহয় এরকমই হয়। ঢেউ-এর মত্যো করে অঞ্জনের সম্পর্কে ভাবনা তার ফিরে ফিরে আসছে। আইভির এতটুকু ঘুম পর্যন্ত হচ্ছে না। আইভির একটু ঘুম দরকারই। বাইরেটায় ধীরে ধীরে সন্ধ্যে লেগে গেছে। চারপাশের লোকেরা ইতস্তত ঢুলছে। হাওড়ায় যখন গাড়ি থামবে তখন রাত। এ গাড়িতে মুক্তেশের সঙ্গে ছাড়া কখনও যায়নি। মুক্তেশ বকবক করতে করতে যেত। বকবক শেষ হলে তারা দু'জন ঘুমতো। কখনও কখনও মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যেত। হাসতে হাসতে তারা জেগে বসত। কখনও আবার ঘুমের ভান করেও আইভি ওর গায়ে পড়ে থাকত। হঠাৎ আইভির মনে হল ভাগ্যে মুক্তেশ মারা গেছে। যদি না মারা যেত আইভিকে আসতে দিত না, কিছুতেই নয়। মুকুল অন্তত ছুটি দিয়েছে। মুকুলের কাছে জোর করাও যায়। কিন্তু মুক্তেশ যে অনড় পাথরের দেবতার মতো।

ছি ছি, সে কী ভাবছে! ভাবনার গতি যে কোনদিকে যায়। মুক্তেশ মারা গেছে ঠিকই। কিন্তু মৃত্যুর আগে সে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি মুক্তেশ থাকবে না। মুক্তেশহীন নিজেকে, মুক্তেশহীন ভরতপুরকে সে কল্পনা করতে পারত না। অথচ আজ সে ভাবছে মুক্তেশ ভাগ্যে নেই। মুক্তেশ চলে যাবার পর নিজেকে সামলাতে অনেকদিন লেগেছিল। তখন ভাগ্যে সে কাজে ঝাঁপিয়েছিল। কাজ ভুলিয়ে দিয়েছিল তার যাবতীয় শূন্যতা।

আর এখন তার হাতে কাজ নেই। কাজ নেই কেন? সংসার করবে সে। এতদিন যা করতে পারেনি তাই করবে। মুকুল টাকা পাঠাবে মাসের পর মাস—এ বিশ্বাস তার আছে। খুব সুন্দর করে ঘর সাজাবে সে। অঞ্জন হয়তো ঘর ছেড়ে নড়তেই চাইবে না। ঠেলে পাঠাতে হবে ওকে। অঞ্জনের বাড়ির লোকের চোখের সামনে সে কিছুতেই নিচু হতে পারবে না। এমনিতেই তো সে অঞ্জনকে পেয়ে গেছে। আর বেশি যেন না চায়। সে যেন ছেলেমানুষ না হয়। আইভি নিজেকে নিয়েই ভয় পেতে থাকে। নিজেকে নিজেই শাসন করতে থাকে।

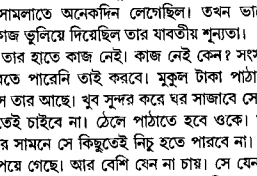

গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই অঞ্জনকে দেখতে পেয়েছিল আইভি। তখনও অঞ্জন তাকে দেখেনি। আইভির বুকের ভেতরটা ধকধক করেছিল। আর সে ক্রমাগতই ভেবে যাচ্ছিল এ বয়সে এ সব হয় নাকি? তার মনে হচ্ছিল অঞ্জনের প্রতি এরকম আকর্ষণ তার কখনও হয়নি।

অঞ্জনের যখন সে মুখোমুখি হয়েছিল তখন সে দুদণ্ড তার দিকে চেয়েইছিল। অঞ্জন স্টেশন থেকে বের হবার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করছিল। ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়েছে কি না, সে সব খবর নিচ্ছিল। এইসব সাধারণ কথাবার্তাতে আইভির ভেতরের চাপা উত্তেজনা লঘু হয়ে যাচ্ছিল। সে বিশেষ কোনও কথা বলতে পারছিল না। বাধ্য মেয়ের মত অঞ্জনের পিছনে পিছনে হাঁটছিল। যেন তার আর কোনও দায় নেই, চিন্তাভাবনা নেই, সে সবই সমর্পণ করে বসে আছে। তার মনে হচ্ছিল ভরতপুরের চারধার থেকে যে সব নতুন বউ হসপিটালে দেখাতে আসে তাদের কথা। মুখ দিয়ে কথা বের করা যায় না। স্বামীরা নড়তে বললে নড়ে। কথা বলতে বললে কথা বলে। এসব দেখে বড় রাগ হত আইভির। কতবার ওদের ধমকেছে। অথচ নিজেকে তার আজ তাদের মতো লাগছিল। মাঝেমাঝে তার মুখর হবার ইচ্ছে হচ্ছিল না এমন নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সমর্পণের ভাব তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

ট্যাক্সিতে বসেই অঞ্জন ড্রাইভারকে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিল। আইভি যে খুব বেশি বুঝছিল এমনও নয়। অনেক দিন সে কলকাতাছাড়া। মাঝেমাঝে খবর এসেছে, ততবার মুক্তেশের সঙ্গেই সে কাটিয়েছে। বিশেষ কোথাও বের হত না। এই সন্ধ্যেবেলার আলোঝকমকে রাস্তাঘাট যেন অচেনা লাগছিল। গাড়ির ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বালা করছিল। সে চোখবন্ধ করে গাড়ির সিটে নিজেকে মেলে ধরেছিল। তার হাত আলগোছে অঞ্জনকে স্পর্শ করে ছিল।

অঞ্জন বলল, এতদিনে তবে তুমি এলে। শেষপর্যন্ত আমার স্বপ্ন যে সার্থক হবে—এটা আশা করতেই ভুলে গিয়েছিলাম।

আইভি চোখ বন্ধ করে বলল, আমিও।

অঞ্জন মুকুলের কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল, আমি ভেবেছিলাম ডক্টর বোস তোমাকে রেখে যাবেন।

আইভি সামান্য বিরক্ত ভাব দেখিয়েছিল। বলেছিল আমি অবলা নারী নাকি? তা ছাড়া নিজের ঘরে যাচ্ছি, প্রথম ঘর দেখব, এইসময় কাউকে নিয়ে আসে কেউ?

—আসলে যখন থেকে দেখেছি, ছেলেটাকে চোখ থেকে সরাতে পারি না। এত বড় ডাক্তার, অত সব ডিগ্রি, ওখানে পড়ে আছে, তার ওপর এত ভাল ব্যবহার আমি তো দেখিনি।

—মুক্তেশ বোসকে দেখলে আরও অবাক হতে।

—না না, মুকুল অসাধারণ-ছেলে। ওকে একবার আসতে বোলো।

—তুমিই না হয় বোলো। আমি তো এখানেই রয়ে যাব। চিঠিপত্র লেখা তো পোষাবে না। আর ঘরে তো এত তাড়াতাড়ি ফোনও আসবে না। আইভি জানলার দিকে সরে যেতে চায়। আবার কী ভেবে অঞ্জনের দিকে এগিয়ে আসে। আমার নতুন ফ্ল্যাট পরিষ্কার করিয়ে রেখেছ তো? আর বিছানা কিনেছ তুমি—ফোনে বলে দিয়েছিলাম যে।

—সব কিনেছি ম্যাডাম। ম্যাডাম শব্দটা বলেই হাসতে লাগল অঞ্জন। কী, এখানেও ম্যাডাম বলতে হবে নাকি?

আইভি খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল। ইয়ার্কি হচ্ছে অঞ্জন? আমার অবস্থায় যদি থাকতে—তো বুঝতে। ওদের পরস্পরের আঙুল পরস্পরের খাপে খাপে ঢুকে খেলায় মত্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা দুজনেই চুপ করে ছিল। আইভি জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল, সমস্ত অনুভূতিকে আঙুলের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়ে।

হঠাৎ ড্রাইভারকে কী একটা রাস্তা সম্পর্কে বলতে থাকল অঞ্জন। আইভির হাত তখন সিটে লুটোচ্ছে। আইভির রাস্তাঘাটের কথা শুনে কীরকম একটা লাগল। বলল, ওই রাস্তা দিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে যাওয়া বুঝি সোজা হয়?

—না, ফ্ল্যাটে যাওয়া সোজা হবে কেন? আমরা তো এখন আমাদের বাড়ি যাচ্ছি। ওখানে রাতে খেয়ে তারপর ওখানে যাবে।

—সে কী? অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আইভি তুমি তো এ কথা আমায় জানাওনি।

—আরে বলতে ভুলে গেছি। আজ প্রথম এলে, আজ তুমি হোটেলে খাবে, তাই কখনও হয়?

—হয় অঞ্জন! তোমার বাড়ি পরে কোনওদিন নিশ্চয় যাব। আজ এত ধকল গেছে, আজ পারব না।

—আমার বাড়িতে কোনও অসুবিধা হত না তোমার। তাছাড়া ইরাও বারবার বলে দিয়েছিল।

ইরার নাম শুনেই সংকুচিত হয়ে গেল আইভি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল!

অঞ্জন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আশ্বাস পাচ্ছিল। বলল, আজ না হয় চলই না। পরে বরং সময় হবে না।

আইভি ছোট করে না বলল। অঞ্জনের ওর কণ্ঠস্বরকে খুব কঠিন মনে হল। সে যা বোঝার তা বুঝে নিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলে। আইভির মনে নিমেষে কেউ পেনের কালি ছিটিয়ে দিল।

ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকালে সময় চলে যাচ্ছে বোঝা যায়। হু হু করে মিটারও উঠছে আইভি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অঞ্জনও অস্বস্তি বোধ করছে। তার অস্থিরতা আইভির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আইভির ব্যবহার কি খুব ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেল? আসলে সে অঞ্জনের সঙ্গে একটু নিভৃতি চাইছিল। তাও আবার নিজের ঘরে। যেখানে বারণ করার কেউ নেই, কেউ বিরক্ত করার নেই। আসলে পুরুষরা এমনই হয়। কিছু বোঝে না। আইভি ভাবল। অঞ্জন বেচারার দোষ নেই। ও তো ভালর জন্যই ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ও তো জানে না কিছু সুবিধা কারুর কারুর কাছে চরম অসুবিধার আকার নেয়। কী করেই বা বুঝবে? আইভির এ কথা মনে হওয়া মাত্র সে অঞ্জনের দিকে সরে আসে। রাগ কোরো না অঞ্জন। ফ্ল্যাটটার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করেছি, এতদূর এসে ওটা যদি প্রথমেই না দেখতে পেলাম। আর একরাত না খেয়ে থাকলেই বা কী? তা ছাড়া..., আর বলতে পারল না আইভি।

—না, সে ঠিক আছে। আসলে আমি চাইনি, ওরা এমন জোর করল। ইরা আসলে তোমাকে দেখতে চায়। আমার বড় মেয়েও।

—সে সব তো পড়েই আছে। ওরা একসময় আসবে না হয়। আজ শুধু শুধু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম।

ওরা এসে পড়েছিল। একটা দৈত্যাকার বাড়ির পেটের মধ্যে দিয়ে ওরা সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল। দরজায় যখন অঞ্জন চাবি খুলছিল তখন একটা দমকা উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার দশা হচ্ছিল। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই পৃথিবীর সবকিছুই যেন তার নিজস্ব হবে। এমনকি অঞ্জনও।

দরজা খুলে দিয়ে লাগেজগুলো একে একে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে অঞ্জন বলল, তুমি বস, আমি একটু ফোন করে আসি। ওরা অপেক্ষা করবে।

আইভি ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ছোট ছোট ঘর। একটি বেডরুম, একটা ডাইনিং। আইভির কথামতো সেখানে একটা সাধারণ চৌকি আর বিছানাপাতা আছে। রান্নাঘরে ঢুকেও অবাক হল সে। সামান্য রান্নার বাসনপত্রও সাজান। অঞ্জন একেবারে পাকা সংসারীর মতো ব্যবস্থা করেছে। ঘরটা ছোট বলে যে মন খারাপ হয়েছিল প্রথমে, সেটা তার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। বাথরুমে ঢুকল আইভি। একটা সাদা তোয়ালেও রয়েছে। ঘর একেবারে সাজিয়ে বসে আছে তার জন্য। এই বোধহয় পরিণতির লক্ষণ। বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য তার মনে যে খিঁচ ছিল সে সবও উধাও হয়ে যাচ্ছে।

অঞ্জন ফিরতে সামান্য দেরি করছে। কাছেপিঠে কি কোনও বুথ নেই? অঞ্জন সময় নিচ্ছে দেখে সে ড্রেস চেঞ্জ করতে গেল। একটা নাইটি পরল। কলকাতায় আসার আগে সে এই নাইটিটা তৈরি করিয়েছিল। ওখানে কখনও পরেনি। এখানকার জন্যই নিয়ে আসা। বাথরুমের আয়নায় অনেকক্ষণ নিজেকে দেখল আইভি। অঞ্জন কি খুব অবাক হবে? খারাপ কিছু ভাববে? ভাবুকগে। তবু যেন অঞ্জনকে দেখানর জন্যই এই পোষাক।

কলিংবেল বেজে উঠলে প্রথমটায় আইভি এই পোষাকে কী করবে ভেবে পায় না। অঞ্জনের জন্যই সে এটা পড়েছে ঠিকই, তবু তার সামনে এভাবে দাঁড়াতে পারা মুশকিল। এই ফাঁকা ঘরে গায়ে ঢাকা দেবার মতো সে কিছুই খুঁজে পায় না। কোনওমতে বিছানার চাদরটা সে গায়ে দেয়। তারপর সেটা বিসদৃশ মনে হওয়াতে স্যুটকেস খুলে চাদর বের করে গায়ে জড়ায়।

অঞ্জন বলল, এতক্ষণ সময় লাগল। তারপর ওকে দেখে একটু অবাক হয়। আইভির লজ্জা সমস্ত শরীরে ঘুরে বেড়ায়। তবু নিজেকে সে সাহস দেয়। অঞ্জন তাকে একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে। তারপর ফস করে সিগারেট ধরায়। আইভি অঞ্জনের সরাসরি দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। তারপর নিজেই বলে ফেলে—আমাকে এই পোষাকে মানাচ্ছে না, তাই না? তবে সুবিধার পোষাক। ঘরে পরার পক্ষে ভাল। একাই তো থাকব। গরমের মধ্যে তার গা চিড়বিড় করছিল। আইভি চাদরটা খুলে ফেলে। সাদা বাহু দুটো যেন লাফিয়ে ওঠে।

সিগারেট টানতে টানতে অঞ্জন বলে, ইরাও পরে।

আইভির এই তুলনাটা কানে লাগে। সংকুচিত হয় সে। কী করে সে অঞ্জনকে বোঝাবে এই নামটা তাদের মধ্যে নিয়ে না আসতে। যদিও সেটা খুব বাস্তব। আইভি ভাবে তবু বাস্তব তো তাকেই মানতে হবে। অঞ্জনের পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক।

আইভি ঘর গোছাতে থাকে। অঞ্জনের সামনে সে যেন বিজ্ঞাপনের নারীর মত ঘুরে বেড়ায়। অঞ্জন না বলে পারে না, তুমি বুঝি প্রতিদিন ব্যায়াম কর? এরকম ফিগার রাখলে কী করে?

প্রশংসা গায়ে মাখতে মাখতেই আইভি জানায় সে তো চিরকালই একইরকম। সে অঞ্জনের খুব কাছে সরে আসে। অঞ্জনের স্পর্শ চাইতে থাকে। অনেকক্ষণ সে এসেছে। অনেক কষ্ট করে ভরতপুরের হসপিটালের সব দায়িত্ব অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে সে অঞ্জনের জন্য পালিয়ে এসেছে। অঞ্জন তাকে নেবে না?

অঞ্জন বলল, বাড়িতে ফোন করলাম। ইরা খুব হতাশ তুমি আসছ না শুনে। যাইহোক বড় মেয়ে খাবার নিয়ে আসছে।

আইভি হাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় সেটা দেখেই অঞ্জন বলল, এখানে হোটেল ভাল নেই। জায়গাটা নতুন তৈরি হচ্ছে তো। আমাদের বাড়ি তো কাছেই।

—এই সন্ধ্যেতে তোমার মেয়ে খাবার নিয়ে আসবে?

—আরে এটা কলকাতা শহর। রাত বারোটা পর্যন্ত মেয়েরা এখানে ঘুরে বেড়ায়। সে কোনও অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া তুমি আসবে বলে ইরা সারাদিন ধরে রান্না করেছে। শোন আই, তোমার এরজন্য কোনওরকম কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। কোনও সংকোচ কোরো না।

—সেটাও কোনও কথা নয়। তুমি একটু ভেবে দেখো আমাদের সম্পর্কটা। এরমধ্যে তোমার মেয়েকে আনছ—ও কী ভাববে বলত।

—কিছু ভাববে না, ও আধুনিক মেয়ে।

—তুমি কিছু মানুষ চেন না। সন্তানরা এ রকম সম্পর্ক একেবারে সহ্য করতে পারে না। এ অভিজ্ঞতা আমার আছে। মাঝখান থেকে হয়তো আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে শুধু এর জন্য। আইভির চোখে মুখে শঙ্কা ফুটে উঠল।

অঞ্জন একহাত দিয়ে বেষ্টন করল আইভিকে। অভিমানে শক্ত হয়ে গেল

সৈ। সমস্ত হৃদয় যাকে চাইছে সে এতটুকু কিছু বুঝবে না। অন্তত প্রথম দিনের সন্ধ্যেটা কি তার নিরুপদ্রবে কাটবে না? অঞ্জন কি তাকেও এভাবে চায় না। ওর কি একইরকম আকাঙ্ক্ষা নেই।

অঞ্জন বলে, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ আই। একান্ত তোমার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করলাম। ওরা তো প্রতিদিন আসবে না। কিছু জানতেও পারবে না। ওদের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন তো আমি করবই। কিন্তু তোমার স্থান তো আলাদা। এ দুটোকে মেলালে আমারই যে চলবে না। আমি প্রতিদিনই তোমার কাছে আসব। ঠিক করেছি অফিস শেষ হলেই চলে আসব। তারপর রাতে ফিরে গেলেই তো হল। আমাকে তো একটা ভাগাভাগি করে নিতেই হবে। যতই হোক শরীর মন সবই যে দু ভাগ হয়ে গেল তোমাকে দেখার পর থেকে।

আইভির চোখ ভিজে গিয়েছিল। অঞ্জনের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নাইটি বদল করে শাড়ি পরতে সে ভেতরে গেল। অন্তত এই পোষাকে ওই মেয়েটির সামনে সে দাঁড়াবে না। নাইটিটা শরীর থেকে খুলে ফেলতে একধরনের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যাই হোক, আইভি এত ছেলেমানুষি করছে কেন? সে যে ভরতপুরের ম্যাডাম ছিল তা কি ভুলে গেছে? তা যে সকলের চোখে অন্য একটা স্থান ছিল। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে প্রেমিকা হয়ে ওঠার জন্য এত তোড়জোড় করছে কেন? কোনওদিন কিছু পায়নি বলে? হঠাৎই তার দিদির কথা মনে হয়। সুরভির নিশ্চয় খুব কষ্ট হত তার বরকে ভাগ করে নিতে। কিন্তু ইরা তো তার স্থানে জোর করে এসে বসেছে। সব তো জানে ও। তবে কেন তাকে ছেড়ে দেবে না অন্তত কিছু সময়ের জন্যও। আইভি কি বোঝে না সে মেয়ে পাঠাচ্ছে কী কারণে?

আইভি এখন প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। সাদা শাড়ি পড়েছে। চুল আঁচড়ে নিচ্ছে। মুখটাও পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। মুখটাতে রাগ, দুঃখ সব আবেগ চলে গিয়ে যাতে একান্তই সাধারণ হয়ে ওঠে তার চেষ্টা চলছিল নিজের ভেতর। ভরতপুরকে নিজের ভেতরে সে জাগিয়ে তুলতে চাইছিল। যেমন ওখানকার পেশেন্টদের মুখ তাকে দেখলে সম্ভ্রমে স্থির হয়ে যেত, সেরকম হয়ে উঠতে চাইছিল প্রাণপণে সে। অঞ্জনের মেয়ের কাছে তাকে এইভাবেই দাঁড়াতে হবে।

অঞ্জনের মেয়ে অন্তরা বড় কম কথা বলে। নাকি এ রকম ব্যবহার আইভির সামনে বলেই। অঞ্জনও বলে তার বড় মেয়ে খুব শান্ত। অনিতার মতো নয়। একবার কোনও একটা কথা ওকে ধরিয়ে দিলেই হয়। ও বলেই চলবে, বলেই চলবে। অথচ এর মুখ থেকে কথাই ঝরে না। অঞ্জন বলে, আমার বড় মেয়েটা খুব বোকা। ওকে নিয়ে আমার অশান্তি খুব বেশি।

—বোকা কেন? আইভি প্রশ্ন করে। সে অনেক ঘটনা—অঞ্জন বলে। আইভি দেখে মেয়েটা কুঁকড়ে বসে রয়েছে। ভয়ানক সেজেগুজে এসেছে মেয়েটা। দামি শাড়ি। ঠোঁটে চকচকে লিপস্টিক ঘষেছে। অঞ্জনের কথায় সে খাবারগুলো রান্নাঘরে রেখে এল। প্রতিটি পদক্ষেপ ও সাবধানে ফেলছে। ফিরে এসে বাবার পাশে সাবধানেই বসল। আইভি দেখতে পাচ্ছিল সাজগোজের আড়ালে ওর মুখখানা খুবই ম্লান লাগছে।

আইভি বলল, ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে কেন? যদি তোমাদের বাড়ি খুব একটা দূরে না হয় তো তুমিই তো খাবারটা নিয়ে আসতে পারতে অঞ্জন। ও বেচারা এতদূর কষ্ট করে এল।

—না না, আমার কোনও কষ্ট হয়নি। অন্তরা বলে ওঠে। মা বলেছে কাল দুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

আইভি অন্তরার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল: কাল তো হবে না অন্তরা। আমি তো এই এলাম। অনেক শপিং টপিং আছে। তুমি ইরাকে বোলো আমিই একদিন সময় করে যাব। আইভি কথাটা বলতে পারল অথচ চাপা আঁচে তার ভেতরটা দপ দপ করছিল।

যাবার সময় অন্তরা প্রণাম করল। অনেকদিন আইভির এসবে অভ্যাস নেই। ভরতপুরে থাকাকালীন সমস্ত বাঙালী উচ্চবর্ণীয় নিয়মকানুন থেকে সে অনেকদূরে চলে গিয়েছিল। সে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল।

অঞ্জন বলল, প্রণাম করুক। তোমার আশির্বাদই ওর এখন ভরসা।

অঞ্জনের কথার ধরনে হাসি পেল আইভির। ওরকম কথা বলছ কেন? ওর ভাগ্য আমার আশির্বাদের অপেক্ষা করবে না।

আশির্বাদস্বরূপ হোক আর যাই হোক অন্তরার মাথায় হাত ছোঁয়াল আইভি। মেয়েটা মাথা নীচু করেই আছে। এই প্রথম মেয়েটার প্রতি তার স্নেহ জাগল। হয়তো সেইসময়ে অঞ্জনের সঙ্গে থেকে গেলে তারও এমনি মেয়ে হত। আইভি বলল, আবার এস। আমার ফ্ল্যাটটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো।

—হয়েছে। আমরা এর আগে এসে দেখে গেছি যে।

এরপর ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে আইভি ঘরে আসে। অনেক খাবার দিয়েছে ইরা। মাংস, লুচি, অনেকরকম মিষ্টি। অনেকক্ষণ খায়নি সে। তবু এ সব খাবারের গন্ধে তার গা ঘোলাতে লাগল। বাথরুমে খানিকক্ষণ সে বমি করার চেষ্টা করল। হল না। মনে হচ্ছে সারা ঘরটাই যেন খাবারের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে সে সামান্য রেহাই পেল। ঘরে একটা ধূপও নেই। কাল অঞ্জন এলে ওর সঙ্গে সে বাজারে বের হবে। এত জিনিস কেনবার আছে। সে কাগজকলম যের করে লিস্ট করতে বসল। কিন্তু অঞ্জনের সঙ্গে তো নেশার বস্তু কেনা চলে না। মদ্যপানের ইচ্ছে এই মুহূর্তে প্রবল। তবে কি সে তার কথা রাখতে পারবে না।

ভোরবেলায় চোখ খুলে আইভি অবাক হল। সত্যি সে ভরতপুরে নেই। সারারাত তার ভাল ঘুম হয়নি। আলফাল নানা স্বপ্ন দেখেছে। ভোরবেলাতে সে দেখছিল রিসেপ্সনে মুকুলের সঙ্গে তার খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছে। গৌতমী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। খুব রাগ হচ্ছে আইভির। গৌতমীর সামনে এইসব কথা কাটাকাটির মানে কী। সে চলে যেতে চাইছে। গৌতমী তাকে নানাভাবে আটকানর চেষ্টা করছে। যেন মজা দেখছে। আইভি কিছুতেই থাকবে না। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। গৌতমীর কাছ থেকে সে মুক্তি পেতে দেয়াল ঘেঁষে যেতে চায়। দেয়ালের ওপর মুক্তেশ্বর বিশাল ছবিটা ছিল সে খেয়াল করেনি। ধাক্কা লাগতেই হুড়মুড় করে দড়ি ছিঁড়ে ছবিটা তার গায়ের ওপর পড়ছে। মরে যাবে সে। ওটা পড়লে সে একেবারে শেষ। মুকুল একলাফে এসে তাকে আড়াল করে ছবিটা আটকেছে। সবটা পারেনি। কাঁচগুলো ভেঙে গেছে। মুকুলের হাতখানা রক্তে লাল।

ঘুম ভেঙে গেলেও বুকটা তিরতির করে কাঁপছিল। ভোরবেলায় ভরতপুরে যেমন মশারির ভেতরে থেকেই জানলা দিয়ে আকাশটা দেখত, এখানে তেমন চোখ খুলে দেওয়াল দেখতে হল আইভিকে। ভোরের আবছা আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। এটা তবে কলকাতা। এটা তবে তার ফ্ল্যাট। এখানে তবে আর কয়েক ঘন্টা পর অঞ্জন আসবে।

অঞ্জনের কথা ভাবতেই সে দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠল। রান্নাঘরে সপ্তাহখানেকের মত চা, চিনি, চাল, ডাল, ডিম সবই জোগাড় করা আছে। শুধু বাজারই নয়, স্টোভে কেরোসিন তেল পর্যন্ত মজুত। সবের ওপর হাত ছুঁইয়ে গেল আইভি। চা খেতে খেতেই ডাল ভাত চাপিয়ে দিল। অঞ্জন কি এখানে খাবে? নিশ্চয় নয়। ও যদি খেতে চায় বাইরেই খাওয়াবে। হাঁড়িতে যখন ভাত ফুটছিল, তার অদ্ভুত গন্ধ বের হচ্ছিল, ভুট ভুট শব্দ হচ্ছিল—তখন সেই শব্দ গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে, কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে কোথায় যে সুখের বুদবুদ তুলছিল—আইভি তার হদিশ পাচ্ছিল না। কেবল বুঝতে পারছিল এরকম অনুভূতি তার আগে কখনও হয়নি। তার জীবনে অন্য যেসব সাফল্য এসেছে সে সব যেন এর কাছে তুচ্ছ। মুকুলের কথা মনে হল আইভির। ও যদি কানের কাছে, 'তোমার বয়স হয়নি, বয়স হয়নি' না বলে যেত তা হলে হয়তো নিজের ভেতরে এত রূপান্তর হত না। মুক্তেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে সেও বুড়িয়ে যাচ্ছিল। এ কারণেই মুকুলের কাছে কৃতজ্ঞ সে। বেচারা মুকুল। মুকুল যেন একটা বিয়ে করে। ওর একজন সঙ্গিনী দরকার। নইলে ভরতপুরে থাকতে পারবে না ও।

অঞ্জন যথাসময়ে এল। আইভি স্নান করে ইস্ত্রিভাঙা শাড়ি পরে বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু অঞ্জন মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার ভয়ানক কাজ পড়ে গেছে। বাড়িতে ফোন এসেছিল অফিস থেকে। তেমন বুঝলে কাল ছুটি নেবে অঞ্জন। আজ যেন আইভি তাকে দয়া করে। অঞ্জনকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। হয়তো আইভির রাগ করার কথা ছিল। তবু কে জানে কেন, সেই গোপন রিনরিনে অনুভূতিটার জন্য কি না কে জানে আইভি শুধু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। অঞ্জনকে বিদায় দিতে তিনতলা থেকে একতলায় নেমে এল। আর সেইসময়ই অঞ্জন তাকে অবাক করে বলল, সে অফিস থেকে ফিরে এখানেই আসবে, আইভির কাছে রাতে থাকতে চায় সে।

আইভি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। তার মুখ গরম হয়ে যাচ্ছিল। অঞ্জন হয়তো রাতে এসেও বলবে থাকতে পারবে না। তবু এই বলাটুকু এবং বলেই তার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা আইভির চোখে লেগে থাকল। বারবার চোখের সামনে সে যেন নানাদিক থেকে দেখতে লাগল। অঞ্জন এই বয়সেও লজ্জা পায়!

একটু ধাতস্থ হয়ে আইভি নিজেই বাজার করতে বের হল। কিছুই তেমন চেনে না সে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাওয়া। আর একটু হলেই সে বাসের তলায় পড়ছিল। রাস্তার একটা কুলিমতো লোক তাকে হাত ধরে টেনে না সরালে। লোকটা তাকে ধমক দিয়ে কেটে পড়েছিল। আইভির মনে হচ্ছিল ও যেন ভরতপুরের লোক। নইলে তাকে এভাবে বাঁচাবে কেন? তার ও কী উপকার করেছে? আইভির ও হাতে কিছু দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে ও চলে গেছে।

এত ভিড়, এত ধোঁয়া সত্ত্বেও এই ঘটনা আইভিকে খুশি করে তুলল। না, কলকাতাতে সে থেকে যাবে চিরজীবন।

রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা শনি মন্দিরে সে পয়সা ছুঁড়ল। গ্রিলের ভেতর হাত ভরে ঘণ্টা নাড়াল। আপনা থেকেই হাত উঠে গেল কপালে। সংসার করতে চলেছে সে।

অনেক কেনাকাটা করল আইভি। খুব বেশিদূর যেতে হয়নি। আশেপাশেই পাওয়া গেছে সব। আজ সে রান্না করবে অঞ্জনের জন্য। কতদিন রাঁধেনি। সেভাবে রান্না করাই হয়নি জীবনে। ইরার মত রাঁধতে পারবে না সে নিশ্চয়। তবু অঞ্জনকে সে খাওয়াবে। অঞ্জনকে তার রান্না খেতেই হবে। আইভি তাই একটা রান্নার বইও কিনল। বাসনপত্র, দুটো ফোল্ডিং চেয়ার, টেবিল ট্যাক্সির মাথায় চাপিয়ে ঘরে ফিরে এল সে। তারপর লোক ডেকে সে সব তোলানো। বিস্তর কাজের পর ঘরে ফিরে সে ঘড়ি দেখল, চারঘণ্টা খোয়া গেছে তার।

জামাকাপড় ছেড়েই রান্নায় লাগল। কোনওরকমে রান্না করে ঘর গোছাতে বসল। নতুন কেনা জিনিসগুলো ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে লাগল। অঞ্জনের জন্য বিশেষ পছন্দ করে চেয়ার কিনেছে সে। দুজনে বসে চা খাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। এগুলো অবশ্য ডাইনিং হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। পর্দা কিনেছে সে। তবে সেগুলো লাগাতে দেরি হবে। ওয়াল হ্যাঙ্গিং টাঙানোর পেরেক পোঁতা দরকার। সেগুলো পরে পরে হবে। আপাতত অঞ্জনের জন্য বিছানার সুন্দর চাদর পাতল। চেয়ারের ওপর কুশন রাখল। ঘর ঝাড় দিল। এতক্ষণে ঘরটা ঘরের মত লাগছিল। আইভির বারবার দেখেও আশ মিটছিল না। অঞ্জন নিশ্চয় আরও অবাক হবে।

কাজ সেরে বিছানায় শুল আইভি। টেবিলের ওপরে রাখা ঘড়িতে সময় জানান দিচ্ছে। অঞ্জনের ফিরতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি। খুবই ক্লান্ত হয়েছিল আইভি। একটু ঘুমিয়ে নিলে ভালই হত। একটু সতেজ হত। কিন্তু ঘুমোবে কী, বারবার ঘড়িতে চোখ চলে যাচ্ছে। ঘড়ির ভেতরের হাঁসটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে জলে ডুবছে আর উঠছে। কিন্তু সময় সেভাবে যাচ্ছে কই? অঞ্জন আজ যদি একটু আগেভাগেই আসে।

আবার উঠে স্নান করল আইভি। খুব গরম কলকাতায়, ঘাম হচ্ছে। ভরতপুরের মত শুকনো গরম নয়। তবুও অসহ্য লাগছে। স্নান করে সুগন্ধি মাখল আইভি। এ সব তার অভ্যাসে ছিল না। আজই সে কিনে এনেছে। ভাবল একবার নাইটিটা পরে। কিন্তু কালকের ঘটনায় যেন নাইটিটার ওপরেই তার বিরক্তিভাব বেড়ে গেছে। ওটা এক নম্বরের অপয়া। শাড়িই পরল সে। কুশনে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে অঞ্জনের অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবল, ভাগ্যে অনিতাকে ভরতপুরে ভর্তি করতে হয়েছিল। নইলে অঞ্জনের সঙ্গে তো তার দেখা হত না। আইভি সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরতে চাইছিল, প্রাণপণে হোটেলের স্মৃতিকে সে ফিরিয়ে আনছিল। ভাবতে ভাবতে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল।

একবার তার খুব পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল। মুক্তেশ বলল, ও কিছু নয়, অ্যাপেনডিক্স। কাটতে হবে। কিন্তু কে কাটবে? মুক্তেশ বলল, ডাক্তাররা নিজেদের লোকেদের অপারেশন করে না। ইমোশনাল প্রবলেম হয়। তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। ওখানেই ভাল ডাক্তার দিয়ে অপারেট করাব। আইভি রাজি হয়নি। গোঁ ধরে বসেছিল মুক্তেশকেই তার পেট কাটতে হবে। মনে মনে বলেছিল, মরি যদি আপনার হাতেই মরব। রাজি করিয়ে ছেড়েছিল মুক্তেশকে।

অপারেশনের দিন যত এগিয়ে এসেছিল তত উৎফুল্ল হয়েছিল আইভি। অপারেশন টেবিলে সাদা চাদরের তলায় নগ্ন শুয়ে সে ভাবছিল কিছুতেই যেন তার জ্ঞান না চলে যায়। শরীরের অন্তর, অন্তরতম প্রদেশে ডাক্তারের স্পর্শের প্রত্যাশায় সে জেগে থাকতে চেয়েছিল।

এরপর কলিংবেল বাজলে সে ছুটে যায়। দীর্ঘ দীর্ঘ বছরের অতলান্ত অপেক্ষা নিয়ে তারা পরস্পরকে গ্রহণ করে।

শেষ পর্যন্ত রাতে অঞ্জনকে থাকতে দেয়নি আইভি। যেটুকু পায়, সেটুকুই সে অনেক বলে মনে করে। অনর্থক জটিলতা বাড়াতে সে চায়নি। অঞ্জন বাড়িতে বলেও আসেনি যে সে ফিরবে না। সে নাকি এমনই কতদিন অফিসের কাজে আটকা পড়ে রাত একটা দুটোয় ফেরে। ওরা নাকি চিন্তাও করে না তার ফলে। আইভি শোনেনি সে কথা। তারও অঞ্জনকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবে অঞ্জন এরকম শুরু করলে এক আধটি রাতের জন্য সারাটাজীবন না নষ্ট হয়। ইরা যদি তেমন ঝামেলা করে আইভির ভাল লাগবে না। কেড়েকুড়ে সে কিছুই নিতে জানে না। অবশেষে অঞ্জনকে সে বোঝাতে পারল। আইভির দূরদর্শিতায় সে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করল। সেই রাত্রে আইভি অঞ্জনকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ওদের বাড়ির একটু দূরে অঞ্জনকে নামিয়ে ফিরে আসে সে।

রাস্তায় অঞ্জন তার বাড়ির কথা বলছিল। বেশিরভাগই সমস্যার কথা। আইভি মন দিয়ে শুনছিল। অঞ্জনের খুব কাছে বসে থেকে এইসব সমস্যা শুনতে শুনতে আইভির মনে হচ্ছিল এগুলো যেন তারও সমস্যা। অঞ্জন প্রধানত তার বড় মেয়ে অন্তরার বিষয়ে কথা বলছিল। যে অন্তরাকে প্রথম দর্শনে তার তেমন মনে ধরেনি, তার সম্পর্কে অঞ্জনের মতো করেই ভাবতে থাকে আইভি। খুব স্নেহ জন্মায়। অঞ্জনকে বলে, তুমি আমার কাছে ওকে নিয়ে এস।

অন্তরা সম্বন্ধে অঞ্জন বলে, ওর বাস্তবজ্ঞান একেবারে নেই। বাতাসপুরে ওর ছেলেবেলা কেটেছে কিনা। গাছপালার মধ্যেই বড় হয়েছে। ভালমন্দের বোধ তাই ওর কম। কোনটাতে নিজের ভাল আর কোনটাতে মন্দ কিছুই বোঝে না সে। আইভি হাসে। তবে কি মেয়েটা অজান্তেই তার স্বভাব পেয়েছে? কথাটা বলেও ফেলে। বলে, মেয়েকে নিয়ে যদি তাহলে তোমার এত ঝঞ্ঝাট, তা হলে আমাকে নিয়ে তো তুমি ঝালাপালা হয়ে যেতে।

—না না, — অঞ্জন প্রতিবাদ জানায়। তোমার মতো হলে তো বেঁচে যেতাম। অতবড় হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়েছিলে তুমি। দেখেছি তো লোকে তোমায় কত মান্য করে। তোমার সঙ্গে কি ওর তুলনা চলে?

আইভির ভেতরে ভরতপুর হসপিটালটা বেলুনের মতো ফুলে উঠে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে মিলিয়ে যায়। একবার কি ফোন করা উচিত ছিল মুকুলকে? না, যখন সে ছেড়েই এসেছে তখন আর ও দিকে তাকাবে না। বরং এই ভাল, সকলে ভরতপুরের ম্যাডামের গল্প বলবে। তারও গর্ব হবে। যতদিন সে ছিল, যতদিন তার পরিচালনায় ছিল ততদিন ভরতপুরের উন্নতিই হয়েছে। অবনতির দিনগুলোর সঙ্গে সে যুক্ত হতে চায় না। মুকুল যা ইচ্ছে করুক।

অঞ্জন বলছে — অনিতাকে নিয়ে আমার কোনও সমস্যাই ছিল না। যা বলেছি, তাই শুনেছে। যাকে বিয়ে দিয়েছি তাকেই করেছে। ওর পছন্দ অপছন্দ নেই। আমাদের ওপর বেশ নির্ভর করতে পারে। দ্যাখো ওর তো ভাল বিয়ে হল।

আইভি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তারপর ভাবল অঞ্জন নিশ্চয় অনিতার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে অনেক বেশি কিছুই জানে। ব্যাপারটা তো তাদের কাছে আন্দাজ ছাড়া কিছুই ছিল না। মুকুলের কাছে অনিতা সেরকম কিছু সত্যি সত্যিই বলেছিল কি?

আইভির মনের ভাব বুঝেই অঞ্জন বলে, দ্যাখো পরের বাড়ি তো নিজের বাড়ির মতো কখনওই হবে না। মেয়েদের তো একটু মানিয়ে নিতে হয়। ওদের অনেক টাকাপয়সা, সেরকমই জীবন ওদের। হাজার হোক, অনিতা তো মানিয়ে নিয়েছে। সে তো ফিরে আসেনি। অন্তরাকে নিয়ে যে ভাবে ভুগতে হচ্ছে।

—কী হয়েছে তোমার বড় মেয়ের? আইভি ব্যগ্র হল।

অঞ্জনকে হতাশ দেখাল। বলল, কী বলব তোমায়। অল্প বয়েসেই পেকেছে। কোথাকার একটা বাজে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করল। তেমন লেখাপড়াও জানে না। কাঠের গোলা আছে। ওই ছেলেকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। আমি আমার এক বন্ধুর ছেলেকে পর্যন্ত নিয়ে এলাম। দেখেই পছন্দ হবে এমন। কিছুতেই মেয়ে শুনল না। এমনকি ওর মা পর্যন্ত মেয়ের কথায় নেচে উঠল।

—তারপর, আইভি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল।

—তারপর আর কী, একদিন বিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। তাও দ্যাখো, সে সময় মাথা কেমন খেলেছিল, আমি একটা টাকাপয়সা ছোঁয়াইনি। গয়নাও তেমন দিইনি। ভেবেছিলাম, ছেলেটা প্রতিষ্ঠিত হোক, তারপর সব দেব। আমার সব জিনিস তো দুই মেয়ের জন্যই। যদিও অনিতাকে পার করতে আমাকে লোন করতে হয়েছিল কিছু। তো তারজন্য আমার আক্ষেপ ছিল না।

কিন্তু অন্তরার বিয়ের পর আমরা তো কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না। ইরার কাছে কাজের মেয়ে খবর দিত ফ্ল্যাটের অন্যান্যরা কী বলছে। খুব খারাপ লাগত। ও যখন মাঝেমাঝে এ বাড়িতে আসত, তখন আমাদেরও বড়ো দুঃখ হত। ওর পোশাক আশাক আর আগের মতো নেই।

আমার দুই মেয়েকেই ছোটবেলা থেকে ওর মা সাজিয়েছে গুজিয়েছে। তো সেসবের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝতাম অভাবে আছে। বিয়ের আগে অন্তরাও সব কিছু জানত না। কাঠের গোলাটা ছিল ছেলের দাদার। ভাইয়ের বিয়েতে তার মত ছিল না। দাদার ব্যবসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ভাইকে। অন্যান্য ব্যবসা করার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু ব্যবসা কি একদিনে দাঁড়ায়?

অন্তরাকে আসলে ওরা টাকা আনতে পাঠাত। ভাবত চাইবামাত্র বাবা দেবে। ইরাও কান্নাকাটি করত টাকা চেয়ে। আমি কখনওই দিইনি। ইরার হাতে তো তেমন টাকা থাকত না। ছোটখাট গয়নাগাটি দিয়ে থাকতে পারে। যাই হোক তেমন কিছু আদায় করতে পারেনি। আর জানই তো আমার মেয়েরা কত আদরে মানুষ। আমি ভাবতে পারি না কী কষ্ট পাচ্ছিল ও। আর আমিও দেখতে পারছিলাম না। তবু আমি কিছু বলিনি। রোগা হয়ে যাচ্ছিল। একটা ছোট ঘরে থাকত। বস্তির মতো বাড়ি। ছেলেটার তেমন রোজগারপাতি ছিল না বলে অন্তরার সঙ্গেও কেউ ভাল ব্যবহার করত না। তার ওপর পাওনাদারদের উৎপাত। আমার মেয়ে কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে আমিই কল্পনা করতে পারি না।

একদিন ইরাই থাকতে না পেরে বলল, তুই চলে আয়। এ ভাবে তুই বাঁচবি না। তবুও বেশ কিছুদিন ও ছিল। তারপর তো একেবারে চলে এল। আমি ভেবেছিলাম আর কিছুদিন দেখি, হয়তো ছেলেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে টুকিয়ে দিতে পারব। তো ছেলেটা আমার সঙ্গে দেখাই করল না। অন্তরা কে তো উকিলটুকিল ধরে ডিভোর্স করিয়ে দিলাম। তারপর এত চেষ্টা করছি বিয়ে দিতে, হচ্ছে কোথায়। মেয়েটা শান্ত ছিল, আরও যেন কেমন হয়ে উঠল। কোথাও বের হতে চায় না। কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ইরা জোর করে পাঠিয়েছে, তাই তোমার কাছে এসেছে।

তারপর এখন কী শুনি জান—ছেলেটা নাকি মোটামুটি দাঁড়িয়েছে। কাঠের ব্যবসা করছে। কোথায় নাকি জমি কিনেছে অনেকটা। ইরাই কোত্থেকে খবর পায়। আমাদের এখন দোষ দেয়। বলে আমি নাকি একটু সাহায্য করলে এমন ঘটনা ঘটত না।

কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি বলছি আই, ও ফিরে আসুক—আমি এতটুকু চাইনি। আমার মেয়ে ডিভোর্সি—একথা বলতে আমার যে কী লজ্জা লাগে তুমি জান না। আমার প্রচণ্ড সম্মান আছে। আমি কীকরে এটা চাইতে পারি। আজ ইরা বলে অন্তরার দুর্ভোগের জন্য নাকি আমি দায়ী। কিন্তু তাই যদি হবে তা হলে ও কেন ওর স্বামীর ঘর ছেড়ে ফিরে এল? ও যদি আর না ভালবাসতে পারে তার জন্যেও কি আমি দায়ী?—রাগে অভিমানে অঞ্জনের গলা ভেঙে এল। তুমি বল?

আইভি ওর পিঠে নিজের হাত বিছিয়ে বলেছিল, শান্ত হও অঞ্জন। তোমার থেকেও মেয়েটার কত কষ্ট সেটা ভেবে শান্ত হও। আমাকে তুমি এতদিন তো এসব কথা বলনি।

—কত অশান্তির কথা বলব বল। অশান্তি তো একটা নয়। বলতে বলতে অঞ্জন আইভির দিকে তাকিয়েছিল। তুমি না এলে, তোমাকে না পেলে আমার যে কী হত। হয়তো সুইসাইড করতে হত।

আইভি শুয়ে শুয়ে অঞ্জনের কথা ভাবে। অন্তরার জন্য কষ্ট হয়। ওর বাবার জন্যও। অঞ্জন বলছিল, জান, আমাকে সবাই ভুল বোঝে। অফিসে এত লোককে সামলাই। নিজের লোকেদের কেন পারি না বলতো। একমাত্র তোমার কাছেই আমি ভাল থাকি, প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারি। বাড়িতে যে কী পরিবেশ! অথচ...

—অথচ কী অঞ্জন?

—আমাকে আর বলিও না, আমি তোমার কাছে যথেষ্ট অপরাধী। ও দুহাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে।

আইভির ভেতরের সব কষ্ট, সব অতৃপ্তি অঞ্জনের একটিমাত্র কথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। সে যেন সারাজীবন এই একটিমাত্র স্বীকারোক্তির অপেক্ষায় ছিল। তার ভেতরে গলন শুরু হয়েছিল। এবার অন্তত অঞ্জন স্বীকার করেছে। এইটুকুর জন্যই তো আইভির কলকাতা আসা। অঞ্জন যখন এভাবে কথা বলে তখন তার মনে হয় তার জীবনে আর কিছু না পেলেও চলবে। আরও ভাবে আইভি। জীবনের মধ্যপথে অঞ্জনকে পাওয়ার সার্থকতা খোঁজে। ভাবে এইসময় অনেক অভিজ্ঞতার পর তাকে অঞ্জন পেয়েছে বলে ইরার সঙ্গে তার ফারাক বুঝতে পেরেছে। নইলে তাকে বিয়ে করে আজীবন ইরার জন্য তার আফসোস হত। সুন্দরী বউ না হবার আক্ষেপে মরে যেত। অঞ্জন যে বড় রূপতৃষ্ণ পুরুষ। আইভি তো সুন্দরী না। হয়তো ইরাদের রূপে অরুচি ধরেছে বলেই আইভির সৌন্দর্যকে সে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

আক্ষেপ মিটে গেছে আইভির। সে অনায়াসে অঞ্জনের পাশে ঘুমোতে পারে। অঞ্জনের সবকিছুকে সে অধিকার করতে পারে। জয়ী আজ আইভি। পরিপূর্ণ আজ। তাই হয়তো অনায়াসে রাতে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারে তাকে। কণামাত্র পেয়ে যদি ইরা খুশি থাকে তো থাক না।

অঞ্জনের মেয়ে বলেই অন্তরার জন্য খারাপ লাগে। মেয়েটা অস্বাভাবিক সেজেছিল। মোটেও ভাল দেখাচ্ছিল না। হয়তো এই কারণেই কেউ পছন্দ করছে না। অঞ্জন যদি চায় পাত্রপক্ষ দেখতে এলে আইভি রুচিমতো সাজিয়ে দিতে পারে। আহা ওর একটা ভাল বর জুটুক। সংসার করতে করতে বেরিয়ে আসার, পেয়ে হারানোর কষ্ট বোঝে আইভি। মাথা রাখার আর একটা চওড়া বুক ছাড়া সে কষ্ট কিছুতেই যায় না। আইভি যদি মুক্তেশের মতো মানুষ না পেত, কাজে ডুবে না যেতে পারত তাহলে কি সে অন্তরার মতো হয়ে যেত? বিকট সেজে বসে থাকত? আইভির যদি তেমন সংসারী বন্ধুবান্ধব থাকত তো অন্তরার জন্য নিশ্চয় পাত্র জোগাড় করে ফেলত। সত্যি ওকে নিয়ে বড় চিন্তা অঞ্জনের।

অঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে আইভি। এভাবেই তার দিনগুলো চলে যায়। অঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করে, উপহার কেনে। অঞ্জনের অফিস, পরিবার সবের চিন্তায় সে ভাগ বসায়। হয়তো দিনের মধ্যে ঘণ্টা ছয়েক অঞ্জন তার সঙ্গে কাটায়। বাকি ঘণ্টাগুলো সে সেই সময়ের কথা ভেবেই কাটিয়ে দেয়। খুশি আইভি। অনেকদিন সে অনেক পরিশ্রম করেছে। এখন তার অফুরন্ত বিশ্রাম। এই বিশ্রামের মাঝখানে ভালবাসা পাবার চেয়ে বড় পাওয়া আর কী আছে। তবু ভরতপুরের আইভি বলতে থাকে। ইরার অধিকারে হাত দিতে চায় না এমনও নয়। মাঝেমাঝে সেও স্বপ্ন দেখে যদি ইরা তার মতো একা থাকে, আর অঞ্জন তার সঙ্গে। অঞ্জনকে আজকাল সে একথা জানাতেও দ্বিধা করে না। খুশি হয় অঞ্জন। আইভিকে সে এমন করেই পেতে চেয়েছিল। একটা গভীর নেশার মধ্যে তারা তলিয়ে যেতে থাকে। কেবল একটাই সমস্যা। ইরা এই শহরে থাকে। সে সবকিছুই জানে। অঞ্জনের পক্ষে তো সংসার ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আইভি নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারে না কেন? তীব্র আবেগের লাগাম টানতে না পারার উত্তেজনায় সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পর অঞ্জনকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হল। মাত্র চারদিন। তবু এই কদিন আইভির কিছুতেই কাটছিল না। ফ্ল্যাটে কারুর সঙ্গেই যেচে সে আলাপ পরিচয় করতে যায়নি। একটু দ্বিধা যে তার ছিল না এমনও নয়। তার জীবন নিয়ে লোকে কৌতূহল দেখাক এটা কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তার ওপর তার সত্যিকারের একার জীবন হলে কিছু বলার ছিল না। অঞ্জন সম্পর্কে যদি কেউ কুৎসা রটায়। আইভি কারুর সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বলতেও আসে না। অঞ্জন বলে তার চেহারা, পোষাক আশাকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার আছে যে লোকে সাহস পায় না। ভরতপুরে নানা ধরনের লোকের মাঝে কাজ করতে করতে, লোকের গায়ে পড়া থামাতে আইভি নিজের যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিল তাকেই কাজে লাগায় সে। কিন্তু মাঝেমাঝে এও তার অসহ্য হয়। বিশেষত অঞ্জন না থাকলে সে কী করবে কিছুই খুঁজে পায় না। ঘর গোছানো ছাড়া কোনও কাজ নেই। তাও তার ইচ্ছে করে না।

তখন মাঝেমাঝে সে রাস্তায় উদভ্রান্তের মত হাঁটতে থাকে। তালা খুলে পাঁচতলার ওপরে ছাদে উঠে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। সময় নিয়েই তার সমস্যা। কিছুতেই যে সময় কাটে না। অঞ্জন বলে গেছে ইরার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তাও ইচ্ছে করে না। ভয়ও হয়। অন্য কিছু নয়, ওর মুখ দেখে যদি ভেতরের কষ্ট বেড়ে যায়। আইভি মাঝেমাঝে যে কোনও কাজের কথা ভাবে না এমনও নয়। অঞ্জন বারণ করে। বলে কলকাতার পরিবেশ আলাদা। এখানকার প্রাইভেট নার্সিংহোমে আইভির মতো মেয়ে কাজ করতে পারবে না। তাছাড়া ভরতপুরে তার যে পোস্ট ও পজিশন ছিল সেটা তো এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। সাতপাঁচ ভেবেই কাজ খুঁজতে যায়নি আইভি। অসময়ে আইভি যে ভালবাসা পেল, তাকে বাঁচিয়ে রাখাই তো তার একমাত্র কাজ।

তবু একটা কাজের সুযোগ পেয়ে যায় আইভি। হঠাৎই। একদিন দুপুরে সে কেনাকাটা সেরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। আর চারতলার একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে যায়। সে ধুপধাপ করে দ্রুত নামছিল। আর ধাক্কা লাগার পর সে মুখে হাত দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে থাকে। আইভি হতভম্ব হয়ে যায়। মেয়েটিও আইভিকে সিঁড়িতে রেখে আগের মত স্পিডে নামতে থাকে। আইভি শোনে মেয়েটা বাবাগো, বাবাগো বলে কাঁদতে কাঁদতে নিচে যাচ্ছে। মেয়েটাকে আইভি কয়েকবার দেখেছে। কলেজে পড়ে বলেই মনে হয়। ভদ্র, শান্ত। ওর আচরণে আইভি বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। নিজের অজান্তেই সে চারতলায় উঠে যায়। ওদের ঘরের দরজা খোলা। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা করুণ মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আইভি জিজ্ঞেস করে— কী হল?

মহিলা বলে, দেখুননা, মৌ-এর বাবা মারা গেলেন।

— মারা গেলেন মানে? আইভি প্রশ্ন করতে করতে সটান ঘরে ঢুকে যায়। ঘরে খাটের মধ্যে শোয়ানো একজন বয়স্ক মানুষ। মৌ-এর বাবা। সম্ভবত মৌ-এর মা তিনি, নিচে বসে আছেন, প্রায় অচেতন অবস্থা।

মহিলা বলতে থাকেন, দেখুন তো দুপুরবেলা। পুরুষ মানুষেরা সব অফিসে গেছেন। মৌ নীচের লোকজনকে ডাকতে গেল।

আইভি বলল, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে? একটা ফোন করুন না। অভ্যাসমত আইভি ততক্ষণে মৃতদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পালস দেখতে শুরু করেছে। না, কোনওই পালস নেই। তবে শরীর গরম। নীচের থেকে প্রচুর লোকজন উঠে আসছে। ভিড় হয়ে গেছে চারিধার। মৌ কেঁদেই চলেছে। আইভি সেই মহিলাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোকের কী হয়েছিল?

—হার্টের প্রবলেম ছিল। কিছুদিন আগে ওনার একটা অপারেশনও হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগেই বাড়ি ফিরেছেন। এক্ষুনি ব্যাপারটা হল। হঠাৎ খুব জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে একেবারে সব শেষ হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। ভদ্রমহিলা এইসব কথা আরও অনেকজনকে বলছিল। সবাই দূর থেকেই দেখছিল ভয়ে ভয়ে। আইভির কী যেন মনে হল। হঠাৎ সে মৌ-এর বাবার বুকে একটা হাতের ওপর আরেকটা হাত রেখে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ শুরু করে। সবাই তাকে হাঁ করে দেখতে থাকে। আইভির নার্ভাস লাগে। এরকম তার কখনও হয়নি। লোকটা হয়তো বেঁচে নেই, তবু যদি বেঁচে যায়। মৌ তার বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কান্না বন্ধ করে। আইভি মৌকে আদেশ করল— দাঁড়িয়ে আছো কী? ডাক্তারকে ফোন করেছ?

— করেছি, উনি নেই।

— নেই মানে? তাহলে অন্য ডাক্তার ডাকো। পাড়ায় কেউ, কোনও ডাক্তার বসেন না? কাউকে একটা ডেকে আনো।

একটা লোক ছুটল ডাক্তার আনতে। ওরা ডেথ সার্টিফিকেটের কথা বলছিল। মৌ-এর মাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য ঘরে। হঠাৎ লোকটা জোরে শ্বাস নিয়ে ওঠে। আইভি জোরে ম্যাসাজ চালাতে থাকে, লোকজনের মুখ থেকে বেঁচে আছে, বেঁচে আছে শব্দ শোনা যায়। আইভি বলে, এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। কয়েকটা ওষুধ কিনে আন। ইঞ্জেকশন দিতে হবে। উনি বেঁচে আছেন। লোকটির শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

এরপর ডাক্তার এসেছিল। আইভির কিনে আনা ইঞ্জেকশনই দিতে হয়েছিল। হসপিটালে রওনা করে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে এসেছিল। ডাক্তার, প্রতিবেশি সকলের প্রশংসা নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল। মুহূর্তে সকলের কাছে দেবী হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই বলছিল : আপনি যদি না থাকতেন। মৌ-এর মা, বেশ বয়স্ক মানুষ, তাকে জড়িয়ে কতক্ষণ বসেছিলেন, মুখে কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। ঘরে ফিরে আইভি ভেবেছিল এই যাত্রা সে বাঁচাল লোকটাকে। একটা প্রাণ রক্ষা করার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই নেই। বহুদিন পর তার মন কানায় কানায় ভরে যাচ্ছিল। আর প্রার্থনা করছিল এ যাত্রায় যখন লোকটা বেঁচে গেল, তখন যেন ভালয় ভালয় ফ্ল্যাটে ফিরে আসে।

বেশিদিন আইভিকে একা কাটাতে হয়নি। তিনদিন পরই সন্ধ্যের সময় অঞ্জন ফিরে এল। অথচ চারদিন বাইরে থাকার কথা ছিল। ম্যানেজ করেছে কাজ ও। এ রাতে ও আর কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না, এখানেই থাকবে। আইভও তো তাই চায়। আইভির আবেগকে ছিঁড়ে সে এই প্রথম রাতে বাড়ি ফিরবে না।

অঞ্জন আসামাত্র মৌ-এর বাবার ঘটনাটা তাকে বলল। আইভি ভেবেছিল তার প্রতিবেশিদের মুখচোখের প্রতিফলন দেখবে অঞ্জনের মধ্যে। কিন্তু অঞ্জন অন্য কথা বলল। বলল, ব্যাপারটা ঠিক হল না আই। এমনি মানবিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে সব ঠিকই আছে, তুমি তোমার যোগ্য কাজই করেছ। কিন্তু আমার ভয় অন্য জায়গায়। এরপর তোমার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া বেড়ে যাবে। আর বুঝতেই পারছ এতে আমার সমস্যা বাড়বে।

— সেসব আমি ঠিকঠাক ম্যানেজ করব দেখ। অঞ্জনের টাইটা খুলতে খুলতে আইভি বলেছিল : আমার ওপর তুমি আস্থা রাখতে পার না কেন বলতো। তোমার যদি কোনও ক্ষতি হয় তো আমি সামলাব। ইরাকে তো একমাত্র ভয় তোমার, নাকি? কিন্তু অঞ্জন, ইরা নাহয় একটু রাগ করুক। ও তো অনেকদিন তোমাকে পেয়েছে, অনেকদিন।

অঞ্জন আইভির কথা শুনে অসহায়ের দৃষ্টিতে তাকায়। অঞ্জনের অসহায়তা নিয়ে যেন খেলতে থাকে আইভি। এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠে। উঠতে হয় আইভিকে অঞ্জনকে ছেড়ে। মৌ।

— আপনাকে জানাতে এলাম দিদি, বাবা ভাল আছেন অনেকটা। আর কয়েকদিন থাকতে হবে। কিন্তু বিপদ কেটে গেছে— ডাক্তাররা বলছেন। সেদিন যদি আপনি না থাকতেন, বাবাকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

মৌকে খুব ভাল লাগছে আইভির। সেই দিনের কান্নাভেজা মুখের পর আজ যেন রোদ্দুরে ঝলমল করছে। মৌ-এর গলা শুনে আইভির পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। মৌ-এর বাবা ভাল আছে শুনে তিনিও বেজায় খুশি। বললেন, আপনি আমাদের এই বিল্ডিং-এ আছেন— এটাই যে কতো ভরসার কথা। ভদ্রলোক মৌ-এর বাবা মারা গেছেন ভেবে সেদিনকার সকলের আচরণ কেমন হয়েছিল সেসব খুব মজা করে বলছিলেন। সেভাবে আইভির সঙ্গে এই প্রথম কথা ভদ্রলোকের। কিন্তু খুব হাসাতে পারেন। ওরা তিনজন সবকিছু ভুলে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। মৌ বলল : একদিন হসপিটালে দেখতে যাবেন বাবাকে। হসপিটালে সকলে এখন আপনার কথা জানে।

অঞ্জন বিরক্ত হল। দেখলে তো, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম। এরা তোমাকে ডাক্তার ঠাউরে নিল। এরপর সর্দিকাশি যার যা হোক তোমাকে ডাকবে। মিডলক্লাস মেন্টালিটির পরিচয় তো তুমি পাওনি। ভরতপুর তো অন্য পৃথিবী। এখানকার লোক সাংঘাতিক গায়ে পড়া।

অঞ্জনের কাছ থেকে দূরে চেয়ার টেনে বসে অঞ্জনের ছেড়ে ফেলা জামাগুলো গুছিয়ে ফেলছিল আইভি। জামাকাপড়ের মধ্যে অঞ্জনের গায়ের গন্ধে এক ধরনের আবেশ তৈরি হচ্ছিল। সেই আবেশ ভেঙে মুখ তুলে মৃদু হেসে আইভি বলল— ভুল করছ তুমি। এই যে দুদিন ছিলে না, আর সবসময় তো থাকও না। বিপদআপদ হলে ওরা ছাড়া কে আছে বল?

— বিপদআপদে ওরা তোমায় দেখাশোনা করবে, তুমি আশা কর আই?

— করিনা, কিন্তু এত একা তো কখনও থাকিনি। আইভির গলায় ব্যথা বেজে উঠল। বলতে গিয়ে কে জানে কেন চোখ ছলছল করে উঠল। আর এইসময় তাকে অসম্ভব আকর্ষণীয় লাগল বলে অঞ্জন দুহাতে তাকে বেঁধে ফেলল। মুখ দিয়ে সর্বাঙ্গ খুঁড়তে লাগল। যেমন করে মাটি খুঁড়ে পশুরা খাদ্য খোঁজে।

আইভি অঞ্জনের শরীরের আশ্রয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিল। সর্বস্ব সমর্পন করেছিল সে। আস্বাদ্য কিছু সে পাচ্ছিল কি পাচ্ছিল না সে দিকে তার মনযোগ ছিল না। সে নিজেকে উপুড় করে দিতে চাইছিল। দেওয়ার আনন্দেই সে মশগুল হয়ে উঠেছিল।

পাশাপাশি শুয়েছিল তারা। জানলা দিয়ে আসা হাল্কা রূপালী আলো চাদরের মত গায়ে বিছিয়ে ছিল। ছোট খাট। পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিল তারা। প্রথম যৌবনের হোটেলের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি আইভি। হয়তো স্মৃতি বলেই তা মায়াময়। অঞ্জনও যেন অন্যরকম। দুয়ের মধ্যে কোথাও মিল পায় না। এই পুরুষের জন্যই কি তার অপেক্ষা ছিল?

অঞ্জন বলল, তুমি আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কর। আমি জানি একা থাকতে তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, ওখানে এতজনের মাঝখানে ছিলে। অভ্যাস নেই এভাবে একা থাকার। তুমি তো বুঝছো না — এই কলকাতা শহরে কে কার— যার তার সঙ্গে ভাব কোরো না।

আইভি উত্তর দেয় না। অঞ্জনের কথাগুলো বড় মোলায়েম হাল্কা, তুলোর মতো ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে।

— তুমি বড় সরল আই। ইরা তোমার মতো নয়। খুব হিসাবী।

অঞ্জনের গায়ের ওপর ফেলে রাখা আইভির হাত খসে পড়ে। এখন এই মুহূর্তে ইরার কথা কেন? অঞ্জন কি কখনওই, কিছু সময়ের জন্যেও ওকে ভুলতে পারে না।

— তুমি বিশ্বাস কর, ইরাকে ছেড়েও হয়তো তোমার কাছে আসতে পারতাম, কিন্তু মেয়েটা আছে যে। ওর গতি না করে আমি মরতেও পারব না। অঞ্জন আইভির হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নেয়। তুমি কোনও কথা বলছ না কেন আই?

— কী বলব বল।

— আমার মেয়েটাকে একটু উদ্ধার করে দাও।

— কীভাবে করব বল। ও তো আমার কাছে থাকে না। কাছে থাকলেও কতটুকু পরিবর্তন করতে পারতাম? হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মা-ই ওকে ঠিক করে দেবে। তাছাড়া কী জান, এসব ক্ষেত্রে সময়ই সবচেয়ে বড় ওষুধ। দেখ সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

— তোমাকে তো বলিনি আই ইরার কথা। অনিতাকে তোমরা প্রায় সুস্থ করে দিলে, তোমাদের জন্য ও মা হতে পারল। এতে তো ইরা খুব খুশি। কিন্তু যেই শুনল তুমি কলকাতায় থাকতে আসছ, আর আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। রিলেশনটাতো বুঝতে পারে। বোকা তো নয়।

অঞ্জনের হাসি সে অন্ধকারেও ধরতে পারে। শক্ত হয়ে গুটিয়ে যায়

আইভি। কানদুটো উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

— ইরা তো খুব রাগারাগি করছিল। আমি ওকে কী বলে শান্ত করেছি জান? বলেছি তুমি অন্তরার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে।

— কী করে তুমি একথা বললে। আইভি উঠে বসে কপালের কুঞ্চন নিয়ে।

— তুমি একটু মুকুলকে বল না!

— মুকুল? মুকুলের হাতে কি পাত্র আছে? ও কি এও ঠিক করে দেবে?

— না না সেকথা বলছি না। মুকুলকে বল না অন্তরাকে বিয়ে করতে।

— কী বলছ অঞ্জন? তুমি মুকুলের বয়স জান। আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের ছোট। তোমার কি মাথা খারাপ?

— আমি জানি। অনিতার কাছে সব শুনেছি। তবু আই অনিতার মতো মেয়ে তার দিদিকে তার মাকে বলে গেছে, মুকুলের মতো লোক হয় না। আর আমিও তেমন কাউকে পাচ্ছি না।

— এটা কি ছেলেখেলা? আইভি উত্তেজিত হয়। আমি ধরে নিলাম মুকুল লোক ভাল। তাতেই কি অন্তরার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়।

— কেন দেওয়া যায় না? ও তো ভীষণ পুরুষালি। দেখে বয়স বোঝাও যায় না। অনিতা ওর মায়ের কাছে কী বলেছে জান — বলেছে ডাক্তার বোসের যে প্রেমে পড়বে না সে মেয়েই নয়।

আইভি চুপ করে গেল। একবার ভাবল বলে তোমার মেয়েকে অতিরিক্ত যত্নআত্তি করেছে বলে ও একথা বলছে। যত্নআত্তি করেছে ও আমারই জন্য। তা দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। তবু বলল না সে। অঞ্জনের দুই মেয়েই বড় পাকা।

— তুমি একটু মুকুলকে বল। ওর তো ডিভোর্স অনেকদিন আগেই হয়েছে। তুমিই বল আই এরকম ডাক্তার পাত্র আমি আর কোথায় পাব?

অঞ্জন তার হাতের ওপর মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে কথা বলছিল। আইভি নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষা চেয়ারে। সে অঞ্জনের দিকে স্থির তাকিয়েছিল। মাথাটা তার যেন কাজ করছিল না। অঞ্জনের কথাবার্তা আজ যেন সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

— আমি জানি তুমি বললেই একমাত্র কাজ হবে।

— কীভাবে? মুকুলের কি আমি গার্জেন? আমি বললে মুকুল শুনবেই বা কেন? তাছাড়া ভরতপুরের সঙ্গে তো সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছি।

— তুমি তো রেজিগনেশন উইথড্র করেছ বললে।

— ব্যাপারটা ওপরে ওপরে তাই। কিন্তু আমি সব ছেড়েই এসেছি, ওখানে আর ফেরত যাব না।

— কিন্তু তোমার ওখানে বিরাট জায়গা। আমি তো ডক্টর বোসকে ফোন করি। উনি তো আমার কথা শুনতেই চাননা। কেবল তোমার খবর নেন।

— তুমি ওকে ফোন করেছিলে, বলনি তো।

— এই তো গতকাল ওখান থেকে করেছি। তার আগে ইরা অনিতাকে দিয়েও করিয়েছে। তুমি আসার পর উনিই ফোন করে তোমার পৌঁছানর খবর নিয়েছিলেন। সেটা তালগোলে বলতে ভুলে গেছি।

— এটা ঠিক করনি অঞ্জন।

— আসলে তোমার কাছে মুকুলের কথা শুনে মনে হত, তুমি ওকে অপছন্দ কর। কিন্তু মুকুল তোমাকে সে চোখে দেখে না।

— মানে? কী বলতে চাইছ তুমি? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল সে।

— ও তো আমার কোনও কথা শুনতেই চায় না। কেবল তোমার সম্পর্কে জানতে চায়। ও তোমাকে তো বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে মনে হল।

ধপ করে বসে পড়ল আইভি। অঞ্জন বলতে লাগল— প্লিজ আই, তুমি একটু ওকে রাজি করাও। আমি বলেছি ওকে। ফোনে ওর তাই শুনে কী হাসি। হো হো করে হাসছে। ভাবছে আমি ইয়ার্কি মারছি। আমাকে বলছে, আপনাকে কি ম্যাডাম বলেছে যে আমি বিয়েপাগলা? অঞ্জন কথা বলতে বলতে হাসছিল। আইভি বড় গম্ভীর। অঞ্জন ওর পাশে এসে বসল। কাঁধে হাত রাখল। পাথরের মত ও শক্ত।

— তুমি চাওনা আই অন্তরার একটা ভাল বিয়ে হোক? অঞ্জনের চোখেমুখে অনুনয়। আইভি শুধু প্রশ্নচিহ্নযুক্ত চোখ উঠিয়ে ওকে দেখল।

— তুমি আমার দিকটা বুঝতে চেষ্টা করছ না আইভি। অঞ্জনের গলা এই প্রথম কঠিন শোনাল। দ্যাখো তোমার জন্য আমি করব, তুমি আমার জন্য করবে— এর মধ্যে তো নতুন কিছু নেই। আমরা অনেক ভেবে দেখেছি মুকুলই ওর পক্ষে আইডিয়াল হবে। বয়সের পার্থক্যটা অনেকসময় সুখি হতে সাহায্য করে।

— খুব ভাল কথা। তো তোমরা এরমধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন? পেশেন্ট থাকার সময় তোমার ছোট মেয়ের সঙ্গে ও যথেষ্ট সম্পর্ক ভাল হয়েছিল। ওই রাজি করাতে পারবে, আমি পারব না। আইভি হাত জোড় করে। ও আমাদের রিলেশনটা জানে। এখানে আমার স্বার্থ আছে বলে ও মনে করবে। তাছাড়া আমি যতটুকু মুকুলকে চিনি, ও এ ধরনের মেয়ে বিয়ে করবে না।

— তাহলে তোমারই ইচ্ছে নেই, তাই বল। কেন, ইরার মেয়ে বলে?

— অঞ্জন! থরথর করে ঠোঁটদুটো কাঁপছিল আইভির। চোখ উথলে পড়ছিল জলে। আর কোনও কথাই তার বলার মতো ছিল না।

রাতে থাকার কথা ছিল অঞ্জনের। থাকল না। দুদিন অঞ্জনকে সবসময়ের জন্য কাছে রেখে পরিপূর্ণ দাম্পত্যের স্বাদ চেয়েছিল আইভি। হল না। মধ্যরাতে জামাকাপড় পরে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আইভির কোনওভাবেই তাকে ধরে রাখার ক্ষমতা হল না।

সাধ মিটল না। যে ফ্ল্যাটটা একদিনেই তার নিজের হয়ে উঠছিল, বড় ঘেন্না লাগছিল সেটাকে। বড় শূন্য সব কিছু। মৌ সকালবেলায় তার বাবাকে দেখতে যাবার সময় তাকে ডেকেছিল। সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল — আইভি যায়নি। বস্তুত মৌএর সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেনি সে। নিজের কাছে সমস্ত কিছু সে বিশ্লেষণের জন্য মেলে রেখেছিল। নিজের আচরণের মধ্যে ছিদ্র খোঁজার চেষ্টা করছিল। কোন ভুলে তার পাত্র শূন্য হয়ে গেল। যদি অঞ্জন আর কখনও না আসে!

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দৈত্যাকৃতি বাস আর ট্রাকের যাতায়াত দেখে। সবুজের চিহ্ন প্রায় নেই। চারপাশ থেকে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে। আগে কখনও এভাবে দেখেনি সে। মনে হল হঠাৎ যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে তো ফ্ল্যাটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ানোরও জায়গা পাবে না। কংক্রিট চাপা পড়ে মরে যাবে সে। কেন সে এরকম জায়গায় এল?

অঞ্জনের ওপরে খুব রাগ হল আইভির। তাকে কি সে মানুষ বলে মনে করে না? মানুষেরই তো যুক্তিবুদ্ধি মতামত থাকে। সেগুলোর কি কোনও দাম নেই। এতদিন যে আইভি ভরতপুরের মত হসপিটালে কাজ করেছে, তাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তবে সেটা কীভাবে সম্ভব হল, কোন বুদ্ধিতে হল? অন্তরার সঙ্গে মুকুলের বিয়ে দেবার কল্পনাটাই কি কষ্টকল্পনা নয়? কেন তাকে দিয়ে একটা অসম্ভব কাজ অঞ্জন করাতে চায়? কেন সে এতটুকু বোঝে না ব্যাপারটা হবার নয়।

সারাদিন রান্না করল না আইভি। তেমন কিছু খেলও না। সন্ধ্যেবেলায় শুধুই নিষিদ্ধ পানীয় গিলতে লাগল সে। বড় অস্থির লাগছে তার। শরীর খারাপও লাগছে। বমি আসছে, কিন্তু হচ্ছে না। জল শুধু জল। পেট খিচে ধরছে। বাথরুমের মধ্যে সে কতক্ষণ শুয়ে রইল। একটু চেতনা ফিরলেই সে ভাবে যদি অঞ্জনের কলিংবেল বাজে, সে কীভাবে খুলে দেবে? সারারাত কেটে গেল, কেউ ডাকল না।

সকালবেলায় উঠে তার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালে ভাল লাগবে। ব্যালকনির দরজা খুলতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া মুখময় লাগল। আঃ। অঞ্জন নিশ্চয় খুব দুঃখ পেয়েছে। আইভির বলাগুলো নিশ্চয় খুব খারাপ হয়েছে। ওর সমস্যার মধ্যে, ওর যন্ত্রণার মধ্যে ঢুকতে পারেনি আইভি। সত্যিই তো মানুষ নিজের সন্তানের ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি অবুঝ হয়। তার বাবাও তো এরকম ছিলেন। অন্তরাকে কেন্দ্র করে যদি অঞ্জনকে চিরকালের জন্য হারাতে হয়? আইভি তবে কীভাবে বাঁচবে, কী নিয়ে, কাকে নিয়ে বাকি জীবনগুলো কাটবে তার?

সকালবেলাতেই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল আইভি। অঞ্জন হয়তো অভিমান করে বসে আছে। সেও যেমন কলিংবেলের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে, অঞ্জনও নিশ্চয় একটা ফোনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে। বুথ থেকে ফোন করল আইভি। উঃ ইরার গলা। নামিয়ে রাখল সে। আবার করল। আবার ইরা। বুথ থেকে বের হয়ে এল আইভি। মাথাটা যেন কেমন করছে। কখন তাহলে অঞ্জনকে একা পাওয়া যাবে? অফিসে কি তবে ফোন করবে দশটার পরে। যদি দশটার আগে অঞ্জন তার ফ্ল্যাটে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে ফ্ল্যাটে ফিরে এল আইভি। দরজাটা খুলে দরজার সামনে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকল আইভি। না, পড়তেও পারছে না সে। আইভি ভাবে অঞ্জন যদি আর একবার মাত্র তার কাছে আসে, সে অন্তরার কথা মুকুলকে বলবেই। ফোনেই বলবে। তারপর মুকুল যা করার করবে। আর তো তার কিছু করার নেই। এরপর সবকিছু মুকুলের

হাতে। আর গৌতমীর কথা অনুযায়ী অনিতাকে যদি মুকুলের পছন্দ হয়ে থাকে তো অন্তরাকেই অপছন্দ হবে কেন? কিন্তু এটা কি ঠিক হবে দুজনের পক্ষেই? হয়তো হবে। আইভি কি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নাকি? কে কীসে সুখি হয় তা কে বলতে পারে! তবে অঞ্জন ঠিকই বলেছে, মুকুলকে দেখলে অতটা বয়স লাগেনা। উদ্দীপনাও ওর যথেষ্ট। কে জানে হয়তো দেখতে ভালও। হ্যাঁ, ভালই তো। প্রতিদিন দেখতে দেখতে তার রূপ বোধহয় ধরা পড়েনি আইভির চোখে।

দশটা বেজে গেল। এল না অঞ্জন। আবার দরজা লক করে আইভি বের হল। ওর অফিসে যাবার পরপরই ফোন করা ঠিক নয়। হয়তো ব্যস্ততা থাকবে। কিন্তু কতক্ষণ। কত ধীরেই বা রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায়? কতই বা উইন্ডো শপিং করা যায়। তাও তো এখনও সব দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। যাই হোক সে ফোন তুলল। হ্যাঁ, অঞ্জনেরই গলা। কয়েকবার অঞ্জনের কণ্ঠস্বর সে শুধুশুধুই শুনল। বুকের মধ্যে ঝড় উঠছে। সে প্রায় কোনও কথাই বলতে পারছে না। তার গলা কান্নায় বুজে আসছে।

অঞ্জন বুঝতে পেরেছে। খুব নরম ওর কণ্ঠস্বর। বলছে, তুমি যদি আমার দুঃখকষ্ট না বুঝবে তো কে বুঝবে বল। তুমিই বল তুমি থাকবে বলে কি তোমার জন্য আমি ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিইনি। এর জন্য সব কাজকর্ম সেরে কত ছোটাছুটি করতে হয়েছে তুমি জান না আই। কলকাতা শহরে তুমি নিজে কিছুতেই একাএকা বাড়ি জোগাড় করে থাকতে পারতে না। আমার ব্যাপারটাও ঠিক সেইরকম। ও কাজটা যেমন আমি পারতাম বলেই করেছি এ কাজটাও তুমি পারবে বলেই করবে। কাজটা তোমার কাজ বলে ভাবাই দরকার। আমি জানি অন্তরাকে তুমি কত ভালবাস। আর ভাবতো বিয়েটা হলে ও কত কৃতজ্ঞ থাকবে তোমার কাছে। তুমি পারবে না আমার জন্য এ কাজটা করতে? নিশ্চয় পারবে। তুমি বললে মুকুল ঠিক রাজি হবে।

আইভির দুচোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরছিল। যদিও সে কাঁচের আড়ালে, তবু কে দেখছে আর না দেখছে কিছুই খেয়াল ছিল না। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল, বলব আমি ওকে। কিন্তু এরপরও যদি না হয় ...।

অঞ্জন খুব খুশি। এমন ভাব করছিল যেন বিয়েটা হয়েই গেছে। বলছিল খুব কাজের চাপ আই, তাই তোমার কাছে যেতে পারিনি। অঞ্জন ফোন ছাড়ছিলই না। এত আদরের কথা বলছিল অঞ্জন, যেসব কথা আইভি কখনও শোনেনি। ফোনের বিল বেড়ে যাচ্ছিল আইভির কোনও খেয়াল ছিল না। বাড়ি হলে সে সারাদিনই ফোন হাতে বসে থাকত। কিন্তু ছাড়তে তো হবেই। ছাড়ার আগে অঞ্জন বলল, শোন আই, মুকুলকে ফোনে তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ও আসছে, সামনাসামনি বলা ভাল।

— ও আসছে? বড় অবাক হয় আইভি। আসছে কেন?

— অন্তরার জন্য আসছে। অঞ্জন ফোনে খুব হাসছে। ও যে বলামাত্র চলে আসবে আমি ভাবতেও পারিনি।

— তবে তো হয়েই গেছে। তুমি সব বলে দিয়েছ। আমার প্রয়োজন তো নেই। এতক্ষণ মিছিমিছি ...

— আরে তা নয়। ওকে কি সত্যি সত্যি অন্তরার কথা বলেছি। আমি দেখলাম ও না এলে কিছুতেই কনভিনস করাতে পারব না। ও তো তোমার খবর নিচ্ছিল। হঠাৎ ব্যাপারটা মাথায় খেলে গেল বুঝলে, বললাম তুমি ভয়ানক অসুস্থ।

— অঞ্জন, এটা তুমি কী করলে?

— দ্যাখ না, ব্যাপারটা জমবে।

— জমার ব্যাপার নয়, ও আমাকে কী ভাববে বলতো। ছিঃ

— আই তুমি কথা দিয়েছ আমার সঙ্গে তুমি সহযোগিতা করবে। জীবনে বাঁচতে গেলে কৌশলের আশ্রয় নিতেই হয়। এটা কোনও দোষের নয়। তুমি টেনশন কোরোনা। ডক্টর বোসকে তো আমিই আনতে যাব। প্রথমে আমাদের বাড়িই নিয়ে আসব। তখন আমিই ওকে সব বুঝিয়ে বলব। তুমি কেবল অন্তরা সম্পর্কে সার্টিফিকেটটা দিয়ে রেখ। আর শোন, ওকে কিন্তু আজ আমার বাড়িতেই রেখে দেব। অন্তরাকে দেখা তো দরকার।

— তাহলে স্টেশনেই তুমি জানিয়ে দিও, আমি ভাল আছি। ফোন নামিয়ে রাখল আইভি।

ফেরার পথের রাস্তাটা কখন ফুরিয়ে গেল। অন্যমনস্ক আইভি সিঁড়িতে উঠছিল। সেই মহিলাটি যার সঙ্গে মৌ-এর বাবার অসুখের সময় কথা হয়েছিল, সে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, দিদি, আপনার শরীর খারাপ?

— না তো। বিষণ্ণ মুখটাকে আইভি তুলে ধরে, সে হাসতেও পারছিল না।

—না দিদি, আপনার শরীর খারাপ। একা থাকেন। এতজনের জন্য এতকিছু করেন, নিজের জন্য বুঝি একটুও যত্ন নিতে নেই? মেয়েটি সাহস করেই তার হাত ধরল। রান্না বুঝি হয়ে গেছে দিদির? আইভির ঘাড় নাড়া দেখে সে বলেই ফেলল : আজ তাহলে আর রাঁধতে হবে না। আমার সঙ্গেই খাবেন। চলুন আমার ফ্ল্যাটে। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। কর্তা তো অফিসে। শুধু আমি আর বাচ্চাটা।

—আমি খুব ক্লান্ত যে। আইভি বলে। ঘরে গিয়ে শুতে হবে।

—তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি বারোটা বাজলে খাবার নিয়ে যাব। কিছু মনে করবেন না দিদি। মেয়েটির চোখেমুখে স্নেহের হাসি।

আজকাল ক্ষণে ক্ষণে আইভির চোখে জল আসে। কতকাল পর তার দিদিকে মনে পড়ল। সুরভি। হারিয়ে গেছে তার দিদি। তার নিজের সব লোকেরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। বাতাসপুর বাতাসের মধ্যে মিশে গেল। তার জন্মক্ষণে কোন গ্রহ ছিল? হয়তো বাতাসপুরে না জন্মালে তার ভাগ্য এরকম হত না। আইভির সব ছেড়ে দিয়ে এই মেয়েটিকে নিজের বলে মনে হচ্ছে। তাকে খাওয়াতে এসেছে এই অল্পবয়সী মেয়েটি। তার দু বছরের নরম শিশুটিকে খানিকক্ষণ বুকের মধ্যে চেপে রাখল আইভি। পৃথিবীতে নরম জায়গা, আশ্রয়ের জায়গা বোধহয় শিশুর স্পর্শ ছাড়া কোথাও নেই। আইভি এই প্রথম সন্তানের অভাব বোধ করল। তার যদি কোনও সন্তান থাকত—

—ভরতপুর। অনেকদুর, ছোটনাগপুরের মালভূমি, খুব সুন্দর।

—ওখানে বুঝি আপনার সবাই আছেন?

—আপনার কাকে বলে তাই যে বুঝলাম না বোন।

—না, না, সে তো ঠিকই। কত আপনার লোক পর হয়, পর আপন হয়। সেদিন যেভাবে মৌদের জন্য করলেন, পর ভাবলে কি করতেন? আপনাকে দেখে আমারই নিজের লোক মনে হয়। মেয়েটি সলজ্জ হাসি হাসল। আচ্ছা দিদি, একজন যে আপনার কাছে আসেন, উনি নিশ্চয় আপনার নিজের লোক।

আইভি খানিকক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল : ও আমার কেউ নয়।

বিকেল চারটে নাগাদ ইরা এল। হয়তো এখন ইরার প্রসঙ্গ বারবার আসে বলেই ইরাকে চিনতে পারল আইভি। নইলে বাইরে দেখলে কিছুতেই চিনত না। বিকট মোটা হঁয়েছে ইরা। চর্বি যেন ফেটে বের হচ্ছে। গায়ের রঙ অবশ্য আগের মতো ফর্সাই আছে। গোলাপি রঙের লিপস্টিক লাগিয়েছে। অনেক গয়না পরেছে ইরা।

আইভি ওকে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইরাই হাসিমুখে এগিয়ে এল নড়বড় করতে করতে। আইভিকে জড়িয়ে ধরল ইরা। ইরার গলার সোনার হার আইভি-র কাঁধে ফুটে যাচ্ছিল। ইরা বলছিল, তুই এতদিন এসেছিস, আর আজ আমার আসার সময় হল। তুই কি রাগ করেছিস আইভি?

ইরাকে যত্নে বসিয়ে আইভি বলল, আমারই তো তোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল। আইভি বুঝে পাচ্ছিল না অঞ্জনের প্রসঙ্গ সে উত্থাপন করবে কি করবে না। বিশেষ কথা সে বলতে পারছিল না। ইরার হাসিমুখ, ইরার বকবকানি সব পরিস্থিতিটা সামলে দিচ্ছিল। এই ইরা একসময়ে তার প্রাণের বান্ধবী ছিল। আচ্ছা, ও অস্বস্তিতে ভুগছে না?

ইরা এসে থেকেই বলছে, চলে যাব। বলছে, যা কাজ বাড়িতে। আজ তোমাদের তিনি আসবেন তো তাই সারাদিন ধরে রান্না করতে হয়েছে। অ্যাই আইভি ডক্টর বোস নাকি সাংঘাতিক হ্যান্ডসাম? আমার দু মেয়ের মধ্যে লড়াই না হয়ে যায় আবার।

ইরার কথায় হেসে ফেলে আইভি। আগের মতোই ও আছে। হয়তো অমন হেসে খেলে আছে বলেই জীবনটা ওর কাছে সহজ সাধারণ হয়েছে। আবার ইরা বলে, তুই কি ভাল আছিস আইভি, তোকে দেখে হিংসে হচ্ছে। কী দারুণ দেখতে হয়েছিস তুই। আর আমাকে দেখ। হাতিও আমাকে দেখে লজ্জা পাবে। মেয়েগুলোকে বলি আমার মত জীবন যেন না হয় তোদের। মেয়েটার জন্য রাতে আমার ঘুম হয় না রে। হাসতে হাসতেই ইরার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। বিশ্বাস কর ওর বাবা মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিল। কিছুতেই মানতে পারল না মেয়ে ওইরকম গরীব বাড়ির বউ হিসেবে থাকবে। প্রেস্টিজে লাগছিল ওর।

—কিন্তু ওর তো কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া তুইও নাকি চাসনি।

—আমার কথা ছাড়। আমাকে তো ওর কথামতোই চলতে হয়। নিজের কোনও স্বাধীন জীবন আছে আমার। একবার কথাটা বলে ফেলেছিলাম, তার দোষ এখন মাথায় নিয়ে বসে আছি। অথচ ও একবার ছেলেটার কাছে গেলও না। একটুও সাহায্য করল না। অথচ ছোট মেয়ে ওর পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে সব ঢেলে দিল। আমার বড় জামাইটা ভাল ছিল রে। একটু অভিমানী। আচ্ছা ওকে তুই জিজ্ঞেস করিস্ তো সাততাড়াতাড়ি

মেয়েকে ডিভোর্স করাতে কে বলেছিল। আমার মেয়েও তো প্রথমে রাজি ছিল না। কানের কাছে বলতে বলতে ওই বাচ্চা মেয়েও ওর দিকে ঝুঁকে গেল।

—তুই কি কিছু বলতে এসেছিস ইরা? আইভি ওকে সাহস দিতে ওর হাত স্পর্শ করল।

—বলতে আসিনি, চাইতে এসেছি, ইরা আইভি-র হাত দুটো ধরল। মুখভর্তি অশ্রুজল নিয়ে সে বলল, আমার বড় মেয়েটাকে তুই উদ্ধার করে দে আইভি। তারপর তুই যা চাস তাই আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবি। যা চাস। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ইরা। ওর হাত থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল আইভি। রান্নাঘরে ওর জন্য চা করতে উঠে বলল, আমি তো অঞ্জনকে বলেছি এটা আমি বলে দেব। কিন্তু আমি তো বিয়েটা করব না। তবু বলব। এ ঘরবাড়ি সবই তো ওর জন্য। আমার কৃতজ্ঞতা আছে ইরা।

আইভি রান্নাঘরে গেলে ইরা ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে চা করছে আইভি। আইভি কি অন্যকিছু আশা করেছিল? ইরা অন্যকিছু বলবে? ইরার মধ্যে কেন অপরাধবোধ থাকবে? তবু ইরাকে দেখে খারাপ লাগে। আইভি চায়ের মধ্যে চিনি দিতে গিয়ে প্রশ্ন করে। তুই চিনি খাস তো ইরা।

—খাই। সব খাই। খাওয়া বারণ। তবু খাই যাতে তাড়াতাড়ি মরতে পারি। আবার ইরা আগের মতো হাসে। তারপর আইভির রান্নাঘরের কাপ ডিস, কৌটো বাটিতে আঙুল ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে বলে সব আমার কেনা জানিস। আমি সব পছন্দ করে কিনে গেছি। বাবুর অর্ডার ছিল। নইলে কি সাধ করে তোর সংসার গোছাই? তুই আবার সব রেখেছিস।

আইভির হাত থেমে গিয়েছিল। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আইভি আশা করেনি। ঝড়ের মতো মুকুল এসে ঢুকেছিল। পিছনে পিছনে অঞ্জন। আইভি হাঁ হয়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে চেয়ার টেনে বসে মুকুল তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছে। অঞ্জন বলল, উনি তোমাকে না দেখে কিছুতেই আমার বাড়ি যেতে চাইলেন না।

—উঃ, ফোন পেয়ে কী যে গেছে আমার। ভাবছিলাম নিশ্চয় মরেই গেছ। স্টেশনে মিস্টার সোম আমাকে বাঁচালেন।

—ভেরি সরি মুকুল। তোমাকে এভাবে আসতে হল।

—সত্যি অনেক কাজ ফেলে এসেছি। আমি কয়েকদিন পর আসতামই। কিন্তু এভাবে আসার যা টেনশন। যাকগে আমাকে দেখে তুমি কি খুশি হচ্ছ না রাগ করছ? আমার দোষগুলো নিশ্চয় আর মনে নেই।

আইভি শুধু তাকাল ওর দিকে। অঞ্জন তাকেই দেখছে। মুকুলের এইসব কথাবার্তা বড় উপভোগ করছে বোঝা যাচ্ছে। আইভির ভেতরে একটা আবেগ দলা পাকিয়ে উঠছে। বুকের মধ্যে জমে যাওয়া এত যন্ত্রণা সে প্রকাশ করবে কার কাছে? আইভি কোনওমতে বলল, আমি অমর তুমি জানতে না মুকুল?

—সত্যি জানতাম না। তাই আফসোস হচ্ছে। মুকুল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তার ঘর দেখছে। তারপর একসময় সে নিজেই উঠে ফ্ল্যাটের চার পাশ দেখতে লাগল। ব্যালকনি, টয়লেট, রান্নাঘর কিছুই বাদ দিল না। মুকুল যখন ব্যালকনিতে, অঞ্জন আইভির শাড়ি ধরে একটু টানল। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আইভি। ফিসফিস করে বলল, অন্তরার কথা রাস্তায় ওকে বলেছি। বেশ ধৈর্য্য ধরেই ও শুনেছে। বলেছি তুমিও একান্তভাবে এটা চাও। মনে হয় হয়ে যাবে।

মুকুল এলে অঞ্জন জিজ্ঞেস করল : কেমন লাগল এই ফ্ল্যাট? অনেক দেখেশুনে এটা পছন্দ করতে হয়েছে। মুকুল প্রশ্নটা শুনে কাঁধ নাচাল। তারপর আইভির দিকে ফিরে বলল, তোমার এখানে মন বসেছে? তোমার বাড়ি এটা ভাবতেই পারছি না।

অঞ্জন ভরতপুরের খুব প্রশংসা করছে। ভরতপুরে থাকা আর কলকাতা শহরে থাকার মধ্যে পার্থক্য বোঝাচ্ছে ওকে। মুকুল অঞ্জনের কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসছে। আইভি মাথা নিচু করে আছে, যেন নিজের কাপড়ের একটা সুতো তুলতে ও খুবই উদগ্রীব। মুকুল বলছে, খুব খিদে পেয়েছে ম্যাডাম, তোমার হাতের কিছু রান্নাটান্না খাওয়াও দেখি। তোমার বাড়িতে এলাম কিছু খাওয়াবে না? আইভি নড়ল না। অঞ্জন বলল। ওনাকে কিছু খাওয়াও আই। সেদিন তো তুমি আমাকে ভালই খাইয়েছিলে। জানেন তো ডাক্তার, আপনার ম্যাডামকে আমি আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। খারাপ রাঁধে না ও।

মুকুল আইভি-র উত্তরের আশায় ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। উত্তর না পেয়ে ও অধীর হল। কই খেতেটেতে দাও। নিদেনপক্ষে চা কর। অঞ্জনও বলতে লাগল, তোমার মুকুলকে চা খাওয়াও।

আইভি-র ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মুকুলের দিকে তাকিয়ে বলল : বিয়ার খাবে, আছে। মুকুলের অস্বস্তি টের পেল আইভি। আর অঞ্জন তো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আইভি বলেছে কদিন আগেই কিনেছি। দুটো দারুণ গ্লাস ফ্রি দিয়েছে। খাবে? মুকুল সম্ভবত পরিস্থিতিটা সামাল দিতে হো হো করে হাসতে লাগল। তুমি একেবারে বদলাওনি ম্যাডাম। মিস্টার সোম, আপনি এনাকে একেবারে বদলাতে পারেননি। টিপিক্যাল ভরতপুরি হয়ে আছে।

অঞ্জনও না বুঝে হাসছিল। বলছিল চলুন একবারে বাড়ি গিয়েই খাবেন চলুন। আমার স্ত্রী-মেয়ে সারাদিন ধরে রান্না করেছে।

—যাও মুকুল, আজ খুব ভাল ভাল খাবে। ইরা এসে রান্নার কথা বলেছে আমার কাছে। আর মেয়েও দেখে এস। আইভি বলল।

—তুমি ঠাট্টা করছ ম্যাডাম।

—একটুও না। অন্তরার বিয়ের প্রয়োজন, তোমারও। আইভি-র মুখ গম্ভীর। তারপর অঞ্জনের দিকে চেয়ে বলল, কী অঞ্জন ঠিক বলছি তো।

অঞ্জন উৎসাহ পায়। ঠিকই তো। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গী দরকার হয়। কাজ যেমন বাইরের দিক, ভেতর দিকও তো কিছু আছে। আপনি তো ডাক্তার, সাইকোলজির ব্যাপার আমার থেকে আপনি ভালই বুঝবেন। দেখবেন জীবনে নারী এলে সব কাজকর্ম কেমন বদলে গেছে। দারুণ লাগে সবকিছু।

মুকুলের ঠোঁটে একধরনের ফিচেল হাসি ছিল। কিন্তু আইভিকে দেখেই তা বন্ধ হয়ে অঞ্জনের কথা শুনছে। মনে হচ্ছে অঞ্জনের সব কথা ওর মনে গভীর দাগ ফেলে যাচ্ছে। দমে গেল মুকুল। আইভিকে অচেনা মনে হলে তার বড় সমস্যা তৈরি হয়। শরীর কি সত্যিই খারাপ ম্যাডামের। চোখের কোণে কালি, মুখ শুকনো, সমস্ত লালিত্য উধাও। কোনও একটা গভীর ভাবনা ঘিরে ধরেছে তাকে। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে। একি নতুন সম্পর্কের ক্লেশ, না অন্যকিছু?

অঞ্জন উঠল। মুকুল বলল, তুমিও চল ম্যাডাম। আমি একা যাব নাকি?

আইভি ক্লিষ্ট হাসল। এসব জায়গায় একাই যেতে হয়। যাও ভাবি বউ-এর সঙ্গে আলাপ করে এস। আইভি দেখল অঞ্জনের মুখেও লাজুক হাসি।

—তোমরা আশ্চর্য শুরু করছ তো। তুমি সিরিয়াস তো ম্যাডাম?

—সিরিয়াস, সিরিয়াস, সিরিয়াস। আইভি আর পারছিল না। বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়েছিল। কত দেরি করবে অঞ্জন, ওকে নিয়ে যাও না। আইভি তাড়া দিল।

—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ। মুকুল বলে। মিস্টার সোম, চলুন, এখন উনিই আমার গার্জেন। ওনার কথা না শুনলেই নয় দেখছি।

দরজা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগল আইভি। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এ খাট, এ তোষক, বালিশ, চাদর কিছুই তো তার নয়। অথচ এসব সে উপহার ভেবেছিল। অঞ্জনের আবেগের স্পর্শ পেত এই বিছানায় শুয়ে। ঠকিয়েছে তাকে। ভীষণভাবে ঠকে গেছে সে। বড় ঘেন্না লাগছে। এই শরীর, যাকে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিল তার হাতে, তার থেকে সে কীভাবে পরিত্রাণ পাবে? কীভাবে মুছে ফেলবে সব? এ ভুলের মীমাংসা করবে কেমন করে? মাটিতে শুয়ে পড়ল আইভি। ভাগ্যে আজ ইরা এসে তাকে জানিয়েছে। নইলে কতদিন সে মিথ্যের স্বর্গে বাস করত। অথচ অঞ্জন তার জন্যে পছন্দ করে সব কিনেছে ভেবে সে টাকা পর্যন্ত দিতে পারেনি। কেন অঞ্জনের আদেশে ইরা এসব কিনল? সে তো চায় না কলকাতায় আইভি থাকুক। সে তো নানাভাবে তার কষ্ট লুকোতে পারেনি। সে কি কেবল মেয়ের জন্য? অঞ্জন কি মেয়ের বিয়ে দেবার ছলে ইরাকে ভুলিয়েছে। নাকি কোথাও কোনও ছল নেই। আইভির কাছে আজ যা জলের মত পরিষ্কার। মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যই অঞ্জনের এত অভিনয়, এত আয়োজন।

কী করবে এখন আইভি? নিজের কাছেই নিজের মুখ লুকনোর জায়গা নেই। এত বোকা, এত। সে তবে এতসব দায়িত্বের কাজ করল কীভাবে? এখানে এর পর দিনগুলো কীভাবে কাটাবে সে? আবার অঞ্জন আসবে। সে সব ভুলে যাবে। শরীর থেকে প্রয়োজন মত মাশুল তুলে নেবে। আর তারা পরস্পর আলোচনা করবে এর থেকে সুখের, এর থেকে সার্থক সম্পর্ক কারওর হয় না। কারওর এমন নেই। আবার অঞ্জন ইরার নিন্দে করতে করতে তাকে জড়িয়ে ধরবে।

আসলে ইরাকেই হয়তো সত্যি সত্যি ভালবাসে অঞ্জন। আর তাই প্রতিমুহূর্তে তাকে ঠকতে হয়। ভাবতে ভাবতে কান্নার দমকে আইভি অস্থির হয়ে ওঠে। চোখের জলে মেঝে ভিজে যায়। কী দোষ করছে আইভি। কেন তার ভালবাসা পাবার এতটুকু অধিকার নেই? কে একথা তাকে বলে দেবে? মুকুলকে জিজ্ঞাসা করবে সে। কিন্তু মুকুলকে সে নিজের হাতে কোন পথে ঠেলে দিল। তাও আবার অঞ্জনের জন্য। অন্তরা তার কে? কেন তার জন্য আইভিকে এত দিতে হবে। মুকুল, মুকুল কি তার বন্ধু ছিল? মুকুল কি সত্যিই তাকে চাইত? তার অসুস্থতার সংবাদ কি সত্যিই ওকে টেনে আনতে পেরেছে? মুকুলের দিকে সে এতদিন চেয়ে দেখেনি কেন? নাকি মুকুল অঞ্জনেরই মতো অভিনেতা? কে জানে ও সত্যি সত্যি কী? কিন্তু অঞ্জনের থেকে যে সে ওকে অনেক বেশিদিন ধরে দেখছে। তবু তাতেই বা কী এসে যায়। আইভি-র কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। সে মানুষই নয়। সে জড়পিন্ড। লোকের খেলার বল। পায়ে পায়ে তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। মুকুল হয়তো ঠিকই বলেছিল মুক্তেশ বোস কী দিয়েছিল তোমায়? সে কি তোমাকে বিয়ে করেছিল?

কিন্তু মুকুল, তোমার যদি বিয়ের ইচ্ছে অত প্রবল না থাকবে তাহলে তুমি অঞ্জনের সঙ্গে চলে যাবে কেন? তুমি কি আইভির মুখের কথায় গেছ? তা তো সত্যি সত্যি নয়। নিজের ইচ্ছেটাকে ওইভাবে তুমি সাজালে। কিন্তু আইভি কেন বলতে গেল, কেন অঞ্জনের জন্য বলতে গেল? অন্তরা মুকুলকে বিয়ে করে ভরতপুরে গিয়ে থাকবে— দৃশ্যটা ভাবতেই সে যেন পাগল হয়ে গেল।

তোষক বালিশ সব ছুঁড়ে ফেলল আইভি। এরপর সে কী করবে? এত একা, এত একার জীবন সে কাটাবে কী করে? তার হাতে সামান্যতম কাজ নেই। মুকুলের কাছে কি আবার তাকে হাত জোড় করে বলতে হবে কলকাতায় তারজন্য কোনও কাজের ব্যবস্থা করে দিতে। ভরতপুরে যদি শেষে তাকে ফিরে যেতে হয়, তাহলে! মুকুলের অনেক কথা সে শুনতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অন্তরার কথা যদি তাকে মানতে হয়! তার ওপর মেয়ে আছে বলে ইরা অঞ্জন যদি মাঝে মাঝে ভরতপুরে থাকতে যায়। ওদের সামনে তার আইভি নাটক করতে পারবে না।

আইভির তবে কী করা উচিত। আত্মহত্যা? গায়ে আগুন লাগিয়ে মরবে সে। তবে তো সে মৃতদেহে আবার অঞ্জন হাত লাগাবে। বলা যায় না মুখাগ্নিও করতে পারে। হয়তো মুকুলই সেটা করতে অঞ্জনকে অনুরোধ করবে। মুকুল জানতেও পারবে না এই লোকটা কেমন। জানতেও পারবে না কেন ম্যাডাম তাকে কিছু খেতে দিতে পারেনি। রান্নাঘরের সব পাত্রগুলো তার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। মুকুলকে কী করে ওই নোংরা পাতে খাওয়ায়। নিজের ঘরে মুকুলকে খিদের মুখে কিছু দিতে পারেনি এই দুঃখ নিয়ে সে মরে যাবে? ফ্ল্যাটের যে কয়েকটি লোক তাকে ভালবেসেছে, তারাও শিহরিত হবে তার কথা শুনে। ভরতপুরের সনাই অবাক হবে। মুকুলও হয়তো অন্তরার কাছে এসব নিয়ে গল্প বলবে।

মরবে সে, এখনি নয়। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে সে। হরিদ্বারে যাবে। মুক্তেশের প্রিয় স্থান। কত ছবি তুলেছিল সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গার। কত গল্প বলত। ঝাঁপিয়ে পড়বে সেখানেই সে। অচেনা জায়গায় গিয়ে তার লাশ আটকে যাবে। মাছে, কুমিরে, পোকায় খাবে। তবু নোংরা হাত তো তার গায়ে লাগবে না।

ধীরে ধীরে সে উঠে বসল। শাওয়ারের নিচে, দীর্ঘ জলের ধারায় সে নিজেকে নিজে শান্ত করতে লাগল।

বেশ রাত করে আইভির কাছে ফিরে এসেছিল মুকুল। আইভি তখন তার পাগলামোর সব চিহ্নগুলো ঘর থেকে মুছে ফেলেছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে সেজেছিল। নিজের জিনিসপত্র টাকাপয়সা একটা ব্যাগে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। মুকুলকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সেও অন্য ট্রেনে উঠে বসবে। তারপর চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। মুকুল তাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বার বার প্রশ্ন করেছিল তার শরীর নিয়ে। আইভির কথাবার্তাকে বিশ্বাস করছিল না সে। জিজ্ঞেস করছিল। এত রাতে তুমি জেগে বসে আছ কেন? তোমার ঘুম কি আজকাল হচ্ছে না? বড় উদ্বিগ্ন লাগছিল মুকুলকে। সে চেয়ার টেনে আইভির সামনে এসে বসেছিল। কী হয়েছে তোমার?

—কাল ভাবছি একটু বেড়াতে বের হব। কলকাতায় মন আর টিকছে না, অনেকদিন হল। আইভি বলে।

—কতদিন আর? মাসখানেকও নয়। তুমি উনত্রিশ দিন ভরতপুর থেকে এসেছ জান। কিন্তু তুমি যাবে কোথায়? উনি তো কিছু বললেন না।

—তুমি শুনেছ বুঝি? আইভি ওর অন্য প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেল।

—একা আমাকে ফেলে এলে। একবার তো ফোনও করতে পারতে। অভিমানে গলাটা ধরে এল মুকুলের। পরক্ষণেই সে হেসে বলল, জানি জানি, তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত তুমি এখন। তুমি খুশি তো ম্যাডাম?

আইভি ওর কথার জবাব না দিয়ে বলল : অন্তরাকে পছন্দ হল?

আবার শব্দ করে হাসল মুকুল। আচ্ছা অপছন্দ হবার কী কারণ থাকতে পারে। সুন্দরী, অল্পবয়সী যুবতী নারী, আমার ভাল লাগবে না, এটা তুমি ভাবলে কী করে? আরে, দারুণ রাঁধে জান। কতদিন বাড়ির রান্না খাইনি। মনেই নেই। করে মা মরে গেছে। মুকুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—বিয়ে হলে আর মায়ের অভাব বোধ হবে না।

—ভেবে দেখলাম, এটাই একটা সাংঘাতিক কারণ হতে পারে। মুকুলের চোখ হাসছিল। আচ্ছা ম্যাডাম, এই উপলক্ষে ছোট করে একটা হয়ে যাক। মিস্টার সোম তো এসব ব্যবস্থা রাখেনি।

—তুমি চাইলেই পেতে। তুমি এখন ওর দেবতা। ওর মেয়েদেরও।

—ইস্, বরের পক্ষে কি শোভন হত? তখন আমাকে যা মুশকিলেই ফেলেছিলে। আচ্ছা ম্যাডাম, তুমি বলেছিলে না কলকাতায় এসে এইসব একেবারে ছেড়ে দেবে।

—কিছু পেলে তো কিছু ছাড়া যায়। এই তো এবার তীর্থে যাচ্ছি। এবার সব কিছুই ছাড়ব। সব ত্যাগ করব।

মুকুল গম্ভীর হয়ে বলল— সত্যি বলতো কোথায় বেড়াতে যাচ্ছ? মিস্টার সোমের সঙ্গে? ব্যাপারটা গোপনীয় বুঝতে পারছি। আমি কাউকে বলব না। তবু বলে যাও আমাকে।

—মরতে যাচ্ছি মুকুল। কাকে সঙ্গে নেব?

—ইয়ার্কি মের না। বাতাসপুর যাচ্ছ, দিদির কাছে?

অনেকক্ষণ পর মৃদু হাসল আইভি। বড় যন্ত্রণায় যেন মুখটা ফাঁক হল। আর দিদি? অন্তরার বাবার কাছেই ওর খবর পেয়েছি, সে স্বামী ওর ছেড়ে গেছে। ওর নাকি একটা ছেলে হয়েছিল। ছেলেকে নিয়ে ও নাকি বাতাসপুর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। হয়তো কলকাতাতেই আছে। কোথায় খুঁজব বল। রাস্তা দিয়ে কোথাও গেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। মাঝে মাঝে মনে হয় মরে গেছে। আবার ভাবি ছেলেটা আছে বলেই হয়তো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ওর প্রবল।

—তাহলে তোমার কোথাও যাবার নেই। কোথাও যেতে পার না তুমি

—এই তুমি বুঝলে

—তুমি শক্ত লোহা ম্যাডাম। তোমাকে বুঝি আমার সাধ্য কী।

—কাল সকালের ট্রেনেই যাব। বেড়াতে যেতে যদি হয় তবে আমার সঙ্গে চল। কতগুলো কাজ তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না।

— তুমিও আমাকে কাজে ডাকছ? মলিন মুখ তুলে ধরল আইভি।

—কাজ ছাড়া আছেটা কী? মুকুল যেন সব সহজ করে দিচ্ছে। ভালবাসাটা অবশ্য বিরাট কাজ তাই না ম্যাডাম। অন্য কিছুতে মন বসে না। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ।

স্টেশনে আইভি ভেবেছিল অঞ্জন আসবে। সে ক্ষেত্রে তার ট্রেনে উঠে চলে যাওয়াটা কঠিন হবে। অঞ্জন আসেনি বলেও সে অবাক হয়েছিল। মুকুলকে সি অফ করতে তো ওদের সপরিবারেই আসার কথা। ওরা তো জানত মুকুল আজই চলে যাবে। তবে কি মুকুলই বারণ করেছে।

মুকুলকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গিয়ে বড় মনখারাপ লাগছিল। হয়তো একারণেই যে আইভি ভাবছিল তার আর মুকুলের সঙ্গে কোনওদিন দেখা হবে না। অন্তরাকে বিয়ের ঠিক আগে পর্যন্ত হয়তো ও তার কথা মনে ভাববে। এত শূন্যতার মধ্যেও এই এক বিন্দু আলোর জন্য তার পৃথিবী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। আইভি সব দেখে এসেছে। মুকুল চলে যাবার পর আর ঘণ্টা খানেক থাকবে স্টেশনে। তারপরেই তার ট্রেন। মুকুলকে এড়িয়ে টিকিটও কেটে এনেছে সে। অঞ্জন কিছু বলতে পারবে না তাকে। মুকুলকে তো সে তার সামনেই বলেছে। আর মুকুল তো রাজিই।

ট্রেনে মুকুলকে বসিয়ে দিতে গিয়ে আইভি বলল, আমার একটা কথা রাখবে তুমি? যদি কখনও বোঝ আমি আর এ পৃথিবীতে নেই, আমার সব টাকাপয়সা আমার দিদিকে খুঁজে বের করে তার হাতে তুলে দেবে তুমি? তার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মুকুলের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই, লজ্জাশরমের বালাই নেই। সে আইভিকে জড়িয়ে ধরে সিটে বসিয়ে দিল। তোমার সত্যি কী হয়েছে ম্যাডাম, আমায় বলবে না?

আইভির চোখে জল ঝরানো ছাড়া কিছুই করার ছিল না। পাশে বসে একহাত দিয়ে আইভির পিঠ বেষ্টন করে আছে মুকুল। এতক্ষণ যে ট্রেন ফাঁকা ছিল, সে ট্রেন লোকে ভরে যাচ্ছে। তাদের দিকে অনেকে তাকাচ্ছে। কী কথা বলবে সে?

—ট্রেন ছেড়ে দেবে মুকুল। আমার টিকিট নেই। আমাকে জোর কোরো

না।

—বলছি তো দুদিন পর তোমাকে ছেড়ে দেব। তোমাকে আটকাব এতবড় ক্ষমতা আমার নেই। মুকুল ছেড়ে দেয় তাকে। তুমি যা খুশি কর। তোমার জন্য আমার বড় ভয় করছে ম্যাডাম। আমি জানি না তোমার কী হয়েছে।

আইভি মুকুলকে ছেড়ে ট্রেনের দরজার দিকে গেল। নামতে পারল না। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। ট্রেন ছেড়ে দিল। মুকুল তাকে নিয়ে এসে পাশে বসাল। চেকারকে ডেকে টাকা গুণে দিল। প্রখর রোদের মধ্যে গাড়ি চলতে লাগল। মুকুল কোনও কথা বলছিল না। আগেকার মতো গল্প, কিংবা কথার কুস্তি কিছুই হচ্ছিল না। আইভির মনে হচ্ছিল মুকুল কেন তাকে পক্ষীমাতার মতো ঘিরে আছে। এ কদিনের উত্তেজনার পর ট্রেনের মধ্যে মুকুলের আশ্রয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। আইভি অনুভব করছিল এই আশ্রয় ক্ষণস্থায়ী। অন্তরাকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাখা গুটিয়ে নেবে। এ পৃথিবীতে সেও থাকবে না। তবু বহুদিন পর, কোন ছেলেবেলাকার পর এই আশ্রয়ের আস্বাদটুকু সে চেটেপুটে নিতে চাইছিল। মুকুলের গায়ে হেলান দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আলো পড়ে এলে তার ঘুম ভেঙেছিল। তখন ভূ-প্রকৃতি বদলে গেছে। মুকুল তার মুখের কাছে খাবার ধরেছিল। খাবার দেখে তার মনে হয়েছিল সে প্রায় দেড়দিন তেমন কিছু খায়নি। সে যখন একটু একটু করে খাচ্ছিল মুকুল তখন তার ডাক্তারি বিদ্যা প্রয়োগ করার জন্য আইভিকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। এত কিছুর মধ্যেও হাসি পাচ্ছিল আইভির। সে মুকুলকে বলেছিল, আমি পাগল হইনি, বিশ্বাস কর। বরং সত্যি বলছি চেতনাটা এত না থাকলেই...

মুকুল আবার তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, ঘুমোও তুমি। অনেকদিন ঘুমোওনি বুঝতে পারছি কদিন ভরতপুরে খুব ঘুমিয়ে নাও। তারপর যেখানে খুশি যাবে।

ভরতপুর চলে আসছিল। চেনা চিহ্নগুলো একে একে দর্শন দিচ্ছিল। আইভি অনুচ্চ গলায় বলেছিল : কবে নিয়ে আসছ। অন্তরাকে?

হয়তো মুকুল অন্যমনস্ক ছিল। হয়তো তার কথা শুনতে পায়নি। আইভি কোনও উত্তর পেল না।

ভরতপুর স্টেশনে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। তাদেরকে নিতে যে ড্রাইভার এসেছে সে আইভিকে দেখে মহাখুশি। গাড়ি চালাতে চালাতে সে গল্প করছে কলকাতা কত খারাপ জায়গা। কলকাতায় একবার গিয়ে তার সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। আইভিকে অনুযোগ জানাচ্ছে, কেন আপনি ওখানে গেলেন? শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা কি খারাপ লোক?

তাদের জিপটা রাস্তা খারাপ বলে লাফিয়ে উঠল। আইভি ভাবল ফ্ল্যাটের মেয়েটিকে সে বলেছে— ভরতপুর তার দেশ। সেকথা কি শুধু মুক্তেশকে মনে করে বলেছে? তা তো নয়। জায়গা প্রিয় হয় মানুষের জন্য। অজস্র প্রিয় মুখের মাঝে প্রিয়তম মুখটিও থাকে। সেই প্রিয়তম মুখের দিকে তাকিয়ে, তার জন্য ভরতপুরের সবকাজ সে করে গেছে। এত কাজ তো তার করার কথা ছিল না। মুক্তেশ কিছু বোঝেনি এমন তো নয়। তবু মুক্তেশ তাকে নেয়নি। সেও আদর্শ-টাদর্শ কত কী ভেবে নিজেকে ভুল বুঝিয়েছে।

উঁচু নিচু মেঠো রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে জিপটা যাচ্ছে। আইভি অনেক দরবার করেছিল এই রাস্তাটার জন্য। মুকুল নিজের মনেই বলে উঠল, এখানে আবার অন্তরা এসে থাকতে পারে? ননীর পুতুল মেয়ে। জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম, বাকি দিনগুলোও কেটে যাবে। ওর কথাগুলো আইভিকে ছুঁয়ে হাহাকারের মত বাতাসে ছড়িয়ে গেল। তবু আইভি ওর দিকে তাকাতে পারল না।

মুক্তেশের সমাধির কাছে জিপটা থামাতে বলল মুকুল। নেমে পড়ল সে। আইভিকেও নামাল। তারপর ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলল। ড্রাইভার অবাক হল কিনা, কে জানে, আইভি হতবাক হয়ে গেল। এই অন্ধকার ফাঁকা মাঠের মধ্যে ড্রাইভারের চোখের সামনে তারা কোথায় যাবে? মুকুলের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? হসপিটালে এই ঘটনার কতরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে! আইভি প্রতিবাদ করল না তবু। মুকুলের হাতে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

সমাধির নিচে অনেকখানি জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে এ কদিনে মুকুল। তবে কি সেটা তাকে দেখাতে নিয়ে এল? নাকি মুক্তেশকে মনে পড়িয়ে দিতে! এই সব জায়গা আইভি-র পরিকল্পনায় তৈরি। মুক্তেশের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক সময় সে কত কী করেছে। আজ তার মনে হচ্ছে মুক্তেশ তাকে শিকল পরিয়েছে শুধু। আইভি-র কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে শুধু দোষ দেখতে পাচ্ছে কেন? কেন তার সব মোহময় অনুভূতি ছাপিয়ে যাচ্ছে পুরনো কাঁটার দংশনে। মৃত্যুর আগে কি এমনটাই হয়? সব মায়া, সব ভালবাসার পরাজয় না দেখতে পেলে, এই অপরূপ পৃথিবী থেকে ছুটি মিলবে কী করে?

কিন্তু এই মুহূর্তে সমাধিস্থানটি সত্যিই বড় সুন্দর হয়ে আছে। যদিও তেমন জ্যোৎস্না নেই। মেঘ তার আধখানাই খেয়ে নিয়েছে। অস্পষ্ট চাঁদ। খুব কাছে এলে পরস্পরের অবয়বটুকু ধরা যাচ্ছে। তারা দুজনে সামান্য দূরত্বে মুখোমুখি বসে ছিল। আইভি মুক্তেশের সমাধিতে হেলান দিয়ে। সে কী ভাবছে তা কি আন্দাজ করতে পারছে মুকুল? এইখানে সে মুক্তেশের জন্মদিনে মুকুলকে বক্তৃতা দিতে বাধ্য করেছিল। মুকুল সেদিন মুক্তেশের সম্পর্কে তেমন গুছিয়ে বলতে পারেনি। বলেছিল আইভির আত্মত্যাগের কথা শতমুখে। আইভিরও খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কেন সে সেদিন ভেতরের সত্যকে গুরুত্ব দেয়নি? অঞ্জনের দিকে মন পড়েছিল বলে? মুক্তেশের থেকে তার কাছে কেউ বেশি দাম পেতে পারে না— এ ভাবনা মনের মধ্যে গেঁথে ছিল বলে? মুকুলকে দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে তার মন হু হু করে উঠল। যেচে পাওয়া ধনকে কেন সে উপেক্ষা করেছিল? কেন ভিখারির মতো অঞ্জনের কাছে চলে গিয়েছিল? কেন সে প্রথম দিকেই মুকুলকে চোখ মেলে দেখেনি? তাকে একেবারে বিরোধী ভেবে নিয়েছিল। আজ মুকুলের কাছে সে কী করে হাত পাতবে? একটা জীবনে এতজনের প্রতি আকর্ষণ কি স্বাভাবিক? নাকি তার ভেতরে এত দুঃখকষ্টে থরে থরে বিকৃতি জমা হয়ে গেছে? মুকুল যদি বোঝে আইভি তাকে চায় তাহলে কি সে তাকে ঘেন্না করবে?

মুকুল বলল— আমাকে একটা কথা দেবে আইভিলতা?

চমকে উঠেছিল আইভি। তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। তাকে কি সত্যিই চায় মুকুল? ও নাম বলল কেন?

—আমাকে কথা দাও, তুমি আমার চিকিৎসা নেবে। ক'দিন ওষুধ খাবে। তুমি বুঝছো না তুমি কত অসুস্থ, তোমাকে তো বাঁচতে হবে।

বুকের মধ্যে যে বেলুনটা ফুলে উঠেছিল। সেটার হাওয়া ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় আইভি জিজ্ঞেস করল : আমি কি পাগল হয়ে গেছি মুকুল? আমি কি অস্বাভাবিক, তুমি বল ঠিক করে।

—এ কথা তুমি ভাবছ কেন? মুকুল তার চুল ঘেঁটে দিল। ভাল হলে তারপর যেও। বুঝলে আইভিলতা। মুকুলের গলায় আদর।

আইভি ভাবল একবার বলে, মরতে যাচ্ছি, সুস্থ হব কোন দুঃখে। বদলে বলল, ও নামে ডাকছ কেন? কত বিষাক্ত গাছ ও জান। গরু ছাগল খায় না। ও নামে মানুষও বিষ হয়ে যায়।

—এভাবে ভেব-না, ওর ফুল কত সুন্দর। বাগানে লাগালেও হয় না। যেখানে হবার আপনিই হয়, পরিচর্যা লাগে না।

—তবে আমার পরিচর্যা করতে চাইছ কেন? আইভি প্রশ্ন করে।

—সত্যি বলব, ভয়ে। আমার জীবনে আজ তুমি ছাড়া কে আছে? হয়তো আমার নিজের হয়ে নেই, কোথাও তো আছ। তুমি যদি মরে যাও— ভাবতে পারি না।

আইভি-র চোখের জল বাধা মানছিল না। অন্ধকারে মুকুলের পক্ষে বোঝা তা সম্ভব ছিল না। নিজেকে সে প্রাণপণ সামলাচ্ছিল, কেননা সে সমস্ত শরীর নিয়ে ঢুকে পড়তে চাইছিল মুকুলের মধ্যে।

মুকুলের গলার স্বরও ভারি হয়ে উঠেছিল। জান, আজ নয়। তোমাকে যেদিন থেকে দেখেছি সেদিন থেকে ভয় পাই। ভয় পাই, আর ভাবি আমার মায়ের অবস্থা যেন তোমার না হয়। আমার মা আত্মহত্যা করেছিল। করেছিল বাবার মত আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে ভালবাসত বলে।

—আত্মহত্যা? তোমার বাবা তো কখনও বলেননি?

—বাবা হয়তো জানতই না। নিজের কাজে, নিজের নাম যশ নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো ভালবাসত না। বাবার প্রতি অভিমানে প্রায় অনশনে মারা গেছে আমার মা।

আইভির কান্না শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু মেরুদণ্ডে সে জোর আনার চেষ্টা করছিল। মৃত্যুর কথা সে ভাবছিল না। সে জানত সে যদি একবার বাঁচার কথা বলে, মুকুলের দিকে এগিয়ে যায়, মুকুল তাকে বুকে টেনে নেবে। তবু নিজের অজান্তেই সে কখন পায়ে পায়ে সরে আসছিল। এলোমেলো পায়ে সমাধিক্ষেত্র থেকে পালাতে চাইছিল। মুকুল তাকে ধরে ফেলেছিল। অবিরাম বৃষ্টিপাতের মত ঘন চুম্বনে তাকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত মুকুল আইভিকে শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিল।

এই আবেষ্টনি থেকেও সে বের হয়ে এসেছিল অদ্ভুত হাসছিল। আইভির এই হাসি দেখে মুকুলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের বাইরে দাঁড়ানো এই অন্য নারীকে মুকুলের চেনা ছিল না।